ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

সপ্তম খণ্ড

প্রথম বাংলা সংস্করণ

সন ১৩৫১ সাল

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী প্রেমশঙ্কর

সম্পাদিত

নিবেদন

অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের অমৃতময়ী উপদেশ-বাণীর সপ্তম খণ্ড প্রকাশ-কালে আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক খণ্ডই প্রকাশমাত্র সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সাগ্রহে সমাদৃত হইয়াছে এবং কোনও কোনও খণ্ডের অবিলম্বে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করা প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু কাগজের অভাব বশতঃ আমরা এইরূপ স্থির করিয়াছি যে, সর্ব্বাগ্রে কোনও প্রকারে প্রথম দ্বাদশ খণ্ড বাহির করিয়া লইয়া তারপরে নূতন সংস্করণের মুদ্রণ-চেষ্টা ধরিব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড সমূহ নিঃশেষিত হইয়া যাইবার দরুণ যাঁহারা তাহা পান নাই, তাঁহারা পরবর্ত্তী খণ্ডগুলিই আগে সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হউন। পরে আমরা যথাকালে পুনরায় প্রথম খণ্ড হইতে পুনর্মুদ্রণ সুরু করিব।

পুঞ্জীকৃত পাণ্ডুলিপি সমূহকে কোনও প্রকারে অতি দ্রুত মুদ্রিত পুস্তকরূপে প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের সমগ্র লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকায় আমরা ভাল কাগজ, নির্ভুল প্রুফ বা প্রচুর মার্জ্জিনের প্রতি দৃষ্টি দিতে সমর্থ হই নাই। অতীব গুরুতর এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে অতি ত্বরিত মুদ্রিত বলিয়া আশা করি পাঠক ও সমালোচকেরা এই ত্রুটী অবশ্যই উপেক্ষা করিবেন।

"অখণ্ড-সংহিতা" ক্রমশঃ বহু খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, সমগ্র গ্রন্থ এক সঙ্গে একটী পুস্তকরূপে প্রকাশিত হউক। কিন্তু এত বড় বিশাল গ্রন্থ একত্র মুদ্রিত হইলে সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া ক্রয় করা অসম্ভব হইত। এই কারণে গ্রন্থ বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। এদিকে একসঙ্গে সমগ্র প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহ করা অসম্ভব বিধায় বাধ্য হইয়াও আমরা খণ্ডশঃ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি।

প্রথমে স্থির করা হইয়াছিল যে, গ্রন্থ ক্ষুদ্রায়তন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং অনুমান করা গিয়াছিল যে, তাহাতে গ্রন্থ প্রায় ৬০ খণ্ড হইবে। কিন্তু খণ্ডগুলি ক্ষুদ্রায়তন হইলে বাঁধাই শক্ত বা সুন্দর করা যায় না। এজন্য খণ্ডগুলিকে বৃহত্তর করিয়া ভাল বাঁধাইর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতেও গ্রন্থ দ্বাদশ খণ্ড হইবে অনুমান করা গিয়াছিল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির উদ্ধার শেষ হয় নাই। সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে কত খণ্ডে শেষ হইবে, বলা যাইতেছে না। তথাপি কোম্পানী স্থির করিয়াছেন যে, অংশীদারদিগকে বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে প্রথম দ্বাদশ খণ্ডই প্রদান করা হইবে। তাঁহারা মাত্র ৩১৲ টাকার অংশ কিনিয়া তাহার দেড়গুণ মূল্যের বহি পাইলেন, অথচ কোম্পানীর অংশেরও মালিক থাকিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, গ্রন্থের যাঁহারা সত্ত্বাধিকারী, তাঁহাদিগকে এক কপর্দ্দক দিবারও ব্যবস্থা হয় নাই।

এই মহাগ্রন্থে প্রকাশিত মুল্যবান্ উপদেশ সমূহ জন-সাধারণের নৈতিক ও ধার্ম্মিক উন্নতি বিধান করিবে আশায় আমরা ইহা প্রকাশে বিশেষ উৎসাহ অনুভব করিতেছি।

গ্রন্থের হিন্দী এবং ইংরাজি অনুবাদ কার্য্য সুরু হইয়া গিয়াছে। হিন্দী সংস্করণের প্রকাশের পরে অন্যান্য ভাষার অনুবাদ প্রকাশিত হইবে। ইতি

পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রম
পোঃ চাশ, মানভূম।

বিনীত নিবেদক—
ব্রহ্মচারিণী সাধনাদেবী
ব্রহ্মচারী প্রেমশঙ্কর
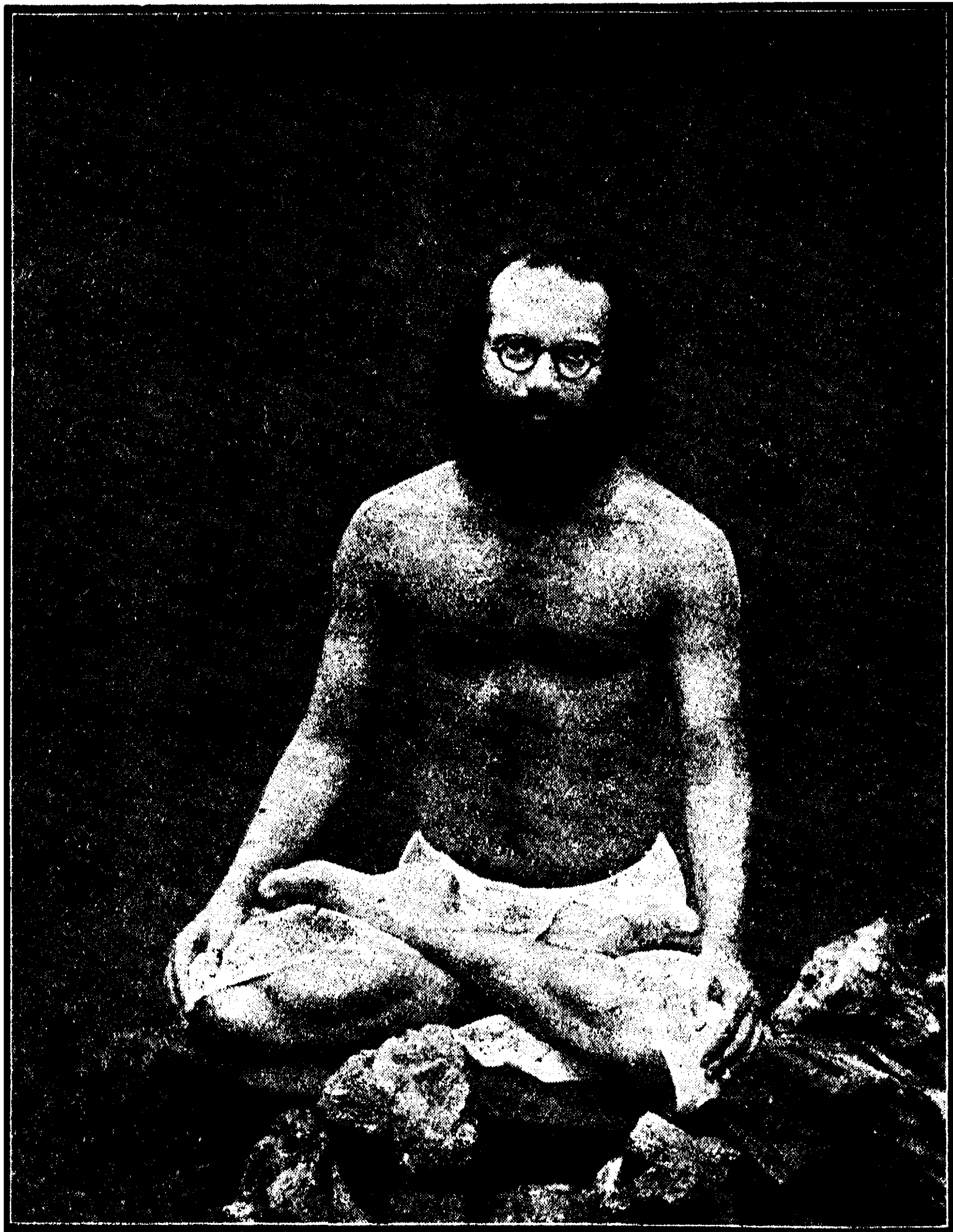
অখণ্ড-সংহিতা—

অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

ওঁ

অখণ্ড সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ বাণী

সপ্তম খণ্ড

রহিমপুর

১লা ফাল্গুন, ১৩৩৮

সূর্য্যোদয় মাত্র শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রকাশ করিলেন যে, ইটের পাঁজায় আগুন না দেওয়া পর্য্যন্ত অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। একথা প্রচারিত হওয়া মাত্র রহিমপুর ও নবীপুব গ্রামের যুবকগণ সকলে মিলিয়া কাজে লাগিয়া গেল। দশ বৎসর বয়সের বালকও বাদ পড়িল না। রবিবার বলিয়া স্কুল বন্ধ, সুতরাং ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল। ছাত্র ও অছাত্র কতিপয় মুসলমান যুবক আসিয়া নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল। স্পষ্ট বুঝা গেল যে এই আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত কর্ম্মোৎসবে তাহারা সকলেই যোগ দিয়া কৃতার্থ হইতে চাহে, কিন্তু মৌলভী সাহেবদের শাসনের ভয়েই হয়ত দ্রষ্টারূপে দূরে অবস্থান করিতে বাধ্য হইল। ইহাদের মধ্যে একটী মুসলমান যুবক ছিল যে গোপনে গোপনে শ্রীশ্রীবাবার পদধূলি ও প্রসাদ গ্রহণ করিত কিন্তু প্রকাশ্যে কোনও প্রকার সম্মাননা প্রদর্শন করিতে সাহস করিত না।

দ্বিপ্রহর বেলা সকলে নিজ নিজ আহারীয় গ্রহণে চলিয়া গেল। শ্রীশ্রীবাবা আহার করিবেন না বলিয়া আশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারী সঙ্কল্প করিলেন যে তিনিও আহার করিবেন না। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

উত্তম উপবাস

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উপবাস অনেক প্রকার হ'তে পারে। কেউ কেউ উপবাস করেন একাগ্রতা বৃদ্ধির জন্য। কেউ করেন চিত্ত-শুদ্ধির জন্য। কেউ করেন শরীরের সুস্থতা সম্পাদনের জন্য। কেউ করেন শরীরকে কষ্টসহিষ্ণু করবার জন্য। এ সব উপবাস হিতকর। এ সব উপবাসে নিজের হিত হয়, অথচ অপরের অহিত হয় না। ইহা উত্তম উপবাস। কেউ কেউ উপবাস করেন, লোকের উপর নৈতিক চাপ দেবার জন্য, অর্থাৎ তাদের বিচার ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে জাগরিত ক'রে তাদের দ্বারাই কোনও একটা অন্যায়ের প্রতীকার করিয়ে নেবার জন্য। এ উপবাসও অনুত্তম নয়।

নিন্দনীয় উপবাস

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু কেউ কেউ উপবাস করেন, লোকের উপরে অবৈধ চাপ দিয়ে তাদের স্বার্থ-হানিকর কাজে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদিগকে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য ক'রে। এ উপবাস জুলুমবাজির নামান্তর। কেউ উপবাস করেন, টাকা আদায়ের জন্য, কেউ উপবাস করেন নাম-যশ বৃদ্ধির জন্য। কেউ কেউ করেন ক্রোধবশতঃ, কেউ কেউ করেন অপরের অনিষ্ট কামনা নিয়ে। এ সব উপবাস অতি জঘন্য এবং নিন্দনীয়।

একাগ্রতা বৃদ্ধির জন্য উপবাস

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি যে আজ উপবাস কচ্ছি, তার মূল উদ্দেশ্য একাগ্রতা বৃদ্ধি। আমার একাগ্রতাই সব ছেলেদের বাহুর ভিতর দিয়ে কাজ কচ্ছে। তাই আমার আজ একাগ্রতা-বৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ। আর একদিন আমি এইরূপ উপবাস করেছিলাম। তখন আমি সঙ্গীত শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। প্রতিজ্ঞা কল্লাম, স্বরলিপির চারিখানা খাতার নকল না হওয়া পর্য্যন্ত আহার কর্ব্বনা। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলম ধরলাম, রাত্রি আট ঘটিকায় কাজ শেষ ক'রে জল গ্রহণ কল্লাম।

উপবাস কখন অনুচিত

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য, সামান্য প্রয়োজনে বা

নিষ্প্রয়োজনে উপবাস করা অনুচিত। ভগবদ্দত্ত এই দেহকে ভগবানের কাজের জন্য উপযুক্ত রাখ্‌তেই হবে। যে উপবাসে সে উপযুক্ততা নষ্ট হয়, সে উপবাস অনুচিত।

বেলা দুই ঘটিকার সময়ে পুনরায় ইটের পাঁজা সাজান আরম্ভ হইল। রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত কাজ চলিল। ডাঃ সুকুমার ঘোষ যে অদ্ভুত পরিশ্রম করিলেন, তাহা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল।

রহিমপুর

২রা ফাল্গুন, ১৩৩৮

বাঁচিবার অধিকার কাহার আছে ?

সূর্য্যোদয় হইতে ইটের পাঁজা-সাজান কাজ আরম্ভ হইয়াছে। নবীপুরের একটী উৎসাহী যুবক শুষ্ক ইষ্টক খণ্ডগুলি শ্রীশ্রীবাবার হাতে পৌছাইয়া দিতেছেন, আর শ্রীশ্রীবাবা ইট সাজাইতেছেন। কাজ করিতে করিতেই যুবকটী জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই সব কুলী-মজুরের কাজ ক'রে লাভ কি হবে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতে সবাই কুলী, সবাই মজুর। কেউ হয়ত হাত-পা খাটায়, কেউ হয়ত বা মনকে আর বুদ্ধিকে খাটায়। কিন্তু খাটুনি আছে সবারই। শ্রম যে কর্ব্বে না, জগতে তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

প্রতিভাবানের দৃষ্টান্ত

ইটের পাঁজা সাজাইতে সাজাইতে শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—মেধাবী ও প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরা সূক্ষ্ম শ্রমের পক্ষে যোগ্যতর ব'লে স্থুল শ্রম ছেড়ে দেন। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে অনেক সূক্ষ্ম শ্রমের অযোগ্য ব্যক্তিও স্থূল শ্রম ছেড়ে দিয়ে আলস্যের অবতারে পরিণত হন,—দেশ, জাতি বা সমাজ জলৌকা-বৃত্তির অনুসরণকারী, পরপিণ্ডোপজীবী, পরগাছাতে পরিপূর্ণ হয়। তার ফলে দেশ, জাতি বা সমাজ ধ্বংস হয়। এই ধ্বংস থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য মেধাবী পুরুষদেরও আজ দৈহিক শ্রমসাধ্য জীবনোপায় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কারণ, প্রতিভাবানের দৃষ্টান্তই প্রতিভাহীনেরা অনুসরণ করে।

সাধক পুরুষের শ্রমশীলতার উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু আমরা যে কঠোর শারীরিক শ্রম স্বীকার করি, এর ভিতরে জীবনোপায় সংগ্রহের কোনও প্রশ্নই নেই। সেই প্রশ্ন থাকৃলে প্রত্যেক কার্য্যের আর্থিক ক্ষয়োদয়ের বিচার কত্তাম আগে। কর্ম্মের ভিতরে অকর্ম্মকে দর্শন করা, অকর্ম্মের ভিতরে কর্ম্মকে অনুভব করা, এই হ'ল আমার পরিশ্রমের উদ্দেশ্য। আর, তোদের নিয়ে যে শ্রম করি, তার উদ্দেশ্য তোদের মান-অভিমান-বোধকে খর্ব্ব করা, শ্রমের মর্য্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করা, স্বাবলম্বনকে জাগরিত করা।

বৃদ্ধদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মহিম সাহা এবং যুবকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সনাতন সাহা ও ডাক্তার স্নকুমার ঘোষ আজ যে কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন, বোধ হয় তাহা তুলনারহিত। গ্রামের যুবকদের প্রায় সকলের অভাবনীয় শ্রমে দ্বিপ্রহর ১টা ৩০ মিনিটে ইটের পাঁজায় অগ্নি-সংযোগ করা হইল। কিন্তু অনুক্ষণ অবিরাম পাখার বাতাস সত্ত্বেও রাত্রি সাত ঘটিকার পূর্ব্বে পাঁজায় আগুন ধরিল না। পাঁজায় অগ্নি-সংযোগ হইয়া যাওয়ার পরে শ্রীশ্রীবাবা অন্নজল গ্রহণ করিলেন।

কর্ম্মী কিন্তু ফলভোগী নহি

কোনও এক উপলক্ষে আজ হোসেনতলা গ্রামে শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র সাহার বাড়ীতে নাম-কীর্ত্তন হইবে। নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীশ্রীবাবা রহিমপুরের কতিপয় পৌঢ় ও যুবক সমভিব্যাহারে সেইখানে গিয়াছেন। ফিরিবার পথে রাত্রি বারোটার সময়ে প্রবল বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। ছুটিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীবাবা, জীবন, পঞ্চানন, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ, শ্রীযুক্ত সনাতন সাহা ও শ্রীযুক্ত বিপিন সাহা জলে ভিজিতে ভিজিতে ইটের পাঁজাকে খড় এবং শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তীর প্রদত্ত টিনগুলি দিয়া ঢাকিলেন। সলিল-সিক্ত দেহে ও বস্ত্রে 'প্রভাত-ভবনে' ফিরিয়া আসিলে জনৈক ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্যাপার কি?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—যে ইটে ঘর গেঁথেও বাস করা আর হবে না, সেই ইটের পাঁজাটাকে জলের হাত থেকে বাঁচিয়ে এলাম।

জানিস্ ত', সব সময় আমি মনে রাখি যে, কষ্ট করে যা গড়্ছি, তার কোনটার ফলের আমি ভাগী নই।

রহিমপুর
৩রা ফাল্গুন, ১৩৩৮

হতাশা আমার নাই

প্রাতে উঠিয়া দেখা গেল, ইটের পাঁজার আগুন প্রবল বারিবর্ষণের ফলে নিবিয়া গিয়াছে। গ্রামের যুবকদের মনে একটা গভীর হতাশার রেখাপাত হইয়াছে। সকলে মিলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত সূর্য্য রায় শ্রীশ্রীবাবার নাম করিয়া গ্রামবাসীদের নিকট হইতে চল্লিশটী টাকা হাওলাত সংগ্রহ করিয়া কয়লা ক্রয় করাইয়াছিলেন। কপর্দ্দকহীন আশ্রমের এই বৃথা অর্থব্যয়ে তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হতাশা আমার নেই। মন্দ জিনিষ আর যত কিছু বল, সবই আমার আছে, কিন্তু হতাশা নেই। অনেকে আমার জীবন-কাহিনী জান্‌তে চায়। আমি বলি না। বল্‌বার প্রয়োজনই বা কি? বল্লে বিশ্বাস কর্ব্বেই বা কেন? বিশ্বাস কর্ল্লেও তাতে শিখ্‌বে ত মাত্র ঐ একটী কথা,—হতাশা আমার নেই!

আবার চেষ্টা কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পাঁজায় আগুন লাগেনি? আবার চেষ্টা কর। আবার খেটে দেখ, আগুন লাগে কিনা। আগুন নাই যদি লাগে, সব ইট নামাও, আবার পাঁজা সাজাও, আবার আগুন ধরাও। চল্লিশটী টাকার কয়লা ত? যতই অভাব হোক্, যে ভাবে পারি, টাকা আমি দিব, তোমরা হতাশ হ'য়ো না।

নবীপুরের শ্রীযুক্ত গুরুচরণ পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন পোদ্দার মহোদয়-দ্বয় নিজ নিজ গৃহ হইতে কয়েক বোঝা শুষ্ক কাষ্ঠ প্রেরণ করিলেন। রহিম-পুরেরও কাহারও কাহারও ঘর হইতে কিছু আসিল। ইটের পাঁজার ছিদ্রপথ দিয়া টানিয়া টানিয়া গত দিনকার অগ্নি-দহনাবশিষ্ট কাষ্ঠাঙ্গারগুলি বাহির

করা হইল এবং নানারূপ কসরৎ করিয়া নূতন কাষ্ঠখণ্ডগুলি ধীরে ধীরে পাঁজার নিম্নদেশে প্রবেশিত হইতে লাগিল। তৎপরে পুনরগ্নি-সংযোগ হইল।

রাজ-ভৃত্য-সমাগম

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিম্নতর উচ্চ রাজপদবিশিষ্ট দুইজন রাজকর্ম্মচারী অদ্য মুরাদনগরে আসিয়াছিলেন। একজন জেলার উপরে একজন মহকুমার উপরে প্রভাবসম্পন্ন রাজকীয় ভৃত্য। মুরাদনগরে সমধর্ম্মী ব্যক্তিদের নিকট শ্রীশ্রীবাবার সম্বন্ধে ইঁহারা অনেক কথা শুনিয়া আসিয়াছেন এবং রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে আশ্রমের ইটের পাঁজার অগ্নি-সংযোগ দেখিয়া আশ্রম-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। পরিচয় না জানিলেও শ্রীশ্রীবাবা সাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বসিবার জন্য তৃণ ছড়াইয়া দিলেন।

পদ-মর্য্যাদায় যিনি ভারী, তিনিই নানা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যথা,—ইট কাটা হইতেছে কেন? সাধুদের ইট দিয়া কোন্ প্রয়োজন? আপনি নাকি জঁাক-জমক করিয়া উৎসব করেন? জঁাক-জমক করিয়া উৎসব করিলে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার করা হয়। সাধুরা বনেই থাকে। লোকালয়ে তাঁদের কোন্ প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীবাবা বেশ ঠাণ্ডা ভাষায় জবাব দিতে দিতে হঠাৎ একটু দৃঢ় হইয়া বলিলেন,—সাধুরা বন-জঙ্গলে বাস করে কেন জানেন? সেখানে বাঘ-ভালুকের সংসর্গ পাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল লোকালয়েই এত সাপ আর বাঘ, এত ভালুক আর গরিলা যে, বনে যাবার দরকার হয় না। এই জন্য আজকাল আর সাধুরা বনে যায় না।

আগে চাই ক্ষেত্র-নির্ম্মাণ

রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র সাহার বাড়ীতে আগমন করিলেন। কথায় কথায় শ্রীশ্রীবাবা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্রকে উপদেশ দিতে লাগিলেন,—চাই আগে ক্ষেত্র-নির্ম্মাণ। এমন ভূমি তৈরী কত্তে হবে যেন, দৃঢ় মেরুদণ্ড-সম্পন্ন একটা শক্ত রকমের বীর্য্য-বরীয়ান নববল-প্রবুদ্ধ দুর্দ্ধর্ষ জাতির সৃষ্টির পক্ষে তা হয় একান্ত অনুকূল। আমি চাই, প্রত্যেক বালক ভারতবর্ষকে

ভালবাসুক এবং যা কিছু পূর্ণতা লাভের বিঘ্ন, তাকে বর্জ্জন কত্তে শিখুক। আমি চাই, প্রত্যেকটী বালিকা ভারতবর্ষকে ভালবাসুক এবং ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠ তপঃফলকে নিজ নিজ জীবনে মূর্ত্তিদান করুক। আমি চাই, ভারতের ছাগল, ভেড়া, কুকুর, গরুগুলি পর্য্যন্ত ভারতকে এমন গভীরভাবে ভালবাসুক, যেন ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য জীবন-বিসর্জ্জনে তারাও গৌরব অনুভব করে। কর্ম্মের দিকে যতটা হোক্ না হোক্, ভাবের দিকে আজ পূর্ণতা আসুক, প্রাণে প্রাণে প্রেমের বন্যা বইতে থাকুক, সেই বন্যার জলে হৃদয়ের পরতে পরতে পলি পড়ুক, তবে না আশা করব যে, এই মাটিতে শ্যামল-শস্পরাশি অভ্যুদ্গত হবে, কোমল পুষ্প-নিচয় গুচ্ছে গুচ্ছে প্রস্ফুটিত হবে।

চাই চিন্তা ও চিন্তাবীর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই জন্যই আমি চিন্তা-বীরদিগকে বেশী দামী ব'লে মনে করি। এমন চিন্তার প্রসার চাই, যে চিন্তা পাথরের মধ্য দিয়ে নিজের প্রবেশ-পথ ক'রে নেবে। এমন চিন্তা-প্রসারক চাই, যাঁরা গাধাকে দিয়ে ঘোড়ার কাজ করিয়ে নেবেন, ধূলিকণাকে দিয়ে পর্ব্বতের কাজ করিয়ে নেবেন, জলবিন্দুকে দিয়ে মহাসিন্ধুর বিশ্ববিধ্বংশী তরঙ্গালোড়ন সৃষ্টি কর্ব্বেন।

রহিমপুর

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৮

প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমের ইটের পাঁজার আগুনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। চট্টগ্রাম হইতে আগত ভক্ত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দেবগুপ্ত নিকটে আছেন। ভক্তটী গতকল্য প্রায় চৌদ্দ পনের মাইল দূর হইতে পদব্রজে আসিয়া আশ্রমের ইটের পাঁজার দুরবস্থা দর্শন করেন এবং বিশ্রাম ও আহার গ্রহণ না করিয়াই অগ্নিসংযোগের চেষ্টায় লাগিয়া যান। আজ প্রাতঃকালে ইটের পাঁজায় পূর্ণরূপে অগ্নিসংযোগের লক্ষণ দেখিয়া ভক্ত অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তৎপ্রসঙ্গে কথা আরম্ভ হইল।

কষ্ট ছাড়া কৃষ্ণ মিলে না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কাল যদি তোরা হতাশ হ'য়ে যেতিস্, তাহ'লে আজ

এই ধূমায়িত ইটের পাঁজার দৃশ্যটা দেখ্‌তে হত না। কষ্ট না কর্‌লে কি কেউ কৃষ্ণকে পায় ?

যোগীর কর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু আজ সকালে এসে যদি দেখা যেত যে, ইটের পাঁজায় আগুন ধরে নাই, সব নিভে গেছে, তা হ'লে কি তোর মনে কষ্ট হত ?

ভক্ত।—নিশ্চয়ই হ্ত। পাখার বাতাস কত্তে কত্তে কাল্ যে আমাদের বাহুর পেশী ব্যথা হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীবাবা।—কিন্তু এটা হ'ল অযোগীর উত্তর। যোগীর পক্ষে কর্ম্মই হচ্ছে ভগবদুপাসনা। যে কাজই করুন, তার ভিতর দিয়ে তিনি নিজেকে অনুক্ষণ ভাগবত-চৈতন্যে যুক্ত ক'রে রাখ্‌ছেন। সুতরাং করণীয় কর্ম্ম ক'রে ফেলেই তার চিত্ত নিরুদ্বেগ, তার ফল "সু" হ'ক আর "কু" হ'ক।

অলসকে কর্ম্মঠ করার উপায়

তারপরে অন্যান্য কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কাল্‌কে কিন্তু একটা জিনিষ বড় সুন্দর প্রত্যক্ষ হ'ল। যখন সবাই প্রাণান্ত উৎসাহে কাজ কচ্ছে, তখন চিরকালের অলসেরাও ব'সে থাক্‌তে পারে না। এ গ্রামের যারা কুঁড়ের বাদ্‌শা, কাল্‌কে তারাও অপ্রত্যাশিত পরিশ্রম করেছে। তারই জন্য না আমি বলি, অলসকে আলস্যের কুফল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা ক'রো না, তার চ'খের সাম্‌নে শ্রম-যজ্ঞে আহুতি দিতে থাক, এক একবার 'স্বাহা' বল্‌বে, আর এক একটা করে আলস্য বন্ধন তার ছিঁড়বে।

উপায় ও লক্ষ্য

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—কাল্‌কের ব্যাপার থেকে আরও একটা জিনিষ শিখ্‌বার রয়েছে। গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলের কি অদ্ভুত ঐক্য। কেউ কাউকে হুকুম কচ্ছে না, অথচ সবাই নিজ নিজ কাজ ক'রে যাচ্ছে! লক্ষ্যটা যখন সকলের হয় এক, তখন তর্ক-বিতর্ক আর দ্বন্দ্বযুদ্ধ ছাড়াই নির্দ্ধারিত হ'য়ে যায় যে, কে কোন্ কাজ কর্ব্বে। উপায় নিয়ে কলহ

করার আগে মানুষ যদি লক্ষ্য নিয়ে ঐক্য সাধন কৰ্ত্তে পারে, তা হ'লে উপায়-নির্দ্ধারণের জটিলতা অর্দ্ধেক কমে যায়।

প্রকৃত ঐক্যের লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন'—ঐক্যের কতকগুলি লক্ষণ আছে। ক'জন লোক যখন ঐক্যবদ্ধ হ'য়েছ, তখন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখো, এ সব লক্ষণ তাতে রয়েছে কি না। যেখানে ঐক্য রয়েছে, সেখানে পরস্পরে অবিশ্বাস নেই, অনাস্থা নেই, সন্দেহ নেই। যেখানে ঐক্য রয়েছে, সেখানে প্রত্যেকটী ব্যক্তি নিজের সুখ-সুবিধার চেয়ে অপরের সুখ-সুবিধার দিকে বেশী লক্ষ্য দেবে। যেখানে ঐক্য রয়েছে, সেখানে নিজের দেহমনকে সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মক্ষম রাখ্‌বার জন্য নিম্নতম সুবিধা যতটুকু দরকার, দাবী মাত্র ততটুকুর, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী এর উর্দ্ধে যাবে না। যেখানে ঐক্য রয়েছে, সেখানে পরস্পরের তুচ্ছ ত্রুটী বা খুঁটিনাটি পার্থক্যের উপরে জোর দেবার মত সঙ্কীর্ণতা কারো মনে থাকবে না। এই সব লক্ষণ যেখানে রয়েছে, বুঝ্‌তে হবে, ঐক্যের প্রস্ফুটন সেখানে ষোল-কলায় হ'য়েছে।

ঐক্যের সুফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ঐক্যরূপ সূর্য্যের উদয় হ'লে আত্ম-অবিশ্বাসরূপ অন্ধকার দূর হয়, দুর্ব্বলেরও মনে সাহস জাগে, ভীরু কাপুরুষও হৃদয়-বীণায় দীপক রাগের ঝঙ্কার শুন্‌তে সুরু করে। ঐক্যবদ্ধ হ'লে মানুষ অপর সঙ্গীদের তুলনায় নিজের দোষ-ত্রুটীগুলি হতাশাক্রান্ত না হ'য়েও ধর্ত্তে পারে এবং সহজে নিজেকে সংশোধিত ক'রে নিতে পারে। যে যত অধিক লোকের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে নিতে সমর্থ হয়েছে, জান্‌বে, সে ভগবানের দিকে তত অগ্রসর।

পাঁচটী লোক কি করিতে পারে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বেশী নয়, মাত্র পাঁচটী সমশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যদি এক মনে এক প্রাণে ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে তারা হিমালয়-শৃঙ্গ উপড়ে ফেলে দিতে পারে, মহাসাগর শুষে দিতে পারে। জগতে কিছুই অসম্ভব নয়, সমপ্রাণ, সমমনা, সমবুদ্ধি, সমমেধা, সমশক্তি, সমচেতা পাঁচটী মাত্র লোক যদি

একটী মহদাদর্শের পতাকার নীচে এসে দাঁড়ায়। এঁদের কাছে কিছুই অসম্ভব নেই।—কিন্তু পাঁচটী লোক কি মিলতে চায়?

মিলনের বাধা

ঠিক এই সময়ে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আসিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে প্রণাম করিলেন এবং আলোচনায় যোগদান করিলেন। তিনি বলিলেন,—বাবা, মিলনের বিঘ্ন ত' গোঁসাইগিরি। যাঁর একটু শক্তি আছে, সেই ত' একটা ভিন্ন দল করবে, সেই ত' একটী নূতন নেতা হবে। মিলন হবে কি করে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ঠিক্ আমারই মুখের কথাটা কেড়ে নিয়েছ। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ না থাকলেও মানুষের চলে না, আবার এই জিনিষটীই প্রবল হ'লে তা হয় মিলন-পথের প্রবল অন্তরায়।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও আত্ম-বিলোপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আর আত্ম-বিলোপ সামাজিক দৃষ্টিতে দু'টারই প্রয়োজন সীমাবদ্ধ। মানুষকে পশুত্বের স্তর থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে তুলে আনতে প্রবল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রয়োজন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ তমোগুণকে শুদ্ধ করে, রজঃ-প্রেরণা দেয়। পশুবৎ মানবের জন্য এই জিনিষটী শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, তার পক্ষে এইটী হচ্ছে উদ্ধারকর্ত্তা। তার পক্ষে আত্ম-বিলোপ আধোগতির বর্দ্ধক, সুতরাং সর্ব্বনাশকর। কিন্তু রজঃ-প্রবুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে সত্ত্বগুণাভিমুখিতাই ক্রমোন্নতি-সূচক। তার পক্ষে আত্ম-বিলোপের চেষ্টাই আবশ্যক, কেন না, এতে তার মানবত্ব দেবত্বকে পাবে।

আত্ম-বিলোপের সাধনাই পরম সাধনা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আত্ম-বিলোপের সাধনাই একমাত্র সাধনা। এই বিলোপ কোনো মানুষের কাছে নয়, কোনো দলের কাছে নয়, কোনো মতের কাছে নয়, কোনো পথের কাছে নয়, এই আত্ম-বিলোপ সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের কাছে। নিজের নিজস্বতা, নিজের কর্ত্তৃত্ব-বোধ, নিজের অহমিকা, এমন কি নিজের অস্তিত্বাভিমান পর্য্যন্ত ভগবানের

অমৃতময় সত্তায় ডুবিয়ে দেওয়া। এর চেয়ে বড় ধর্ম্ম নেই, এর চেয়ে বড় পুণ্য নেই, এর চেয়ে বড় সার্থকতা নেই। তোমাদের উপরে আমার যদি কোনও আশীর্ব্বাদ কর্‌বার থাকে, তবে তা হচ্ছে এই যে, তোমরা সবাই অখণ্ড আনন্দময় শ্রীভগবানে ডুবে যাও।

ভগবানে আত্ম-বিলোপের দ্বারা বিশ্বভুবন আপন হয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাঁরা সমাজের সেবা প্রভৃতি বহির্ম্মুখ জীবহিতমূলক কাজ নিয়ে ব্রতী আছেন, তাঁরা এইরূপ আশীর্ব্বাদকে অভিসম্পাত ব'লে মনে ক'রে থাকেন। কারণ, তাঁরা তাঁদের গৃহীত কর্ম্মপন্থায় এত বিশ্বাসী যে, পন্থার দিক্ দিয়ে নিখিল জগতের মিল যে কখনো হবে না বা হ'তে পারে না, তা কখনো বুঝ্‌তে রাজি নন। কিন্তু ভগবানে যে আত্মবিলোপ ক'রেছে, তার কাছে গতির চেয়ে গন্তব্যের ঐক্যের দাম বেশী, পথের চেয়ে লক্ষ্যের একতানতা অধিকতর কাম্য। জগতের যত জন যত কাজ কচ্ছে,—তিনি দেখেন, সবাই কচ্ছে ভগবানের কাজ। জগতের যত জন যত পথে চলেছে,—তিনি দেখেন, সবাই চলেছে ভগবানের পানে। কাউকে তিনি কারো চাইতে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট দেখেন না, তিনি দেখেন, সবাই নিজ নিজ অধিষ্ঠান-ভূমিতে শ্রেষ্ঠ, সবাই নিজ নিজ আবেষ্টনীর মধ্যে কর্ম্মী, কাউকে প্রশংসা কাউকে নিন্দা তার উপলব্ধির বাইরে। তিনি জানেন, জগতের যত ভিন্ন ভিন্ন মত, সব একটী আর একটীর অনুপূরণ কচ্ছে, দেখ্‌তে যারা পরস্পর-বিরোধী, তারাও একটা আর একটার মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যকে আস্বাদ-যোগ্য কর্‌বার জন্য চিরকাল বেঁচে রয়েছে, চির্‌কাল বেঁচে থাক্‌বে। শত দ্বন্দ্বে শত দ্বিধায় চিত্ত তাঁর আর পীড়িত হয় না, ভগবানকে আপন জেনে সবাইকে তিনি আপন জেনেছেন যে! আপন জনের আচরণ কখনো মন্দও হয় না, দোষেরও হয় না।

আশ্রম-বাসের মানে

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমের একটী বালককে বলিলেন,—আশ্রমে বাস করার মানে কিরে? কোদাল মারা আর খিচুড়ী খাওয়া? নিশ্চয়ই নয়।

পবিত্র থাকাই আশ্রমবাসের উদ্দেশ্য। অনুক্ষণ বিচার করবি, পবিত্র হচ্ছিস্ কি না, মনের ময়লা দিনের পর দিন ক্রমেই কেটে যাচ্ছে কি না।

রহিমপুরের পরিশ্রম

দ্বিপ্রহরের আহারের পরে শ্রীশ্রীবাবা মুঙ্গের জেলায় অবস্থিত তাঁহার জনৈক প্রিয় কর্ম্মীকে পত্র লিখিতে বসিয়া নানা কথার প্রসঙ্গে লিখিলেন,—

"কাজ করিতে করিতে আমার ও শ্রীমান্ শ'—র হাত শিরিষ কাগজের মত হইয়া গিয়াছে। পত্র লিখিতে কষ্ট হয়। তবু লিখি গায়ের জোরে।"

রহিমপুর

৫ই ফাল্গুন, ১৩৩৮

অদ্য বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যার সময়ে সমবেত উপাসনা হইল। উপাসনান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিতে লাগিলেন।

একনিষ্ঠা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একলক্ষ্য হও। সমগ্র মন, সমগ্র শক্তি একটী লক্ষ্যকে লাভ কর্ব্বার জন্য দিয়ে দাও। দশ দিকে মন দিও না। পাঁচটী পতির সেবা জগতে একা দ্রৌপদীই পেরেছিলেন, কিন্তু দুইটী দ্রৌপদী ত' আর দেখা গেল না। তোমরা দ্রৌপদী হ'তে চেও না, তোমরা সীতার মত হও, তোমরা হনুমানের মত হও, তোমরা শ্রীরাধার মত হও। একজনকেই ভালবাস, একজনকে নিয়েই প্রেমের মধুর সম্বন্ধ স্থাপন কর, একজনের জন্যই বেঁচে থাকো, একজনের জন্যই মৃত্যুবরণ কর। পোষাকী প্রেম দশজনকে দেওয়া যায়, প্রাণের প্রেম মাত্র একজনেরই প্রাপ্য। দশ দিকে যারা তাকায় নাই, তারা কেমন ভাগ্যবান্। কি গভীর তাঁদের শান্তি, কি গভীর তাঁদের তৃপ্তি!

পাঁচকিত্তা, ত্রিপুরা

৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৮

অদ্য প্রাতে দশ ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা রহিমপুর হইতে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সূর্য্যবাবু এবং শ্রীমান পঞ্চাননকে সহ পাঁচকিত্তা শ্রীযুক্ত অন্নদা চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আসিয়াছেন।

সৎকার্য্যেই সঙ্ঘবদ্ধতা চাই

গ্রামের লোকের সঙ্ঘ-বদ্ধতার অভাব সম্বন্ধে একজন ব্যক্তি কিছু বলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা তদুত্তরে বলিলেন,—সঙ্ঘবদ্ধতার যে খুবই প্রয়োজন আছে, একথা কে অস্বীকার কত্তে পারে? কিন্তু সৎকার্য্যেই সঙ্ঘবদ্ধতা হিতকর, অসৎকার্য্যে সঙ্ঘবদ্ধতা সর্ব্বনাশের জনক। দশজনে মিলে সম্মতি দিলেই অসৎ কাজ কখনো সৎ হয় না। সঙ্ঘবদ্ধতা সৃষ্টি করার আগে চতুর্দ্দিকে সদ্ভাবের প্রসার আবশ্যক। গ্রামের প্রত্যেকটী লোককে উচ্চ চিন্তায় আগে অনুপ্রাণিত কর। তবে ত' সকলের মনে সৎকর্ম্মে সহযোগিতা কর্ব্বার বুদ্ধি আস্‌বে। সঙ্ঘবদ্ধতা নেই ব'লে দুঃখ প্রকাশ না ক'রে, আগে সকলে চেষ্টা কর পল্লীর ভিতরে সৎভাবের চর্চ্চা বৃদ্ধি কত্তে। ভাল ক'রে ভেবে দেখ, ভাবের জন্ম আগে, না সঙ্ঘের জন্ম আগে? ভেবে দেখ, ভাব থেকে সঙ্ঘ হয়, না সঙ্ঘ থেকে ভাব হয়? ভাব থেকে যদি সঙ্ঘ হয়, তবে, কেমন ভাব থেকে হয়? সঙ্ঘ থেকে যদি ভাব হয়, তবে কেমন সঙ্ঘ থেকে হয়? সব রকমের ভাবই কি সঙ্ঘের জন্ম দিতে পারে? দুর্ব্বল ভাব, তরল ভাব, কি ঐক্যের সূত্র রচনা কত্তে পারে? আদর্শ-বর্জ্জিত সঙ্ঘ কি কোনও বলবান্, সুদৃঢ় ও তেজোব্যঞ্জক ভাবকে সম্প্রসারিত কত্তে পারে? এসব আগে ভাব, ভেবে ভাবের প্রচার সুরু কর, একটি কথা একজনের কাণে শতবার প্রবেশ করাও, এই কথাটী নিয়ে স্বাধীন-ভাবে তাকে চিন্তা কত্তে বাধ্য কর, সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে ভাল ক'রে তাকিয়ে দে'খে তার পরে একটা সঙ্কল্পে সুস্থির হবার মত সুযোগ ও অনুকূল পরিমণ্ডল তাকে দাও,—এত কাণ্ডের পরে ঠিক কর, সঙ্ঘ তোমাদের হবে কিনা। কথায় বলে, ফাঁকি দিলে টাকি মাছ মিলে, কিন্তু শৌল মাছ মিলে না।

ফকীর মহম্মদ গফুর

অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীবাবা গ্রামের মাঠে বেড়াইতে বাহির হইলেন। একটা ক্ষেতের আইল পার হইতেছেন, এমন সময়ে একজন সাধুর-মত-দেখিতে মুসলমান সজ্জন শ্রীশ্রীবাবাকে তাঁহার কুটীরে আহ্বান করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা সানন্দচিত্তে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

মুসলমান সজ্জনটীর নাম মহম্মদ গফুর। তাঁহার বাড়ী পৌছিতেই তিনি যথাযোগ্য আসনের ব্যবস্থা করিয়া সাষ্টাঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাকে প্রণাম করিলেন। দুটি একটি কথা বলিতেই প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, গফুর একজন উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা-সম্পন্ন ফকীর। ফকীর সাহেবের দুই একজন সহযোগী ভক্তিভাবমূলক সঙ্গীত করিতে লাগিলেন এবং ফকীর সাহেব ও শ্রীশ্রীবাবার মধ্যে সাকার ও নিরাকার সম্পর্কে আলোচনা চলিতে লাগিল। গ্রামবাসী যাঁহারা সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা গফুর সাহেবের এই একটি অপরূপ পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইলেন।

স্পষ্ট বুঝা গেল, গফুর সাহেব সাকার উপাসনার সমর্থন-কল্পেই দুই চারিটি কথা যেন শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

সাধনাই শান্তি দেয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাকারত্ব বা নিরাকারত্ব কথাটীর উপরে জোর না দিয়ে জোর দেওয়া উচিত 'উপাসনা' কথাটীর উপরে। আকার ভাল, না নিরাকার ভাল, তা নিয়ে তর্ক জগতে ঢের হয়েছে। কিন্তু তর্ক থেকে ত' আর অমৃত ওঠে নি। অমৃত উঠেছে, সাধনা থেকে। যে সাধন করেছে, সেই অমৃত পেয়েছে, সেই অমর হয়েছে, সেই শান্তি পেয়েছে। অতএব, যার যে ভাবে ভাল লাগে, তার সেইভাবে সাধন ক'রে যাওয়াই মঙ্গল। কে কোন্ ভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছে, তার উপরে তার কৌলীন্য বা সার্থকতা নির্ভর করে না, নির্ভর করে, কে কতটা গভীর ভাবে আত্মসমর্পণ কত্তে পেরেছে, তার উপর।

আত্মসমর্পণের ফল অভয় ও শান্তি

ফকীর সাহেব প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীবাবা উত্তরে বলিলেন,—যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছে, সে নির্ভয় হয়েছে। এই নির্ভয়তা সৈনিকের নির্ভয়তার মত নয়, যে নির্ভয়তায় পরের প্রতি হিংসা থাকে। এ নির্ভয়তা সর্ব্বজীবে প্রীতি-মূলক ও সর্ব্বজীবের হিতৈষণায় পূর্ণ। যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছে, পর-চর্চ্চায় তার প্রীতি নেই, পরানিষ্টে তার রতি নেই, পরের অমঙ্গলে তার আনন্দ নেই। তার প্রাণ বিমল শান্তিতে ভরা। সে শান্তিকে শুধু সুগভীর তৃপ্তি ব'লে মনে কর্লেই হবে না, সে শান্তি সকল চিত্তবৃত্তির শান্তি, কাম-ক্রোধের

শান্ত, হিংসা-দ্বেষের শান্তি, সে শান্তি নিজেরও শান্তি, জগতেরও শান্তি।

গফুরের মূর্ত্তিপূজা

শ্রীযুক্ত গফুরের আঙ্গিনায় বসিয়া এই সব কথা হইতেছিল। কথার অবসরে সকলকে বাহিরে রাখিয়া শ্রীযুক্ত গফুর শ্রীশ্রীবাবাকে নিয়া কুটীরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা দেখিলেন,—একখানা কালী মূর্ত্তি এবং একখানা রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি আসনের উপরে সংরক্ষিত। নিত্য তাহাতে পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা পূজা করা হইতেছে। এতক্ষণে শ্রীশ্রীবাবা বুঝিলেন যে শ্রীযুক্ত গফুরের গৃহের চতুর্দ্দিকে জবা, টগর, নন্দদুলাল, গন্ধরাজ প্রভৃতি নানাবিধ ফুলের গাছ কেন দেখা গিয়াছিল।

শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—মূর্ত্তিপূজা ক'রে প্রাণে আনন্দ পাচ্ছ গফুর ?

শ্রীযুক্ত গফুর কোনও উত্তর করিলেন না। তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এখানে বলা প্রয়োজন, শ্রীযুক্ত গফুর নিম্নশ্রেণীর মুসলমান নহেন। জন্ম তাঁর মোল্লা পরিবারে, পীর-বংশে।

কবি সাহামুদ্দিন

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া সাহামুদ্দিন নামক জনৈক গায়কের বাড়ী গেলেন। আঙ্গিনায় বিস্তীর্ণ বিছানা পাতা হইল। শ্রীশ্রীবাবার পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীবাবার অনুমতি লইয়া শ্রীযুক্ত সাহামুদ্দিন গান আরম্ভ করিলেন। সাহামুদ্দিন অশিক্ষিত কিন্তু প্রায় দুই তিন শত সঙ্গীত তিনি রচনা করিয়াছেন।

তিনি গাহিতে লাগিলেন,—

"চল্ দেখি মন ত্রিবেণীর ঘাটে,
স্নান ক'রে তুই শান্তি পাবি
মুক্তি পাবি হাতে হাতে।"

সুমধুর সুর-সহকারে তিনি আরও দুইটী সঙ্গীত গাহিবার পরে গান ধরিলেন,—

"নও সাকার, নও নিরাকার,
যথা জীব তথাকার,
যে তোমার দেখেছে আকার
সকলি তার একাকার।"

কিন্তু সকলে কি এই সমন্বয়ের তত্ত্ব বোঝে? না বুঝিয়া কতই না গালি দেয়। তত্ত্বদেশের দেশী না হইলে কি কেহ এই মধুর আস্বাদ কেমন তাহা বুঝিতে সমর্থ হয়? তাই গানটির শেষ চরণে বর্ণিত হইল,—

"বিদেশীরা পাগল বলে
স্বদেশীরা দেয় বাহার।"

এ সকল গান সমস্তই সাহামুদ্দিনের নিজ রচনা।

গৌরাঙ্গের মা

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা "গৌরাঙ্গের মা" নামধেয়া একটী ভক্তিমতী সাধিকার গৃহে সদলবলে গমন করিলেন। ইনি সাহা জাতীয়া একটী মধ্যবয়স্কা রমণী। ইহার স্বামী আছেন, দুই তিনটী সন্তান আছে। ইনি "শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে" নিজের সন্তান বলিয়া জ্ঞান করেন এবং "শচীমাতার" ভাব লইয়া সাধনা করেন। ব্যক্তিমাত্রকেই ইনি গৌরাঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং বাৎসল্য-রসের আশ্রয়ে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিয়াছেন। একখানা 'গৌরাঙ্গের ঘর' আছে, নিকটেই তুলসী-মঞ্চ ও বিল্বমূল। শ্রীশ্রীবাবা সেইখানেই বসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবাকে পাইয়া শ্রীযুক্তা গৌরাঙ্গের মা যেন ভাবে গদগদ। তিনি শ্রীশ্রীবাবাকে ভোগ নিবেদন করিলেন এবং তৎপরে ভক্তবৃন্দসহ "জয় গৌরাঙ্গ" "জয় গৌরাঙ্গ" বলিতে বলিতে প্রসাদ পাইলেন।

কীর্ত্তনের আনন্দে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড দ্রবীভূত কর

শ্রীযুক্ত অন্নদা চক্রবর্ত্তীর গৃহে ফিরিয়া আসিতে আসিতে রাত্রি হইল,

তৎপরে নাম-কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সকলেই প্রাণের আনন্দে কীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ প্রদান করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কীর্ত্তন কর, তাঁর মধুময় নামের, যিনি নিখিল বিশ্বকে নিয়ে এক। কীর্ত্তন কর, মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে, বাহিরের বিশ্বের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়ে। কীর্ত্তন কর, নিজের প্রাণকে দ্রবীভূত ক'রে, আর কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীকে গলিয়ে। তোমার কীর্ত্তন তোমারও বেদনা নাশ করুক, কোটি ব্রহ্মাণ্ডেরও ব্যথা দূর করুক।

৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৮

সিদ্ধত্বের লক্ষণ

পাঁচকিত্তা হইতে নিলখি যাইবার পথে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত আলোচনা হইতেছিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিশ্চিন্ততাই সিদ্ধত্বের লক্ষণ। নিরুদ্বেগ না হ'লে যত শিষ্যেরই গুরু তুমি হও, তুমি সিদ্ধ নও।

নিরুদ্বেগ হইবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধন ছাড়া সিদ্ধত্ব হয় না। যে-কোনও একটা ভাবের কাছে আত্ম-সমর্পণ ক'রে একেবারে তাতে ডুবে না যেতে পালে কেউ নিরুদ্বেগ হ'তে পারে না। হয় ভাবো, তুমি তাঁর, সুতরাং তোমার জন্য তোমার কোনো দায়িত্ব নেই, তোমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তোমার জন্য ভাব্‌বার দায়িত্ব তাঁর, উদ্বেগ অনুভব করার প্রয়োজন থাক্‌লে তা তিনিই কর্ব্বেন ; নয় ভাবো, তুমিই তিনি, সুতরাং সমুদ্রের যেমন তার তরঙ্গকে ভয় কর্ব্বার কারণ নেই, সিংহের যেমন তার কেশরকে ভয় করা নিষ্প্রয়োজন, হিমাচলের পক্ষে যেমন তার শৃঙ্গ আর গুহা, পাথর আর বরফকে ভয় করার আবশ্যকতা নেই, তেমনি জগতের কোনও ঝড়, কোনও উৎপাতকেই ভয় করার তোমার কারণ নেই।

রামচন্দ্র কেন কাঁদিয়াছিলেন

শ্রীযুক্ত গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—রামচন্দ্র কেন সীতার শোকে কেঁদেছিলেন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে জন্যই কেঁদে থাকুন, সাক্ষ্য দেবার জন্য ত' আর তিনি তোমার সামনে নেই। সুতরাং তাঁর এ কান্নাকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা দাও, যেই ব্যাখ্যায় তোমার লাভ হয়।

প্রশ্ন :—কি ব্যাখ্যা দিব? তিনি মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে সাধারণ জীবের মত শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করেছিলেন?

শ্রীশ্রীবাবা :—না, তাতে তোমার লাভের ভাণ্ডার পূর্ণ হয় না, খালি হয়। স্বামী হিসাবে স্ত্রীর জন্য তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রে তাঁর কর্ত্তব্য পালন করে-ছিলেন। মানুষরূপী দেবতা মানুষ-জীবনের ভিতর দিয়ে মানুষ-জীবনের সুন্দরতম অভিনয় ক'রে গেছেন। মানুষ-জীবনের এ অভিনয় তাঁর কত কোমল, কত করুণ। কিন্তু এখানেই তাঁর কর্ত্তব্যে ইতি হয় নি। তিনি রুদ্র-রূপ ধারণ ক'রে স্ত্রীকে উদ্ধারের জন্য সমরাঙ্গণেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মহৎ জীবনের ভালটুকু খোঁজ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কর্ত্তব্যপালন আর অন্তরের স্থৈর্য্য এই দুইটী জিনিষের মধ্যে সাধারণ মানুষেরা সামঞ্জস্য স্থাপন কত্তে পারে না। 'যোগীরাই পারেন, ঋষিরাই পারেন, সাধকেরাই পারেন। এই জন্য লোকে তাঁদের অবতার ব'লে পূজা কত্তে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হয় না। মহৎ জীবনের আচরণগুলিকে যতটা সম্ভব নিজ লাভের দিক দিয়ে বিচার ক'রো। হিমালয়ের পাথরে ফুটো খুঁজে বেড়ান আর কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফের মাঝে কালো দাগ খুঁজে বেড়ান কিন্তু লাভের ব্যাপার নয়। চাঁদের জ্যোৎস্নায় আমার লাভ আছে, শশচিহ্নে কোন লাভ?

সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা পদব্রজে হোমনা থানার অন্তর্গত নিলখি গ্রামে আগমন করিলেন। পাঁচকিত্তা হইতে নিলখি প্রায় আট নয় মাইল হইবে।

একটী নামেই নির্ভর কর

রাত্রি প্রায় নয়টা হইবে, এই রকম সময়ে একটী যুবক সাধন-ভজন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানকে ডাকৃতে তাঁর একটীমাত্র নামের উপরে সম্যক্ নির্ভর কর। নদীর তীরে গেলে নৌকা অনেক পাবে, কিন্তু উঠ্‌তে হবে তোমাকে একটী নৌকাতেই, দুই নৌকাতে পা দেওয়ায় কোন লাভ হবে না। ভগবানের সব নামই সত্য, সব নামই শান্তির আকর, সব নামই দুঃখ-বিনাশন, সব নামই প্রেম-মধু'র খনি, কিন্তু এক সঙ্গে সব সাধন কত্তে যেও না। একটীকেই সাধন কর, একটীতেই মজ, একটীতেই ডোব, একটীকে নিয়েই জন্ম-কর্ম্ম সার্থক কর। "এক সাধে ত' সব সাধে, সব সাধে, সব যায়।"

ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের পার্থক্য বাহ্যতঃ মাত্র

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভিন্ন ভিন্ন না'ও, তাদের প্রভেদ শুধু আকারে, গুণে নয়। সব নৌকাই এপার থেকে ওপারে নিতে পারবে, ছোট হোক্ আর বড় হোক্, তাতে কিছু আটকাবে না। লাল হোক্ আর নীল হোক্, তাতেও কিছু আটকাবে না। কাঠের হোক্ আব লোহার হোক্, তাতেও কিছু আট-কাবে না। শক্ত ক'রে হাল ধ'রে নিষ্ঠা নিয়ে লেগে যদি থাক, তবে মাটির গামলায় ব'সেও তুমি নদী পার হ'য়ে যেতে পার্ব্বে। এ নৌকা কোন্ কার-খানা থেকে বেরিয়ে এসেছে, নৌকার গলুইতে কোন্ মিস্ত্রীর নাম খোদান রয়েছে, তাতেও কিছু যাবে আসবে না। সব নৌকারই শক্তি এক,—যাত্রীকে একপার থেকে আর এক পারে নিয়ে যাওয়া। কোনও নৌকায় একটু আরাম বেশী, কোনও নৌকায় আয়াস বেশী, কিন্তু এই আরামে আর আয়াসে বিশেষ যায় আসে না, যদি তুমি একটী নৌকাতেই প্রাণপণে হাল ধ'রে থাক আর নির্ভরের পাল তু'লে দাও। ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন নাম আকারেই পৃথক, গুণে পৃথক নয়। কুইনাইনের বড়ী খেলেও ম্যালেরিয়া যায়, গুঁড়ো খেলেও ম্যালেরিয়া যায়, মিক্শ্চার খেলেও ম্যালেরিয়া যায়। আকারেই তারা পৃথক, বস্তুতে তফাৎ নয়।

পরধর্ম্মে বিদ্বেষ করিও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নদী পার হ'তে সময় সময় এক নৌকার সাথে অপর নৌকায় ধাক্কা-ধাক্কি লাগে। এ হচ্ছে সর্ব্বনাশের গোড়া। তোমা

নৌকা তুমি চালাও, তোমার সাধন তুমি কর, অপরের নৌকার উপরে আঘাত না দিয়ে, অপরের সাধনে, অপরের মন্ত্রে নিন্দা, বিদ্বেষ বা গ্লানি পোষণ না ক'রে। অপর মত আর অপর পথকে বিদ্বেষের চোখে দে'খো না, কেন না তাতে তোমার নিজেরই সর্ব্বনাশ হবে। চতুর সাধক তাঁরা, যাঁরা এক কণা শক্তিও পর-দোষের উদ্ঘাটনে অপব্যয়িত করেন না।

নিলখি, ত্রিপুরা
৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৮

অদ্য প্রাতে নয়টার সময়ে নিকটবর্ত্তী একটী মঠের মোহান্ত শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছেন। মোহান্ত মহাশয়ের বিনয় ও নম্রতা দর্শনে শ্রীশ্রীবাবা মুগ্ধ হইলেন।

নির্ভরই প্রয়োজনীয়

মোহান্ত মহারাজ কিঞ্চিৎ উপদেশের প্রার্থী হইলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিখিল ভুবনে আর কোনো উপদেশের প্রয়োজন নেই, শুধু এইটুকু বাদে যে, আমার কি প্রয়োজন, আমার চেয়ে ভগবান তা বেশী জানেন, সুতরাং দেহি দেহি ব'লে তাঁর কাছে প্রার্থনা করায় কোনও প্রয়োজন নেই। সে আবার কেমন মা, ছেলের ক্ষুধা পেয়েছে কিনা যে বুঝে না? যা যখন কর্ত্তব্য বোধ করব, সেই মত পরিশ্রম ক'রে যাব, ভগবানের কাছে পারিশ্রমিক দাবী করব না, তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি তা' দেবেন, না হয় না দেবেন, আমি নিঃশব্দে কাজ ক'রেই তৃপ্ত, এই হবে সাধকের আদর্শ। যখন যা প্রয়োজন, তিনি তাঁর অপার প্রেমবশে তা দেবেন, আমি সৎ হই, সাধু হই, অকপট হই, নিষ্কাম হই, জগতের প্রয়োজন বুঝে তিনি প্রাপ্যের অতিরিক্ত শতগুণও দেবেন। তাঁর উপরে সর্ব্বকালে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবে নির্ভর ক'রে থাকাই হচ্ছে আমার তপস্যা।

নির্ভর বনাম অলসতা

মোহান্ত মহারাজ বড়ই পরিতৃপ্ত হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—হাত পা ছেড়ে দেওয়ার মানে নির্ভর নয়,

তার নাম অলসতা বা ক্লৈব্য। ফলাফল ভগবানের হাতে সঁপে রেখে, ভাল মন্দ কোনও ফলের প্রতিই সোল্লাস বা সবিষাদ দৃষ্টি না দিয়ে, কর্ত্তব্য ক'রে যেতে হবে। কোন্‌টা কর্ত্তব্য কোন্‌টা অকর্ত্তব্য, তা নির্দ্ধারণের জন্য তাঁরই মুখপানে তাকাব, কিন্তু কর্ত্তব্য ব'লে কিছু বোঝবার পরে আর বিশ্রাম কর্‌ব না, সিংহ-বিক্রমে শ্রম কত্তে লেগে যাব। সমগ্র পুরুষকারকে তাঁরই কার্য্য সাধনের জন্য প্রয়োগ করার নামই নির্ভর।

দুর্ব্বলের নির্ভর ও সত্যিকারের নির্ভর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দুর্ব্বলেরা ক্লীবতাকেই অনেক সময়ে নির্ভর ব'লে ভ্রম করে। তাই ভগবন্নির্ভর লাভ কত্তে হলে প্রথমে কত্তে হয় আত্মনির্ভরের সাধনা। নিজের শক্তিতে বিশ্বাস এলে তার পরে লক্ষ্য পড়ে তাঁর উপর, যাঁর কাছ থেকে এসেছে নিজের সব শক্তি। তখন তাঁর পবিত্র অভিপ্রায়ের উপরে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়ে নিজের সমগ্র শক্তিকে তাঁরই কার্য্য সাধনের জন্য ভয়হীন কুণ্ঠাহীন মনে প্রয়োগ কর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা হয়; কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষাতেও থাকে কত কলুষ, কত কর্ত্তৃত্বের লোভ, কত যশের লোভ। কিন্তু তাঁর কাজকে বহিরাচাররূপে এবং তাঁর নামকে অন্তরারামরূপে গ্রহণ ক'রে যুগপৎ ভিতরে বাইরে সাধন কত্তে কত্তে মহাবলের-দুর্ব্বলতা যশোলোভ দূর হ'য়ে যায়। তখনই সত্যিকার নির্ভর আসে।

বিশ্বাস ও নির্ভর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নির্ভরশীল ব্যক্তির ভগবদ্বিশ্বাস সমুদ্রবৎ অতলস্পর্শ। বিশ্বাসশীল ব্যক্তির নির্ভর হিমাচলবৎ অটল অচল। বিশ্বাস আর নির্ভর যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ। একটীকে ছেড়ে আর একটী থাকে না। একটী এলেই অপরটী এল। অথবা নির্ভর ও বিশ্বাস যেন একই বস্তুর মাত্র দুইটী পৃথক ভঙ্গিমা। বিশ্বাস যেন প্রাণপ্রিয়ের জন্য বিছান শাদা ধবধবে একখানা অতি কোমল কমলাসন, নির্ভর যেন বজ্রভীতি-তুচ্ছকারী দেবমন্দিরের স্পর্দ্ধিত শির। নির্ভর যেন ভগবদ্বিশ্বাসের রুদ্রতেজ, বিশ্বাস যেন ভগবন্নির্ভরের স্নিগ্ধ মধু।

নিলখির বক্তৃতা

অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর গৃহে একটী সভার ব্যবস্থা করা হইল। নিলখি এবং পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী গ্রামের ধর্ম্মপ্রাণ বহুব্যক্তির শুভাগমন ঘটিল। প্রায় শতাধিক মুসলমানেরও সমাগম হইল।

ভগবানকে পাইবার পথ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানকে পাওয়া যায়, প্রেমের ভিতর দিয়ে, ভালবাসার ভিতর দিয়ে, অন্তরঙ্গ সাধনার ভিতর দিয়ে। চালাকীর ভিতর দিয়েও নয়, আড়ম্বরের ভিতর দিয়েও নয়, বিদ্বেষের ভিতর দিয়েও নয়।

ধর্ম্ম কোন্ পথে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কলহ আর কুটিলতা সৃষ্টি ক'রে ক'রে যারা মনে করে যে, ভগবানকে তারা প্রীত কচ্ছে, তারা ভ্রান্ত, তারা অন্ধ। মানুষের প্রাণে আঘাত ক'রে যারা মনে কচ্ছে, তারা ধর্ম্ম কচ্ছে, তারা অবোধ, তারা অজ্ঞান। নিখিল ভুবনকে নিয়ে আনন্দোল্লাসে-মুখরিত উৎসব যে পথে, ধর্ম্ম সে পথে। সকলের মুখের ম্লানিমা, সকলের মনের বেদনা, সকলের কণ্ঠের কাতরতা অবসান পাবে যেই পথে, ধর্ম্ম সেই পথে। ভেদ-বিসম্বাদ ভুলে গিয়ে, ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ বিস্মৃত হ'য়ে সবাইকে সবাই প্রেমভরে আলিঙ্গন দেবে যেই পথে, ধর্ম্ম সেই পথে।

ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু হায়, কতজন জগতে ধর্ম্মের নামের ধ্বজা তুলে জগতের উৎসব-মুখরিত প্রেমাঙ্গণগুলিকে শোকের হাহাকারে পূর্ণ কত্তে বদ্ধ-পরিকর। ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কতজন সদাহাস্য-সমুজ্জ্বল শত শত মুখে দুঃখের বজ্র হেনে বেড়াচ্ছে। সত্যের নামে অসত্য, ভালোর নামে মন্দ, পুণ্যের নামে পাপ দিকে দিকে তাণ্ডব-নর্ত্তন কচ্ছে।

সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যতটুকু দেখা যায়, যতটুকু বুঝা যায়, বর্ত্তমানে এর মূল সাম্প্রদায়িকতায়। অথচ কেউ একটু খুঁজে দেখে না, সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হ'ল কেন, হ'ল কিরূপে। ক্ষুদ্র খাল নিজের বলে সমুদ্র পর্য্যন্ত পৌছুতে পারে না, সামান্য

তার জল, সামান্য তার স্রোত, সামান্য বাধায় তার গতি হয় রুদ্ধ, এজন্য শত শত খাল, শত শত উপনদী সম্মিলিত হ'য়ে মহানদীতে পরিণত হয় এবং সবলে সবেগে সোৎসাহে সাগরের দিকে চলে। এরই নাম সম্প্রদায়। কিন্তু বন্ধু, তোমরা কচ্ছ কি? ভগবানের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবার জন্যই কি দলবদ্ধ হও? না, তাঁর কাছ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছ?

অন্তর্ম্মুখী হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাইরের সহস্র কোলাহলের দিক্ থেকে মনকে টেনে আন। নিজের ভিতরে প্রবেশ কর। নিজের অন্তর অনুসন্ধান কর। নিজের মূল্য নির্দ্ধারণ কর। কতটা এগুচ্ছ, কতটা পিছুচ্ছ, তার হিসাব লও। চুপ ক'রে ভাবো,—ছিলে কি, হলে কি, হবে কি,—তবে ধর্ম্মের হদিস্ পাবে। কতজন কত কথা কাণে কাণে ব'লে যাচ্ছে, সেই সব কাণাকাণির ভিতরে তাজা প্রাণের পরশ কতখানি আছে আর হিংসা-বিদ্বেষ-ঈর্ষ্যার পূতিগন্ধ কতখানি আছে, তার বিচার হবে, বাইরের কোনও লোকের চরিত্র বা আচরণ বাক্য অথবা ভঙ্গিমা, প্রভৃতির উপরে নয়,—তার বিচার নির্ভর কর্‌বে তোমার নিজের অন্তরের স্বচ্ছতা, সুন্দরতা আর অনবদ্যতার উপরে। অন্তর্ম্মুখী হও, অন্তরে ডোব, তবে ধর্ম্মকে পাবে।

চম্পকনগর, ত্রিপুরা

৯ই ফাল্গুন, ১৩৩৮

অদ্য প্রাতে আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা চম্পকনগর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সাহা মহাশয়ের বাড়ীতে শুভাগমন করিলেন। নিলখি হইতে কয়েকটী ধর্ম্মপিপাসু যুবক শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে আসিয়াছেন।

বহু বিগ্রহের পূজা

একজন প্রশ্ন করিলেন,—শত শত দেবতার মূর্ত্তি পূজা করে লাভ কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লক্ষ্মী ছেলে, একটী প্রভুর সেবা কত্তেই জান্ কাবার, আবার শত শত প্রভু? শত শত বিগ্রহের পূজা ক'রে কোনো লাভ নেই, মাত্র সময় নষ্ট। বিগ্রহই যদি পূজা কত্তে হয়, তবে একটীকেই

কর্ব্বে। "একজনারে বাস্‌লে ভাল বিশ্ব-ভুবন আপন তোর।" সতী রমণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। সে একজনকেই পতি ব'লে জানে। শত শত পতির সেবা করে গণিকারা। সমাজ-জীবনে গণিকাবৃত্তি যেমন নিন্দিত, সাধন-জীবনেও গণিকা-বৃত্তি তেমন নিন্দিত।

সর্ব্বময়ের পূজা

যুবক প্রশ্ন করিলেন,—মূর্ত্তিপূজা আদৌ না করলেই বা ক্ষতি কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিছুই না। ভগবানকে লাভের পথ বহু। যে যে পথে সুবিধা বুঝবে, চল্‌বে। ভগবান্ সর্ব্বময়, তাই সব কিছুতেই তাঁর পূজা চলে। তিনি ভাবময়, তাই ভাবুক ব্যক্তি শুধু ভাবের ভিতরেই তাঁর অর্চ্চনা করেন। তিনি অভাবময়, তাই শুন্যবাদী শুন্যের ভিতরেই তাঁর অর্চ্চনা করেন। তিনি বস্তুময়, তাই বস্তুবাদী বস্তুর ভিতরেই তাঁর অর্চ্চনা করেন। তিনি প্রাণময়, তাই প্রাণবাদী প্রাণের ভিতরেই তাঁর অর্চ্চনা করেন। তিনি রূপময়, তাই সাকারবাদী পরিমিত বিগ্রহের ভিতরে তাঁর অর্চ্চনা করেন। তিনি অরূপ, তাই নিরাকারবাদী বিগ্রহ ব্যতীতই তাঁর অর্চ্চনা করেন। তিনি রসময়, তাই রসিক ব্যক্তি শান্ত, দাস্য, বাৎসাল্যাদি রসের ভিতরে তাঁর অর্চ্চনা করেন। সর্ব্বময়ের পূজা সর্ব্বভাবেই হয়।

ওঙ্কারে বিশ্বাস

যুবক প্রশ্ন করিলেন,—শত শত মূর্ত্তির পূজা ক'রে যে সমাজ নিজের মধ্যেই নিজে শত খণ্ডে বিভক্ত, সে সমাজ এক হবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সর্ব্বমন্ত্রের সার, সর্ব্বমূর্ত্তির সার ওঙ্কার মন্ত্রে বিশ্বাস ক'রে।

ওঙ্কার সর্ব্বমন্ত্রময়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ওঙ্কারোপাসনা নাদের উপাসনা। তোমার সৃষ্ট বা তোমার কল্পিত কোনও নাদ নয়, যে নাদ আপনা-আপনি স্ফূরিত হ'য়ে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছাদিত ক'রে রেখেছেন। এখানে প্রশ্ন ওঠে না, কোন

মন্ত্রের কে ঋষি। ওঙ্কার সর্ব্বমন্ত্রময়, তাই সর্ব্বঋষি এরই উপাসক, আর এই মন্ত্র সর্ব্ব-ঋষি-নিরপেক্ষ।

ওঙ্কার নিরালম্ব

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—তাই ওঙ্কার গুরু-বাদের অপেক্ষা করে না। গুরু যার নেই, সেও এই মহামন্ত্র জপের অধিকারী, যার আছে, সেও অধিকারী। এ মন্ত্র জীবের অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত্ত, এ মন্ত্র জীবের কর্ণে স্বতঃশ্রুত, এ মন্ত্র কণ্ঠে নয়, ওষ্ঠে নয়, অন্তরের অন্তরে সদাজাগ্রত। এ মন্ত্র নিজে নিরালম্ব, কিন্তু নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অবলম্বন।

ওঙ্কার নিরপেক্ষ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ওঙ্কার নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কোনও ভক্ত বা প্রচারকের, কোনও ব্যাখ্যাতা বা টীকাকারের, কোনও শাস্ত্র বা পুরাণের, কোনও দর্শন বা ইতিহাসের প্রতীক্ষা এ মহামন্ত্র করেন না। কোনও সাম্প্রদায়িক মতামত বা কোনও সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের ইনি অপেক্ষা রাখেন না। অনেক সাধন সেধে সাধকেরা ওঙ্কারের তত্ত্ব আপনি উপলব্ধি করেন।

দ্বারকাবাবু মাথাভাঙ্গা হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। মাথাভাঙ্গা স্কুলে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য একটা ব্যবস্থা তিনি করিয়া রাখিয়াছেন। অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা মাথাভাঙ্গা হাই স্কুলে আগমন করিলেন।

তোমার জীবন তোমার একার নয়

প্রায় আড়াই ঘণ্টা ব্যাপিয়া বক্তৃতা হইল। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার জীবন তোমার একার নয়। এই জীবনের উপরে নিখিল জগতের সকলের অধিকার। বাগানে যখন পুঞ্জে পুঞ্জে ফুল ফোটে, তখন তার সৌরভে অধিকার পথচারী প্রত্যেক পথিকের, যদিও তার জন্ম এবং স্থিতি ঐ একটী উদ্যানেই। তোমরাও এক একজন এক একটা সমাজে জন্মেছ, যার ফলে তোমাদের প্রাথমিক সেবা ঐ নির্দ্দিষ্ট সমাজটীই পাবে। কিন্তু তোমাদের সেবায়, তোমাদের আত্মোৎসর্গে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকলের অধিকার। শুধু বাঙ্গালী নয়, শুধু ভারতবাসী নয়, শুধু মানব জাতি নয়, শুধু প্রাণি-

জগৎ নয়, জড় ও চেতন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত, জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত, স্থূল এবং সূক্ষ্ম সকলের জন্য তোমার জীবন, সকলের জন্য তুমি।

তোমার জীবন অনন্ত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একদিকে তোমার জীবন যেমন তোমার একার নয়, আর একদিকে তোমার জীবন তেমন তুদিনের জন্য নয়। জীবন তোমার অসীম ও অনন্ত। বর্ষের পর বর্ষ চ'লে যায়, যুগের পর যুগ চ'লে যায়, জন্মের পর জন্ম চ'লে যায়, কিন্তু জীবন তোমার ফুরায় না। অনন্ত অখণ্ড জীবনের তুমি অধিকারী। তাই তোমার জীবনের গুরুত্বও অসীম। এই গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি দাও।

কুলোকের কুপরামর্শে কর্ণপাত করিও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কুলোকেই তোমাদের পরামর্শ দেবে, জীবন তোমাদের ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং ক্ষণস্থায়ী সুখ-ভাণ্ডারে যত সুখ আছে, সব সুখ তোমরা নিঃশেষে ভোগ ক'রে নাও। কিন্তু সে পরামর্শ কুপরামর্শ। সুখই যদি পেতে চাও, ত' ক্ষণস্থায়ী সুখকে কেন? ভোগই যদি কত্তে চাও, ত' ক্ষণিক ভোগকে কেন? দৃষ্টিকে উন্নত কর, প্রসারিত কর, নিত্য সুখকে আয়ত্ত কত্তে বদ্ধপরিকর হও। কুলোকের কুপরামর্শে কর্ণপাত ক'রো না।

মহতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মহতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। নীচ-জীবন-যাপন-কারী সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি ব্যক্তিকে অনুসরণ ক'রো না। যে যাকে অনুসরণ করে, সে তার দোষগুণ অল্প হ'লেও পায়। হৃতবীর্য্য ক্ষীণপ্রাণ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের দিকে তাকিও না। দৃষ্টিকে প্রধাবিত কর মহজ্জীবন-যাপন-কারীদের প্রতি। তাঁদের শ্লাঘ্য জীবনকে ধ্যান কর। তাঁদেরই মত আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস কর। তাঁদেরই মত মানবের স্বাভাবিক পবিত্রতায় আস্থা স্থাপন কর।

মানবদেহ মানবাত্মার কার্য্য-সাধনের যন্ত্র মাত্র

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যারা বলে, মানুষের জন্ম কাম থেকে, অতএব মানুষ কামের চর্চ্চাকেই জীবনের প্রধান অনুশীলন কত্তে বাধ্য, তাদের কথায় অধিক মূল্য দিওনা। দেহের জন্ম যে ভাবেই হোক, দেহ আর আত্মা এক নয়। মানুষের দেহটাই তার সত্তা নয়। দেহটা যন্ত্র মাত্র। শিমূল গাছ চিরে তক্তা ক'রে সেই তক্তায় তৈরী সিংহাসনে যদি কেউ দেবতার প্রতিষ্ঠা করে, তাহ'লে কি দেবতার গায়ে বন্য শিমূলের কাঁটা বিধ্‌বে? মানবদেহ মানবাত্মার কার্য্য-সাধনের যন্ত্র মাত্র। আত্মা চিরপবিত্র। তিনি তাঁর স্বকার্য্য-সাধনের জন্য যে দেহকে গ্রহণ করেছেন, সেই দেহের উৎপত্তি যে ভাবেই হ'য়ে থাকুক, তা নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিও না। ভগবানের ইচ্ছাতেই দেহের উৎপত্তি ঘটেছে এবং ভগবানের কাজের উপযুক্ত ক'রে একে গ'ড়ে তোলা অসম্ভব নয়। খনির ভিতরে লোহা থাকে, কত ধূলা মাটি আবর্জ্জনা তাতে মিশ্রিত থাকে, কিন্তু তাই থেকেই ইস্পাত তৈরী হয়, এমন ইস্পাত, দৃঢ়তাই যার বিশেষত্ব, যা উজ্জ্বল, যা নিত্যাবশ্যকীয়।

দেহকে গড়িবার সংকল্প কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার দেহকেও তুমি ইস্পাতের মত গ'ড়ে তুল্‌তে পার। শুধু পার বল্‌ব কেন, গড়ার চেষ্টায় তোমার একটী মিনিট সময়ও অপচয় করা উচিত নয়। প্রাণপণ যত্নে তোমার দেহকে তুমি গ'ড়ে তোল। সঙ্কল্প কর, এই দেহকে ভগবানের কাজে নিঃশেষে উৎসর্গ করার যোগ্য ক'রে গ'ড়ে তুমি তুল্‌বে। তোমার দেহ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলকার্য্যে নিয়োজিত হ'য়ে সার্থক হোক্, এই কামনা কর।

ইতর কথায় কর্ণপাত করিও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কাণাকাণি ক'রে যারা মানবজীবনের ইতর ব্যাখ্যা দেয়, তাদের কথায় কর্ণপাত ক'রো না। ইতর কথা শুন্‌তে শুন্‌তে মানুষ ইতর হ'য়ে যায়। ছোট কথা শুনে শুনে মানুষ ছোট হ'য়ে যায়।

ছোট কথা ক'য়ে ছোট কথা ভেবে মানুষ নিজের মহিমাকে খর্ব্ব করে, নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করে।

মানবজীবনে ভগবদভিপ্রায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানবজীবনের প্রত্যেকটী অংশে ভগবানের অমৃতময় পবিত্র অভিপ্রায়কে শুধু অন্বেষণ কর। প্রত্যেকটী বিবর্ত্তনে আর আবর্ত্তনে তাঁরই কৌশল খেলা ক'রে যাচ্ছে। তাঁর ইচ্ছাকে সকল ব্যাপারে দর্শন কর। অনন্ত জীবনের অধিকারী হে অমৃতের সন্তান, এইটীই তোমার ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার প্রকৃত প্রয়োগ-ক্ষেত্র।

জয়-পতাকা উত্তোলিত কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—তোমরা বালক, হয়ত আমার কথা-গুলি সব তোমরা বুঝতে পার নি, কিন্তু আমার সদিচ্ছাকেও কি বুঝ্‌তে পার নি ? তোমাদের উৎকর্ণ আগ্রহ আর প্রসন্ন বদন দর্শন ক'রে আমি স্পষ্ট অনুভব কত্তে পাচ্ছি যে, আমার কঠিন কথার রূঢ় আবরণ ভেদ ক'রে আমার সহজ শুভেচ্ছা তোমাদের সকলের চিত্তকে স্পর্শ করেছে, আকৃষ্ট করেছে। তাই আমি উপসংহারে তোমাদের পুনরায় বল্‌ছি, তোমরা বিশ্বাস করো না, তোমরা ক্ষুদ্রশক্তি। সিংহশাবক কেন নিজেকে শৃগাল-শিশু ব'লে ভ্রম কর্ব্বে ? অনাগত কাল জু'ড়ে তোমাদের পৌরুষ-মহিমা মানবতার যে জয়-ধ্বজা দিগ্‌বিদিকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, হে অমৃতের পুত্র, আজ প্রচণ্ড সাহসে সেই পতাকা উত্তোলিত কর।

স্বর্গীয় সঙ্গীত ও স্বর্গীয় মানব

প্রায় সন্ধ্যার মুখে শ্রীশ্রীবাবা মাথাভাঙ্গা হইতে চম্পকনগর রওনা হইলেন। অদ্য রজনীতে যাঁহাদের গৃহে অবস্থান করিবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাঁহারা পাঁচ ছয় ভ্রাতা। বেণীমাধব শর্ম্মা, নীলমাধব শর্ম্মা, রাধামাধব শর্ম্মা প্রমুখ তাঁহারা প্রত্যেক ভ্রাতাই সুকণ্ঠ ও সঙ্গীত-বিশারদ। সুতরাং মাথাভাঙ্গা হইতে নিলখি যাইতে পথে পথে সঙ্গীতের প্রসঙ্গই উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সঙ্গীত যখন অভ্যুদয়ের সহায়তা করে, তখন ইহা স্বর্গীয় বস্তু। সঙ্গীত যখন পতন-পথের পিচ্ছিলতা বর্দ্ধিত করে, তখন ইহা নারকীয়। সঙ্গীত যখন ভক্তের কণ্ঠে স্ফুরিত হয়, তখন উহা স্বর্গীয়। সঙ্গীত যখন অভক্তের কণ্ঠে স্ফুরিত হয়, তখন উহা হয় মর্ত্ত্য, নয় নারকীয়। যে দেশ স্বর্গীয় সঙ্গীতে পূর্ণ, সে দেশে স্বর্গীয় মানবের আবির্ভাব সহজে হয়।

যথার্থ কবি ও সাধারণ ব্যক্তিদের ইতর রুচি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধারণ লোকের রুচিকে অনুকরণ ক'রে যখন কবি তাঁর সঙ্গীতের পদ লেখেন, তখন তিনি নিজের কবিত্ব-শক্তির অমর্য্যাদা করেন। কবি অসুন্দরে সুন্দর, অন্ধকারে আলো, তিক্ত রূঢ় বাস্তবের মাঝে মধুরস আবিষ্কার করেন। এই স্থানেই কবির কবিত্ব-প্রতিভার মর্য্যাদা। কিন্তু কবি কল্পলোকের পসারী। অমৃতের তিনি বর্ষণ-কারী। মৃত্যুর মুখে, ধ্বংসের মুখে, অবাঞ্ছনীয় পরিণতির মুখে দেশকে জাতিকে জগৎকে ঠেলে নিয়ে তিনি দিতে পারেন না। যদি দেন, তবে তিনি নিজ কবিত্ব-শক্তির দারুণ অসম্মান করেছেন, বলতে হবে। যথার্থ কবিকে সাধারণ ব্যক্তিদের ইতর রুচির ঊর্দ্ধে অবস্থান কত্তে হবে।

কাব্যের কুরুচি ও কবির অন্তরের অপবিত্রতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কবি যখন নোংরা কথা, নোংরা ভাব, নোংরা ইঙ্গিত দিয়ে কাব্য, ছড়া, গান লিখ্‌তে বসবেন, তখন তাঁকে কল্পলোকের সৌন্দর্য্যের পূজারী ব'লে জ্ঞান না ক'রে, নিজের অবচেতন চিত্তের অন্তঃস্থলে অবস্থিত কদর্য্যতার সংস্কার পরিবেশনকারী ব'লে মনে করায় কোনও দোষ নেই। তোমার চিত্তভূমি কদর্য্যতার ক্রীমি-কীটে কিলবিল কচ্ছে, তা নইলে তুমি কেমন ক'রে পূতিগন্ধ বস্তু সেইখান থেকে তুলে তুলে পাঠক, গায়ক আর শ্রোতার গায়ে ছুঁড়ে মারতে পার? তোমার নিক্ষিপ্ত বাণ হয়ত সকলের হৃদয়কে বিদ্ধ কত্তে সমর্থ হ'তে না পারে, কিন্তু তাই ব'লে একথা কি ক'রে বলি যে, তুমি পবিত্র-চেতা? অনাসক্ত কর্ম্মযোগ তপস্যার সাধ্য হ'তে পারে, কারণ কর্ম্মযোগী কর্ত্তব্যের বুদ্ধিতে কাজ করেন, এবং যাতে দশের দেশের

মঙ্গল, তাকে অবলম্বন ক'রেই মনুষ্যের কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্রিক্ত হয়। কিন্তু অনাসক্ত কবিত্ব কখনও হয় না। যেখানে কবিত্ব-প্রকাশের প্রেরণারূপে কর্ত্তব্যবুদ্ধি কাজ করেনা, করে শুধু কবিত্ব-প্রকাশের স্বাভাবিক তাগিদ, সেখানে যদি কবি-সমাজ হিতবিরোধী কোমলচিত্তের পবিত্রতা-বিনাশকারী ভাব-বিলাসে প্রমত্ত হন, তবে বলতেই হবে, তিনি তাঁর উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততায় মানবের ক্ষতি কচ্ছেন।

সমাজের অমঙ্গলকারক অপবিত্র কথা বলিবার অধিকার কবির নাই

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মনকে উলঙ্গ ক'রে যা-তা, বাজে কথা প্রকাশ্যে বল্‌বার অধিকারকে যদি কবি দাবী করেন, তা হ'লে উলঙ্গ দেহে যা'তা' আচরণ করবার প্রকাশ্য অধিকার সহরের নোংরা পল্লীর পুরুষ-নারীরা কি দাবী কত্তে পারে না? মানবচিত্তে পশুভাব আছে ব'লেই কি সেই ভাবকে সে প্রচার ক'রে বেড়াবে? প্রত্যেক মানুষ প্রত্যহ মলত্যাগ করে, কিন্তু নিজের গৃহেও সে বিষ্ঠার পুটুলি বেঁধে প্রদর্শনীরূপে টাঙিয়ে রাখে না অথবা বন্ধুগৃহেও তা রুমালে মুঁড়ে নিয়ে যায় না। পাইখানাটা তার যত কদর্য্যই হোক, ঘর সাজায় সে বেলফুলের মালায়, বন্ধুগৃহে নিয়ে যায় সে গোলাপ-গুচ্ছ। সাধারণ সামাজিক জীবনেই যদি নীতিটী দাঁড়ায় এই, তাহ'লে কবি-জীবনেই শুধু নীতিটী হবে সমাজ-গর্হিত, তার কি যুক্তি, কি সঙ্গতি থাকতে পারে?

কুসঙ্গীতে অস্বীকৃতি জানাও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে গান গেয়ে, যে গান শুনে দেহে আসে না বল, প্রাণে জাগে না উৎসাহ, হৃদয়ে হয় না তৃপ্তি, অন্তরে হয় না শান্তির সঞ্চয়, সে সঙ্গীত গাইতে, সে সঙ্গীত শুন্‌তে রূঢ় কণ্ঠে অস্বীকার কর। যে সঙ্গীত তোমাকে স্বচ্ছ করে না, নির্ম্মল করে না, সুন্দর করে না, যে সঙ্গীতের ভাব-গুলি তোমার সহিত তোমার সমাজের সম্বন্ধকে, তোমার সহিত তোমার জগতের সম্বন্ধকে সরল, সহজ, ও সৌষ্ঠবযুক্ত করে না, যে সঙ্গীতের বাইরের

ধ্বান আর ভিতরের প্রতিধ্বনি পরস্পরের বিরোধী চিত্তবৃত্তির উস্কানি দেয়, সেই সঙ্গীত গান কত্তে বা শ্রবণ কত্তে বজ্রকণ্ঠে অস্বীকার কর।

ধর্ম্মের নামেও কদর্য্য সঙ্গীতকে স্বীকার করিও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কাব্যের নামেই শুধু এ অনাচার হয়েছে. তা নয়, ধর্ম্মের নামেও এ অনাচার যথেষ্ট হয়েছে। ধর্ম্মের মার্কা মে'রেও অনেক পাপ-পঙ্কিলতা জনসমাজে অবাধে চালিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে। তোমরা তাতেও তোমাদের প্রবল অস্বীকৃতি ও সবল অনাস্থা জ্ঞাপন কর। ধর্ম্মের নামেও কদর্য্য সঙ্গীত চল্‌তে দিতে পার না।

সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য ধরিবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কোন্‌টা কদর্য্য, আর কোনটা নিষ্কলঙ্ক, একথা বোঝাবার উপায় কি, এ প্রশ্ন কর্ব্বার নিশ্চয়ই তোমার অধিকার আছে। কিন্তু এর সর্ব্বজনীন বিচার সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত মাপকাটিতেই এই বিচার সম্পাদন কত্তে হবে। যা গেয়ে বা শুনে তোমার বল বাড়ে, সাহস বাড়ে, শান্তি বাড়ে,—তাই তোমার কাছে সুন্দর। যাতে তা' হয় না,—তাই অসুন্দর। গান গেয়ে আর শু'নে হিসাব নিতে শিখ যে লাভ কি হ'ল। লাভহীন শ্রম ত' পণ্ডশ্রম। মানবজীবন কর্ত্তব্যসঙ্কুল অতি কঠোর জীবন, ভাববিলাসিতা বা ভণ্ডামির স্থান এতে নেই।

শর্ম্মা-ভ্রাতৃগণের গৃহে শ্রীশ্রীবাবা আজ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত প্রেমভাব-মধুর সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করিলেন।

১০ ফাল্গুন, ১৩৩৮

অদ্য প্রাতে নিলখি ফিরিয়া যাইবার পথে শ্রীশ্রীবাবাকে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সাহার বহির্বাটীতে ঘণ্টা দুই বসিতে হইল। অনেকের অনেক ব্যক্তিগত কথা ছিল।

সামাজিক জীবনে ইন্দ্রিয়গত পবিত্রতার স্থান

একটী মুসলমান যুবক জীবনে কতকগুলি নিদারুণ ভ্রম করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে শ্রীশ্রীবাবার সাহায্য-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছে। তাহাকে তাহার

আবশ্যকীয় উপদেশ দিয়া বিদায় করিবার পরে শ্রীশ্রীবাবা সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—সামাজিক জীবনে ইন্দ্রিয়গত পবিত্রতার স্থান যে কোথায়, এই বিষয়ে অধিকাংশেরই একটা বদ্ধমূল ধারণা না হ'য়ে গেলে সমাজ-মধ্যে অনাচার ব্যভিচার প্রভৃতির তাণ্ডব-নর্ত্তন বেড়েই চল্‌বে। একথা অস্বীকার কর্ব্বার কি উপায় আছে? প্রত্যেক নারীকে জান্‌তে হবে, সমাজ-জীবনে তার ইন্দ্রিয়গত পবিত্রতার মহিমা কি এবং ইন্দ্রিয়গত অপবিত্রতারই বা ফল কি। প্রত্যেক পুরুষকে জান্‌তে হবে, এই পবিত্রতাকে পরিরক্ষণ ক'রে চল্‌বার দায়িত্ব তার কতটুকু এবং সে তার নিজ দায়িত্ব প্রতিপালন না কর্লে তার বিষময় প্রতিক্রিয়া কতদূর পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশ বিস্তার কর্ত্তে পারে। তারই জন্য, ব্যাপকভাবে পবিত্রতার আদর্শ-প্রচারের আবশ্যকতা পড়েছে।

নারী ও পুরুষের পবিত্রতার আদর্শ এক হওয়া উচিত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পবিত্রতার আদর্শ স্ত্রীপুরুষ উভয়ের জন্যই আদর্শ। একজনের খোলা ভাটী, আর একজনের তালা বন্ধ,—এমন একচোখো ব্যবস্থা নয়। নারীর মনে যাকে, পুরুষের মনেও তাকেই পবিত্রতার মাপকাটী ব'লে স্বীকার কর্ত্তে হবে।

সমাজের আমূল অনুসন্ধান আবশ্যক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তারপরে সমাজের আমূল অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌তে হবে যে, কোন্ সমাজে কোন্ কারণে অসংযম প্রশ্রয় পায়, কোন্ ধর্ম্মে কোন্ আচরণে অনৈতিকতার বিবৃদ্ধি ঘটে। নিরপেক্ষ, নির্ম্মম ও নির্বিদ্বেষ হ'য়ে এই অনুসন্ধান চালাতে হবে। পূর্ব্ব সংস্কারের রঙ্গীন কাঁচ চ'খে দিয়ে নয়, সংস্কারমুক্ত খোলা চ'খে দেখ্‌তে হবে, বিচার কর্ত্তে হবে, যে, শিক্ষা-দীক্ষার কোন্ ত্রুটী থাক্‌লে বয়োধিকা নারী বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষের কাছে ইতর ক্ষুধার তৃপ্তি দাবী কর্ত্তে যেতে পারে, অথবা বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষ বয়োধিকা রমণীর পাপ-সংসর্গ কামনা কর্ত্তে পারে। অনুসন্ধান কর্ত্তে হবে,—কোন্ রন্ধ্রে ছোট মেয়েরা বড় ছেলেদের

ঘাড়ের রক্ত শোষে, কোন্ ছলনায় বড় ছেলেরা ছোট মেয়েদের স্কন্ধগত শনিগ্রহ হয়। অনুসন্ধান কত্তে হবে,—কেন এরা এমন করে এবং এর প্রতীকারই বা কি? তারপরে এই অনুসন্ধানের ফল সমগ্র সমাজে এমন ভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে এর দ্বারা কোনও নৈতিক অবনতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না ঘটতে পারে অথচ যার যা জানা উচিত, যার যা শুনা প্রয়োজন, সে সেই হিতবাণী জান্‌তে পারে, শুন্‌তে পারে।

ব্যাধির ভয় ও আদর্শের অনুপ্রেরণা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নীতিহীনতার প্রাকৃতিক প্রতিশোধ যে জাতিক্ষয়কর ব্যাধি, সেই কথা বলাই যথেষ্ট হবে না। লৌকিকতার পবিত্রতাময় আদর্শই যে কি-গৃহে কি-বাইরে শান্তিময় আদর্শ, তৃপ্তিময় আদর্শ, সুখময় আদর্শ, এই কথা প্রত্যেকের অন্তরে সুগভীর ভাবে প্রবিষ্ট ক'রে দিতে হবে। ব্যাধির ভয়ের চেয়ে আদর্শের অনুপ্রেরণা দিয়ে বেশী কাজ করিয়ে নিতে হবে। ভয়ে মানুষ যত কাজ করে, লোভে করে তার চেয়ে বেশী। পবিত্রতার মহত্তম আদর্শকে এমন ভাবে আবাল্য প্রয়াসে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে দিতে হবে যেন তার লোভ পূতিগন্ধময় নরকেব দিকে আকৃষ্ট না হ'য়ে অমৃতময় স্বর্গলোকের দিকে প্রধাবিত হয়।

বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও সধবার পত্যন্তরে বাধা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিধবার চির-ব্রহ্মচর্য্য, সধবার পত্যন্তর অগ্রহণ এসব কেবলই কি সামাজিক অত্যাচারের নিদর্শন? এ সবের পশ্চাতে কি যৌনব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক সৃষ্টির চেষ্টা ছিল না? এ সবের পশ্চাতে কি পবিত্রতার আদর্শের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল না? পুরুষ শক্তিশালী ব'লেই কি এসব ব্যবস্থা করেছিল? না, এ ব্যবস্থা স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলের নৈতিক পবিত্রতার গভীর আবশ্যকতার দিকে তাকিয়ে করা হয়েছিল? দুর্ভাগ্য পুরুষ-জাতির, সে তার ব্রহ্মচর্য্য আর সন্ন্যাসকে পরিত্যাগ করেছে,—কিন্তু নারী যে এখনও সামাজিকভাবে এক একজন পর্য্যায়ক্রমে বহুজনের ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শে যাবার সুযোগ পান নি. এটী তাদের মহাসৌভাগ্য।

আদর্শ সমাজের নারী, পুরুষ ও বিবাহ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আদর্শ সমাজে পুরুষেরও বহুপত্নীকত্ব নিরুদ্ধ কত্তে হবে এবং নারী ও পুরুষের জন্য পবিত্রতার আদালতে একই আইন চল্‌বে। নারী যেমন বহুপতির সেবা কর্ব্বে না, পুরুষও তেমন বহু-পত্নীর বল্লভ হবে না। নারীর যেমন পতির মৃত্যুতে চির-ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস, পুরুষের তেমন স্ত্রীর মৃত্যুতে পবিত্র বৈপত্নিকত্ব বা সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীর জীবন ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক-বিরহিত ত্যাগীর জীবন, জন-সেবার জীবন, পরকল্যাণের জীবন। কি পুরুষ কি নারী সকলের পক্ষে এ জীবন শ্লাঘ্য জীবন, সুতরাং সকলের পক্ষেই এই জীবন গ্রহণীয় হবে। যে গ্রহণ কত্তে পার্ব্বে না, সে পবিত্রতার আদালতে অপরাধ কল্ল' ব'লেই মনে কর্ব্বে,—যদিও বিপত্নীক যদি অন্যপূর্ব্বার পাণিগ্রহণ করে, বিধবা যদি বিগতদারের গলায় মালা দেয়, তা'হলে এ অপরাধ ক্ষমাযোগ্য ব'লে বিবেচিত হবে।

পুরুষের প্রাকৃতিক সুযোগ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লোক-কলঙ্কের দিক দিয়েই বল, আর যৌন-ব্যাধির দিক দিয়েই বল, এক নারী বহু পুরুষের মনোরঞ্জন কত্তে গিয়ে যত সহজে কলঙ্কের বা ব্যাধির কবলে পড়ে, শরীরের গঠনের পার্থক্যের দরুণই এক পুরুষ বহু নারীর সেবা ক'রে তত সহজে কলঙ্কে বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় না, নিজেকে খানিকটা বাঁচিয়ে চল্‌বার প্রাকৃতিক সুযোগ তার সামান্য পরিমাণে অধিক আছে। অবশ্য পরিণামে ফল গিয়ে একই দাঁড়ায়, কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে চলবার সুযোগের তার-তম্যই সমাজের বিধি-ব্যবস্থায় এমন বিচিত্র পার্থক্যকে আস্তে আস্তে গ'ড়ে তুলেছে। তাই আজ পুরুষ নিরঙ্কুশ, নারী শৃঙ্খলাবদ্ধা।

শৃঙ্খলাবদ্ধা, না পিঞ্জরাবদ্ধা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নারীকে পিঞ্জরাবদ্ধা বল্‌লেই কথাটা ঠিক মত বলা হ'ত। কারণ, যে শৃঙ্খলায় নারীকে বাঁধা হয়েছে, সে শৃঙ্খলা সম্পূর্ণই তার নিজের গড়া নয়, সবটুকু [illegible] নিজের মানা নয়। অতীতের নারী তার

সতীত্ব-মর্য্যাদার প্রতি সচেতন ছিলেন ব'লেই প্রধানতঃ পবিত্রতার শৃঙ্খলাকে বৈদিক ঋষি-বালকের মৌঞ্জী-মেখলার ন্যায় আদর ক'রে পরেছিলেন। কিন্তু আজ কি নারী তার সতীত্ব-মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন? আজ কি নারী উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করার জন্য ক্ষেপে উঠে নি? চতুর্দ্দিকে নারী-জাগরণের যত সূচনা দেখা যাচ্ছে, তার প্রত্যেকটীর মধ্যে অল্পাধিক যৌন স্বেচ্ছাচারের একটা নগ্ন-লালসা কি সুকৌশলে আত্মপ্রকাশ কত্তে চাচ্ছে না?

অসবর্ণ বিবাহকে স্বীকার করিতে হইবে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আজ নারীর সতীত্ব-মর্য্যাদার সচেতনত্বকে প্রাণপণ বলে জাগিয়ে তুলতে হবে। হয় এক ফুলের মধু, নয় উপবাস, ফুলে ফুলে মধু নয়,—এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর দিয়ে শারীর-ধর্ম্মকে চালাবার রুচি তাদের ভিতরে সৃষ্টি কত্তে হবে। তার জন্য অসবর্ণ বিবাহ চালু কত্তে হয় হোক্, যোগ্য স্বামী পেল না ব'লে কেউ চিরকুমারী থাকতে চায় থাকুক, এই বিষয়ে তাদের অবাধ স্বাধীনতা স্বীকার কর্লে, স্বেচ্ছায় তারা একনিষ্ঠার শৃঙ্খলা সাদরে বরণ করবে। স্বাধীন স্পৃহা যদি কোনো দিকেই না স্ফূর্ত্তি পায়, তবে ত' শৃঙ্খলাকে পিঞ্জর ব'লে এরা মনে কর্ব্বেই। চারদিক দিয়ে অনাবশ্যক বজ্র আঁটুনির চোটেই আজ সব ফস্কা গেরো হ'তে চলেছে।

সতীত্ব-মর্য্যাদাবোধ ও সন্তানের প্রতি মমত্ব

শ্রীশ্রীবাবা বললেন,—একদিকে সতীত্ব-মর্য্যাদাবোধ, অপর দিকে অনাগত সন্তানের জন্য মমত্ব ও কল্যাণবুদ্ধি। এই দুটীকে সমপ্রযত্নে যুগপৎ জাগরিত ক'রে তুলতে হবে। পুরুষেরা যা ইচ্ছা তাই ভাবুক গিয়ে, মেয়েরা কখনও সন্তানের কথা না ভেবে পারে না। সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত এক হিসাবে তাদের জীবন অপূর্ণ। বিবাহ শুধু ভালবাসার জন্য, সন্তান লাভের জন্য নয়, এমন উদ্ভট কবিজনসুলভ কল্পনা পুরুষে শোভা পেতে পারে, মেয়েদের শোভাও পায় না, বড় একটা দেখাও যায় না। তাই ভবিষ্যৎ সন্তানের মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তারা নিজ নিজ বরনির্ণয়ে সাবধান হবে।

যৌনব্যাধির রক্তভুক্ বীজাণু

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কোন্ দেহে যৌন-ব্যাধির রক্তভুক্ বীজাণু সঙ্গোপনে বাস কচ্ছে, তা বাইরে থেকে বুঝা যায় না, যদি না সতর্কতার সঙ্গে শোণিত-বিশ্লেষণ করা হয়। সেটা অবশ্য বীজাণুতত্ত্ববিদের কাজ। বাইরে যে দেহ সুকান্ত সুন্দর, সেই দেহ হয়ত সকলের অজ্ঞাতসারে বীজাণুর বিষে ঝাঁঝরা হ'য়ে আছে। এর ফল গিয়ে পৌঁছুবে সন্তানের উপর। হয় সে অন্ধ হ'য়ে জন্মাবে, নয় সে অল্পায়ু হবে, নয় সে চিররোগী হবে। কোন্ মা সন্তানকে এমন দেখতে চায়? সুতরাং আসল খবর যখন ঘরে ঘরে কুমারী মেয়েদের কাণে আসবে, তখনি তারা স্থির ক'রে নেবে যে, জীবন-যাপন-ধারার মধ্যে কোথায় কোন্ শৃঙ্খলাকে মান্য করা আবশ্যক।

জননীর উপরে সন্তান-স্নেহের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জোর ক'রে শাসন মেয়েদের উপরে চাপাতে হয় না, সন্তান-স্নেহের তাড়নায় তারা আপনি শাসন ঘাড়ের উপর তুলে নেয়। সন্তানের মুখ দেখে কত বিপথগামিনীর চিত্ত-সংস্কার জগতে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গিয়েছে, সন্তানের মঙ্গলকামনা কত ভ্রান্ত বালিকার জীবনগতি ফিরিয়ে দিয়েছে, জগতে কেউ কখনো তার সংখ্যা নির্দ্ধারণ কত্তে সমর্থ হবে না।

স্বাধীনতা যার বেশী, শাস্তিও তার বেশী

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পুরুষদের মনের উপরে সন্তান-স্নেহের প্রভাব তেমন প্রবল বা সুস্পষ্ট নয়। সমাজ-মঙ্গলকর শাসনের নীচে পুরুষদের আনতে হ'লে তার জন্য কঠোরতর ব্যবস্থার প্রয়োজন, এ কথা আমরা ভুলতে পারি না। বিপথে চলার স্বাধীনতা যার যত বেশী, বিপথে চলার শাস্তিও তার তত বেশী হওয়া উচিত।

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবের প্রসার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু তথাপি আদর্শবাদই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হওয়া উচিত। নারীমাত্রকেই জননী জ্ঞানে মনে মনে অর্চ্চনা করার প্রবৃত্তি পুরুষদের একবার জাগরিত করা কি খুবই কঠিন? প্রচার-কার্য্যের

জবরদস্তিতে হিন্দুকে মানুষ মুসলমান কত্তে পারে, মুসলমানকে খৃষ্টান কত্তে পারে, খৃষ্টানকে আবার ফিরে হিন্দু কত্তে পারে,—এ'ত অহরহ দেখা যাচ্ছে। তবে অবৈধ-নারী-সংসর্গকারী লম্পটকেই বা কেন অবিরাম চেষ্টার ফলে নারীমাত্রের প্রতি মাতৃবুদ্ধিসম্পন্ন করা যাবে না ?

বেলা সাড়ে আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা বহুজনপরিবৃত হইয়া নিলখি আসিয়া পৌঁছিলেন। নিলখির শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন সাহার গৃহে আজ উৎসব-কোলাহল লাগিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যাকাল বিগত হইলে গ্রামের সকলকে লইয়া একটী প্রশ্নোত্তর-সভা হইল। অনেকেই নিজ নিজ মনোগত প্রশ্নসকল করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা একটী একটী করিয়া সবগুলির সমাধান করিতে লাগিলেন।

পরমাত্মাই তোমার গুরু

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরুবাদের আজ এমনই অবস্থা হয়েছে যে, আসল গুরু বাদই প'ড়ে গেছেন। সদাশিব বলছেন,—মুক্তির্ণজায়তে দেবি মানুষে গুরু-ভাবনাৎ, অর্থাৎ মানুষকে গুরু ব'লে ভাবনা কর্লে মুক্তি হয় না। শাস্ত্র বল্ছেন,—গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বর, গুরুরেব পরং ব্রহ্ম ইত্যাদি—অর্থাৎ ভগবানের যে সৃজনী প্রতিভা তিনিই তোমার গুরু, তাঁর যে রক্ষণী শক্তি, তিনিই তোমার গুরু, তাঁর যে সংহরণ-ক্ষমতা তাই তোমার গুরু এবং পরিশেষে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধাতা অখণ্ড-মঙ্গলময় অখণ্ড-পরমাত্মাই তোমার গুরু।

অখণ্ডের শুদ্ধতম খণ্ডরূপ ওঙ্কার-বিগ্রহ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু মঙ্গলময় গুরুর অখণ্ড অব্যয় অনাদি অনন্ত সত্তাকে নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা কত্তে সমর্থ না হ'য়ে সাধক তার প্রতীক খুঁজে নিতে বাধ্য হয়েছে। এইভাবেই মানুষের মূর্ত্তি ধ্যানের প্রচলন ঘটেছে। কিন্তু তোমাদের তা প্রয়োজন নেই। তোমরা ওঙ্কাররূপী গুরুর বিগ্রহকে ধ্যান কর। বর্ণ তার শুভ্র, তেজঃপূর্ণ, ধ্বান্তবিনাশী। অখণ্ডের শুদ্ধতম খণ্ডরূপ এই ওঙ্কার মূর্ত্তি।

ওঙ্কারই সারাৎসার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে দিকে নয়ন পড়ে, অবিরাম ওঙ্কার দর্শন কর। যে দিকে মন পড়ে, অবিরাম ওঙ্কারকে ধ্যান কর। ওঙ্কারই সারাৎসার, ওঙ্কারই পরাৎপর, ওঙ্কারই আদ্যন্তবর্জ্জিত পরমসত্তা।

●

ওঙ্কার বিদ্যুজ্জ্যোতি ব্রহ্মাগ্নি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড মন্ত্র, হ্রীং, ক্লীং, ক্রীং, শ্রীং প্রভৃতি জপ কর্লেও ওঙ্কার জপেরই ফল হয়। কারণ, এঁদের প্রাণও ওঙ্কারই। এঁদের প্রত্যেকের মর্ম্মাভ্যন্তরে সযত্নে ওঙ্কার লুক্কায়িত আছেন ব'লেই এঁরা মন্ত্র, এঁরা ত্রাণদাতা, এঁরা নিখিল-তাপ-বিনাশক। কিন্তু বিদ্যুজ্জ্যোতি ব্রহ্মাগ্নি সাম্‌নে থাকৃতে, লণ্ঠনের পূজো কেন? যত তন্ত্র, যত মন্ত্র, সকলের প্রত্যক্ষ পরিণাম ওঙ্কারানুভূতি। ওঙ্কারের উপাসনা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে এক কর্‌বে। ওঙ্কারই বেদ, ওঙ্কারই বেদমাতা, ওঙ্কারই বেদপুত্র।

ওঙ্কার ভেদবুদ্ধির বিমর্দ্দক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জাতিভেদ আর অনাচরণীয়বোধ তোমাদিগকে শত শত খণ্ডে বিভক্ত ক'রে রেখেছে। ওঙ্কারের উপাসনা কর,—তোমাদের সকল ভেদবুদ্ধি, সকল বিসম্বাদ, সকল দ্বন্দ্ব-কলহ-কোলাহল দূর হ'য়ে যাবে। বিশ্বালিঙ্গনকারী ওঙ্কারের উপাসনা ক'রে তোমরা বিশ্বালিঙ্গনকারী হও। প্রত্যেকের বক্ষ এক ওঙ্কারেই স্পন্দিত হয়, প্রত্যেকের শ্বাসবায়ু এক ওঙ্কারকেই জপ করে, স্থানু, জড়, অচেতন পদার্থনিচয় গভীর নিঃস্তব্ধতার ছদ্মবেশে এক অনাদি অখণ্ড ধ্বনি ওঙ্কারের দ্বারাই আবৃত হ'য়ে রয়েছে। ম্লেচ্ছ যে নাম জপ করে, তারও প্রাণ ওঙ্কার। পশুপক্ষী যে শ্বাস-প্রশ্বাস লয়, তারও প্রাণ সেই ওঙ্কার। সাগর যে গর্জ্জন করে, আগ্নেয়গিরি যে নিঃস্রাবিত হয়, ভূকম্প যে ধ্বনি প্রকাশ করে, বজ্র যে নিনাদিত হয়, সকলের প্রাণ সেই ওঙ্কার।—তাই ওঙ্কারের উপাসক আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্যের সাথে নিজের একাত্মতা অনুভব করে। কেউ তার পর নয়, কিছুই তার পর নয়।

তোমরা সাধক হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনুভব সাধনার ফল। বাক্যজীবী ও বুদ্ধিজীবীর কাজ নয়, সাধকেরই কাজ উপলব্ধির সত্য আস্বাদন গ্রহণ করা। তোমরা সাধক হও। শত বিশৃঙ্খল পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ ক'রে তোমরা সাধনানুশীলন কর। সাধনায়ই সিদ্ধি, বহু বাক্যে নহে, চতুরতায় নহে।

আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে গায়ত্রী মন্ত্র

১১ই ফাল্গুন, ১৩৩৮।

অদ্য প্রাতে নিলখির জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গায়ত্রী মন্ত্রকে মনে মনে জপ করার সার্থকতা কি? এই মন্ত্র গান কর্‌লে ত্রাণ হয়, তারই জন্য না এর নাম গায়ত্রী? উচ্চৈঃস্বরে গায়ত্রী উচ্চারণ কর্‌লে সবাই শুনবে, এই ত আপত্তি? সেই আপত্তি নিরর্থক। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে গায়ত্রী-মন্ত্রকে সম্প্রসারিত ক'রে দাও। ব্রাহ্মণ-বীর্য্যের অধিকারী সকলে হোক্। জগতের একটী লোকও যেন শূদ্র হ'য়ে প'ড়ে না থাকে।

গায়ত্রী ওঙ্কারেরই স্মারক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গায়ত্রী-মন্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে প্রণবের স্মারক। আগে পিছে প্রণব বসিয়ে গায়ত্রী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, ওঙ্কারেই এর অভ্যুদয়, ওঙ্কারেই বিলয়, ত্রিলোক ত্রিকাল, ত্রিগুণের জন্ম ওঙ্কারে, বৃদ্ধি ওঙ্কারে, উপশম ওঙ্কারে। এই জন্যই গায়ত্রীর সাধন গান ক'রে, ওঙ্কারের সাধন নিভৃতে।

হোম্‌নার বক্তৃতা

বেলা সাড়ে এগারটার প্রচণ্ড রৌদ্রে শ্রীশ্রীবাবা হোম্‌না রওনা হইলেন। হোম্‌না হাই স্কুলের ছাত্রদের নিকটে আত্মগঠন সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি সেখানকার প্রধান শিক্ষক মহাশয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছেন। হোম্‌নাতে তিনি বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার রায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। অশ্বিনীবাবু কুমিল্লাতে ওকালতী করেন, বাড়ীতে থাকেন না। অশ্বিনীবাবুর বৃদ্ধা মাতা প্রাণপণ যত্নে অতিথি-সেবা করিলেন।

অপরাহ্ন সময়ে হোম্না স্কুলে বক্তৃতারম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাবা অতি সরল ও সহজ ভাষায় বালকদিগকে উপদেশ দিলেন।

আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর। এই বিশ্বাস থেকেই জীবনের সকল অভ্যুদয়ের উৎপত্তি। বিশ্বাস যার যত গভীর, সাফল্য তার তত অধিক। কারণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে গতি দেয়। বিশ্বাস মানুষকে গতিপথে বিক্রমশালী করে। বিশ্বাসই শক্তির উৎস, বিশ্বাসই ধৈর্য্যের মূল। তোমরা বিশ্বাসী হও।

আত্মশক্তি কাহাকে বলে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু আত্মশক্তি কাকে বলে? আত্মার শক্তিকেই আত্মশক্তি বলে। তোমার ভিতরে শ্রীভগবান তোমার আত্মারূপে বিরাজ কচ্ছেন। আত্মশক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানেরই শক্তি। বিশ্বাস কর, এই শক্তির বলেই তোমরা দুর্গম পন্থা অতিক্রম করবে, দুর্লঙ্ঘ্য গিরি লঙ্ঘন কর্ব্বে, দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হবে। এই শক্তির বলেই তোমরা জগতের সকল অসম্ভবকে সম্ভব কর্ব্বে, সকল অসাধ্যকে সুসাধ্য কর্ব্বে।

শরীর আত্মার শক্তিপ্রকাশের যন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার শরীরের দিকেও তাকাও, তোমার আত্মার দিকেও তাকাও। শরীরেরই ভিতর দিয়ে আত্মার অপরিমিত শক্তি প্রকাশিত হবে। শরীর হচ্ছে আত্মার শক্তিপ্রকাশের একটা যন্ত্র। যন্ত্রটী যত শুদ্ধ, আত্মার শক্তি-প্রকাশ তত সহজতর। যন্ত্রটী যত অশুদ্ধ, আত্মার শক্তি-প্রকাশ তত অসুবিধাজনক। অপবিত্র দেহের ভিতর দিয়ে আত্মার শক্তি প্রকাশ পেতে বাধা পায়।

পবিত্র হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সুতরাং পবিত্র হও, শুদ্ধ হও, প্রাণপণ যত্নে নির্ম্মল হও। পবিত্রতাই পূর্ণতা, পবিত্রতাই দেবত্ব। পবিত্রতাই নির্লোভতার জনক,—নির্লোভতাই ঋষিত্ব। যা কিছু চিত্তকে চঞ্চল করে, নির্ম্মম হ'য়ে তা বর্জ্জন কর।

দৃঢ় হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পবিত্র যে হবে, তার চাই দৃঢ়তা। প্রযত্ন যার শিথিল, সঙ্কল্প যার দুর্ব্বল সে বারংবার অপবিত্র হয়, সে বারংবার বিপথে চ'লে যায়। সুতরাং হে পুত্রগণ, দৃঢ় হও, ধীর হও, দুর্ব্বার হও।

রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা নিলখি ফিরিয়া আসিলেন। অনেকেই ব্যক্তিগত নানা বিষয়ে নানা উপদেশ গ্রহণ করিলেন।

সহস্র আধারে ভ্রমণশীল কামুক মন

একজনকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মন যদি কামুক হয়, আর যদি সহস্র আধারে সে ঘুরে বেড়ায়, তবে তাকে দমন করা বড় কঠিন কথা। তখন সহস্র আধারেই ভগবানের উপস্থিতি ধ্যান ক'রে এই কামকে প্রশমিত করবার চেষ্টা কত্তে হয়। কিন্তু একথা স্বীকার করেই হবে যে দুর্ব্বল ব্যক্তিরই কাম সহস্র আধারে ঘুরে বেড়ায় এবং দুর্ব্বলের পক্ষে কামোত্তেজক বস্তুতে ঈশ্বরানুধ্যান সহজ কথা নয়।

একটী আধারে কেন্দ্রীকৃত কামুক মন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই ক্ষেত্রে মনকে প্রশান্তির পথে টেনে আনবার একটী উৎকৃষ্ট কৌশল হচ্ছে, শত স্থানে ধাবমান কামকে একটা স্থানে এনে বসান যায় কি না, তার উপায় দেখা। নারী-পুরুষের বিবাহ কতকটা এই জাতীয় চেষ্টারই সমাজ-সম্মত পরিণাম ব'লে মনে করা যেতে পারে। মন যদি কামুকও হয়, কিন্তু সহস্র আধারে না ঘুরে যদি সে একটীমাত্র আধারে এসে সংলগ্ন হ'য়ে যায়, তাহ'লে কামকে দমন খুবই সহজ হ'য়ে পড়ে। কারণ, এই সময়ে কাম্য পাত্রে ঈশ্বর-চিন্তন ও ঈশ্বর-স্মরণ অতি সহজফলপ্রদ পন্থা। যাকে কদর্য্যভাবে চাও, তার ভিতরে ভগবানের অস্তিত্বকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি কর্ব্বার চেষ্টা কল্লে, কামসুখ-প্রার্থনা কত্তে কত্তেও ভগবানকেই আংশিকভাবে প্রার্থনা করা হ'য়ে যায়। তান্ত্রিক প্রভৃতি কতকগুলি সম্প্রদায়ীর নিগূঢ় সাধনার কতকাংশ এই প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। অবশ্য প্রবর্ত্তনা-কারীরা চেয়েছিলেন, অবশ্যম্ভাবী কামানুশীলনের সাথে ভগবদনুশীলনকে যুক্ত ক'রে দিতে; আর প্রবর্ত্তনাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ক'রে নিলেন, বর্জ্জনসাধ্য কামানু-

শীলনকে, ভ গবদনুশীলনের দোহাই দিয়ে অবশ্যকরণীয়।

ভোগাকর্ষী বস্তুতে সূর্য্য, অগ্নি ও বজ্রনাদের ধ্যান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বহুলুব্ধ মন যখন একলুব্ধ হ'ল, তখন সে তোমার সহজবশ্য হ'য়ে এল। কারণ, তখন যদি ইন্দ্রিয়চর্চ্চায় দেহকে বারংবার কলুষিত করার ফলে, কাম্য দেহের ইন্দ্রিয়ের ছবি তোমার মস্তিষ্কের উপর এমন ভীষণ ছাপও ফেলে থাকে যে, তার মূর্ত্তি কিছুতেই ভুলতে পার না, তাহ'লেও ভয় নেই, কারণ, একটী দেহের ভিতরে, একটী দেহের প্রত্যেকটী প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতরে ঈশ্বর-চিন্তন বা ঈশ্বরের বিভূতি-নিচয়ের চিন্তন খুব কঠিন কথা নয়। সামান্য অভ্যাসের ফলে এ কাজ আয়ত্ত হ'তে পারে। কারো নিগূঢ় অঙ্গ যদি তোমার চোখের উপর অবিরামই ভাসতে থাকে, তুমি সেখানে মধ্যাহ্ন ভাস্করের রূপ চিন্তা কর। কারণ, সূর্য্য ত তাঁরই বিভূতি। কোনও সুকোমল স্পর্শ যদি তোমাকে বারংবার আকৃষ্ট কচ্ছে থাকে, তবে শ্মশান-চুল্লীর প্রজ্বলিত অগ্নির ধ্যান সেখানে চালাও। কারণ, অগ্নি ত' তাঁরই বিভূতি। সূর্য্য রূপানুভূতির সামর্থ্যকে নাশ করে, অগ্নি স্পর্শানুভূতির শক্তিকে নাশ করে। কোনও সুমধুর কণ্ঠ তোমাকে বারংবার প্রলুব্ধ কচ্ছে, তুমি গুরুগম্ভীর বজ্রনাদের ধ্যান সেখানে চালাও। কারণ, বজ্রনাদও ভগবানেরই বিভূতি।

সূর্য্য, অগ্নি ও বজ্রধ্বনির স্বরূপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সূর্য্য তাঁর জ্যোতির্ম্ময় বিভূতি, অগ্নি তাঁর তাপময় বিভূতি, বজ্র তাঁর ধ্বনিময় বিভূতি। কিন্তু এই রূপ, এই তাপ আর এই ধ্বনির পশ্চাতে রয়েছে অবিরাম ধ্বন্যায়মান গভীর ওঙ্কার। সুতরাং এই সকল ধ্যান চালাবার কালে ধ্যেয় আলম্বনগুলিরও যা একমাত্র অবলম্বন বা নিত্য স্থিতিভূমি, সেই ওঙ্কারের অনুক্ষণ জপ চালাতে থাকো।

ওঙ্কার-জপ ও অখণ্ড-অনুভূতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মালায় কিম্বা শ্বাসে ওঙ্কার-জপ জিনিষটা কি রকম জানো? তোমার সমগ্র শরীরে যদি তোমারই ছোট ছোট সহস্র সহস্র ছবি এঁটে দেওয়া যায়, তাহ'লে ব্যাপারটা যেমন হয়, তোমার জপা শত সহস্র ওঙ্কারও

অখণ্ড অনাহত ওঙ্কার-নাদের গায়ে তেমনি দেখাবে। খণ্ড ওঙ্কার জপ্‌তে জপ্‌তে অখণ্ড ওঙ্কারের অনুভূতি হ'তে থাকে। এইজন্য অবিরাম জপই পরম পন্থা।

শিক্ষা ও উপলব্ধি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উপলব্ধি নিজের কাছে, শিক্ষা পরের কাছে। শিক্ষার স্থান শত শত, উপলব্ধির স্থান একটী।

১২ই ফাল্গুন, ১৩৩৮।

শ্রীশ্রীবাবা এবং সঙ্গিগণ অদ্য প্রাতেই নিলখি হইতে রঘুনাথপুর রওনা হইয়াছেন। পথিমধ্যে বারদীর নাগবাবুদের কাশীপুর-কাছারী পড়ে। বারদীর অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ নাগচৌধুরী বর্ত্তমান সময়ে এই কাছারীতেই অবস্থান করিতেছেন। তিনি কোনও প্রকারে খবর পাইয়াছেন যে, শ্রীশ্রীবাবা আজ এই পথে যাইবেন।

অতএব সুকৌশলে তিনি শ্রীশ্রীবাবাকে কাছারীতে আনাইয়া আটক করিলেন। অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবাকে এখানেই অপেক্ষা করিতে হইল।

সত্যের স্থান

নানা কথার পরে বিজয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—সত্যের স্থান কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ঈশ্বর-সমর্পিত ব্যক্তির স্থির অচঞ্চল মনই সত্যের স্থান।

সত্যের পরিচয়

বিজয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—সত্যের পরিচয় কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সহস্র জটিল অবস্থার মধ্যেও নিরপেক্ষ আত্মপ্রতিষ্ঠাই সত্যের পরিচয়।

সত্যের সাধনা

বিজয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—সত্যের সাধনা কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ক্ষণস্থায়ী চিরচঞ্চল এই জগতের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে অচঞ্চল চিরস্থির যে একমাত্র মঙ্গলময় ভগবান, এই চিন্তার কাছে সকল চিন্তাকে বলি দেওয়াই সত্যের সাধনা।

দুশ্চিন্তা দমনের উপায়

বিজয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,— দুশ্চিন্তা দমনের উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রীতিকর হউক আর অপ্রীতিকর হউক, ভগবানের বিধান পরিণামে আমার মঙ্গলই সাধন কর্ব্বে, এই বিশ্বাসই দুশ্চিন্তা দমনের উপায়।

বিশ্বাসের নিদান

বিজয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিশ্বাস কি ক'রে আসে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবান ছাড়া ত্রিজগতে আর কিছু নেই, আর কিছু ছিল না, আর কিছু থাকবে না,—এই ধ্যানে মত্ত হ'য়ে যাওয়াই বিশ্বাস আসবার পথ। ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই, এর মানে এই যে, আমিও তাঁর ভিতরেই আছি, তাঁর ভিতরেই থাকব, তাঁর ভিতরেই ছিলাম।

লাভ-ক্ষতিতে সমদৃষ্টি হও

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীবাবা রঘুনাথপুর পৌঁছিলেন। রঘুনাথপুরে আজ একটী বক্তৃতা দানের কথা ছিল। কিন্তু বিগত রাত্রে এই গ্রামে একটা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটায় গ্রামবাসীরা বক্তৃতার কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। কয়েকটী বাড়ীর অধিবাসীরা আসিয়া উপদেশ শুনিতে বসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংসারের ক্ষতি আর সংসারের লাভ, উভয়কেই সমান দৃষ্টিতে দেখা চাই। গড়া আর ভাঙ্গা, উভয়ের প্রতি সমান উদাসীনতা থাকা চাই। এল ব'লেই হেস না, গেল ব'লেই কেঁদ না।

অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লাভালাভে সমবুদ্ধি হওয়া কঠিন, কিন্তু যা-কিছু কঠিন, তাই কি অসম্ভব ? অসম্ভবকেও লোকে সম্ভব করে, যদি মানুষের মত মানুষ হয়। আর তোমরা কঠিনকে সম্ভব কত্তে পার্ব্বে না। কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানকেই নিত্য সত্য জেনে অনুক্ষণ তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ কত্তে থাক। তাঁর ফলে আপনা আপনি সব হ'য়ে যাবে।

হীরার টাকা

শ্রীশ্রীবাবা এই কয়দিন যে কয়টী গ্রাম ঘুরিলেন, সব কয়টাই অত্যন্ত ভক্ত-প্রধান গ্রাম। সুতরাং রঘুনাথপুরের একজন মনে করিলেন যে শ্রীশ্রীবাবা নিশ্চয়ই

আশ্রমের জন্য প্রচুর অর্থ তুলিয়া আনিয়াছেন। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, শ্রীশ্রীবাবার যাহা প্রভাব-প্রতিপত্তি, তাহা প্রয়োগ করিলে জনসাধারণের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা যে কাহারও নিকট অর্থ যাচ্ঞা করেন না, একথা এই ব্যক্তির জানা নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—এইবারকার ভ্রমণে কত টাকা সংগ্রহ হইল ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিছু হ'ল। কিন্তু সে সব রূপার টাকা নয়। হীরার টাকা।

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—মানে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—রূপার টাকা কথা কয় না, হীরার টাকা কথা কয়, পরের জন্য কাঁদে, ভগবানকে ভালবাসে প্রেম দেয়, প্রাণ দেয়।

রহিমপুর,
১৩ ফাল্গুন, ১৩৩৮

রঘুনাথপুর হইতে রহিমপুর পৌছিতে বেলা দশটা হইল। সমগ্র পথ শ্রীশ্রীবাবা মৌনী ভাবে অবস্থান করিলেন।

অযোগ্যের গেরুয়া

আশ্রমে আসিয়াই শ্রীশ্রীবাবা দেখিলেন, আশ্রমের একটী কর্ম্মী শ্রীশ্রীবাবার অনুপস্থিতিতে গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গেরুয়া যার তার জন্য নয়। গেরুয়া পাবার জন্যও আত্মগঠন কত্তে হয়। অযোগ্যের গেরুয়া সমাজে অমঙ্গল সৃষ্টি করে। দীর্ঘকাল আত্মপরীক্ষা কর, তারপরে গৈরিক ধারণ কর।

ব্রজধামের নেও কাটা

শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে ভূমিটুকু আশ্রমের জন্য প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই পল্লীবাসীদের পূজিত একটী শিব-লিঙ্গ এবং উক্ত বিগ্রহের একটী মন্দির আছে। শিবমন্দিরের পূর্ব্বদিকে আজ একটী ইষ্টকালয়ের নেও কাটা হইল। রঘুনাথপুর হইতে আসিয়া আর বিশ্রামাদি না করিয়াই শ্রীশ্রীবাবা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই গ্রামে একটী

শ্রীহট্ট-দেশীয় বৃদ্ধ শিল্পী ছিলেন, যিনি নিঃসন্তান এবং ভগবদ্ভক্ত। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ছয়ই বৈশাখের উৎসবের সময়ে আশ্রমের জন্য তাঁহার অক্লান্ত শ্রমের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীশ্রীবাবা এই কল্পিত কুটীর খানার নাম "ব্রজধাম" রাখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পরে পুনরায় শ্রীশ্রীবাবা সকল ছেলেদের লইয়া নেও কাটার কাজে প্রবৃত্ত হইলেন।

নগ্নদেহে অবস্থিতি ও কামভাব

সন্ধ্যান্তে কতিপয় যুবক কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পাশ্চাত্য দেশে যে কামপ্রাবল্য কমাবার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ থাকবার আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে, তার সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উদ্দেশ্য উত্তম, কিন্তু উপায় নিকৃষ্ট। একটী মেয়ে ন্যাংট আছে কি কাপড় পরেছে, তার উপরে আমার কাম নির্ভর করে খুব কম। কাম নির্ভর করে, কামুকের মনের অবস্থার উপরে। কাম্য বস্তু মনের গুপ্ত অবস্থাটীকে উত্তেজিত ক'রে দেবার উপলক্ষ মাত্র।

কামের উৎপত্তিস্থান মানুষের মন, বাহিরের বস্তু নহে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কামের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রধানতঃ Subjective, অর্থাৎ কামের সৃষ্টির স্থান তোমার মন। সৃষ্টির উত্তেজক কারণ কখনো কখনো তোমারই মনের চিন্তা, কখনো কখনো বাইরের বাক্য, ইঙ্গিত বা দৃশ্য। সুতরাং কামকে প্রত্যক্ষভাবে শাসন করার উপায় হবে আত্মশাসনমূলক। বাইরের বাক্য, ইঙ্গিত, দৃশ্য বা ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে যে কামশাসন, তা কতকটা গৌণ। প্রত্যহ উলঙ্গিনী রমণীকে বা উলঙ্গ পুরুষকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই দেখাটা একটা অভ্যাসে পরিণত হ'য়ে গেলে কাম থাকবে না, সহজ-স্বচ্ছন্দ ভাব আস্‌বে,—এটা যদি হয় একটা যুক্তি, তাহ'লে সুবেশা সুকেশা রমণীকে বা সুসজ্জিত পুরুষকে প্রত্যহ দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেটাও একটা স্বচ্ছন্দ অবস্থায় গিয়ে পরিণত হবে,—এমন কথাই বা সুযুক্তি ব'লে গ্রাহ্য হবে না কেন?

আসল কথা এই যে, এই দুটো যুক্তিই অসম্পূর্ণ যুক্তি, সকলের পক্ষে এ যুক্তি খাটে না। যদি বলা যায় যে, কাপড়-চোপড়ে মানুষ তার দেহের কতকগুলি রহস্যময় অঙ্গ আচ্ছাদিত ক'রে রাখে ব'লেই অদম্য এক কৌতূহল তার বিপরীত-লিঙ্গীকে কামচিন্তা-পরায়ণ করে, তা হ'লে সমান যাথার্থ্যের সহিত একথাও বলা যায় যে, পুরুষ বা নারীর নগ্নদেহের উলঙ্গ দৃশ্য নারী বা পুরুষকে অতি প্রবল ভাবে কামচিন্তায় নিয়োজিত করে।

নগ্নতা ও বসন-বিলাস উভয়ই বর্জ্জনীয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বস্ত্রবিলাস ও রূপসজ্জা অপরের চিত্তে কামোত্তেজনা সৃষ্টি করে, একথাও যেমন সত্য, নগ্নতার বীভৎসতা যে অপরের চিত্তে রতি-লালসার উৎপাদন করে, একথাও তেমন সত্য। সুতরাং এই ক্ষেত্রে প্রতীকারেচ্ছু ব্যক্তির অবলম্বনীয় হবে, মধ্য পন্থা, অর্থাৎ, না নগ্নতা, না বসন-বিলাস। বেশ-ভূষাকে নগ্নতার সীমা আর বিলাসিতার সীমা উভয় সীমার বাইরে রাখতে হবে।

কৌতূহল দমনের শিক্ষা চাই

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আর, অনাবশ্যক কৌতূহলকে দমন কর্ব্বার মত শিক্ষা এবং সাধনাও সকলকে অর্জ্জন কত্তে হবে। জামাকাপড়ের নীচে শরীরটা কেমন এই কৌতূহল তোমার হল। আচ্ছা বেশ, সঙ্গে সঙ্গেই জামাকাপড় খুলে ফেলে তুমি তোমার কৌতূহলের বস্তু সেই দেহটীকে আপাদমস্তক দেখে নিলে। তারপরে যদি তোমার কৌতূহল হয়, এই চামড়ার নীচে দেহটা কেমন, তাহ'লে কি তুমি কসাই দোকানের পাঁঠার মতন জীবন্ত দেহ থেকে চামড়া ছিঁড়ে ফেলে কৌতুহলের নিবৃত্তি কত্তে চেষ্টা কর্ব্বে? কোনো কোনো দুর্ব্বৃত্ত রাজা যে মাতৃজঠরে সন্তান কেমন ভাবে থাকে দেখবার জন্য জীবন্ত নারীগর্ভ বিদারিত কত্ত, তাদের সেই কৌতূহল কি দমনীয় কৌতূহল নয়? এ কৌতূহলকে যদি দমন করা সম্ভব হয়, তা হ'লে, কাপড় খুলে নরনারীর উলঙ্গ দেহ দর্শনের কৌতূহল কেন দমনীয় হবে না? আর কৌতুহলের কি শেষ আছে? একটা চরিতার্থ কর্ব্বার সঙ্গে সঙ্গে দশটা এসে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়।

ইতিবৃত্ত খোঁজ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পৃথিবীর ইতিহাস খোঁজ, শত শত মানবের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী অন্বেষণ কর, নিজের জীবন নিজের চরিত্র মর্ম্মভেদিনী দৃষ্টি-সহকারে অধ্যয়ন কর। তখন আপনি বুঝতে পারবে, উলঙ্গ থাকাই সভ্যতার বর্দ্ধক, না বস্ত্র-বিলাসিতাই সভ্যতার বর্দ্ধক, না, বস্ত্র ব্যবহারেও সংযমের অনুশীলন করা সভ্যতার বর্দ্ধক। তখন ধরা পড়বে যে, কিরূপ অবস্থা মানুষের সুপ্ত পশুবৃত্তিকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলেছে।

রহিমপুর

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৩৮

অদ্য শেষ রাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবা প্রথমতঃ পাটশোলার কলম দিয়া কয়েকখানা মন্ত্রবাণী লিখিলেন। এই সকল মন্ত্রবাণী মুরাদনগর হাইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে আশ্রমের ব্যয় সংস্থান করা হইতেছে। শ্রীমান্ উমাকান্ত সাহা, বিনোদবিহারী রায় এবং দেবেন্দ্রচন্দ্র পোদ্দার এই সকল মন্ত্রবাণী ছাত্রদের মধ্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। এই কয়জনের মধ্যে উমাকান্তের উৎসাহই সর্ব্বাধিক এবং তুলনা-রহিত।

তপোবন

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা বিভিন্ন স্থানে কয়েকখানা পত্র লিখিলেন। একখানা পত্রে লিখিলেন,—

"অদ্যই একখানা বাসগৃহের ইট গাঁথিবার কাজ সুরু করিব। এই থানাতে আশ্রম-কর্ম্মীরা বাস করুন, আপাততঃ ইহাই কল্পনা। আনুমানিক সপ্তাহ-কাল মধ্যে অপর একখানা বাসগৃহ নির্ম্মাণের কাজে হাত দিব। গৃহখানা সম্পূর্ণ হইলে তাহার নাম রাখিব 'তপোবন'। বাহিরের কর্ত্তব্য-বোধেই মাত্র কোলাহল করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু আমি জানি, আমার প্রতিভার প্রতিষ্ঠা-ভূমি তপস্যা। নিজে তপস্বী রহিব এবং শত শত বালারুণ-সমপ্রভ দিব্য জীবন-যাপনকারী তরুণকে তপস্যায় রত দেখিব, ইহাই আমার কাম্য। * * * পুপুন্কী শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহেরও অনুপযোগী স্থান, * * * কিন্তু এ অঞ্চলের জন-

সাধারণের হৃদয় বড় কোমল, চিত্ত বড় প্রেমিক। এখানকার মায়েদের হৃদয়ে সুগভীর ভালবাসা, যুবকদের হৃদয়ে প্রচুর দরদ, প্রৌঢ়দের বুদ্ধিতে যথেষ্ট সদ্বিবেচনা। * * * কিন্তু গুপ্ত-ঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরিকা অশান্ত আগ্রহে আমার পৃষ্ঠ-সন্নিধানে ঘুরিতেছে। * * * সঙ্কল্প করিয়াছি, স্বেচ্ছায় এ দেশ ত্যাগ করিব না। লোকে কাপুরুষ বলিবে, ইহাই আমার বিবেচ্য নহে। যেখানে কাপুরুষত্ব অবিমিশ্র লোককল্যাণের পোষাক, সেখানে কাপুরুষ সাজিতে আমি সম্মত আছি। কিন্তু এখানে সমস্যা পৃথক। * * * তাই আমি প্রতীক্ষা করিতেছি এবং হয় ত বৃথাই এখানে 'তপোবন' গড়িবার প্রয়াস করিতেছি। যাহা হয়ত কোনও কাজেই আসিবে না, তাহারই জন্য সুকঠোর শ্রম করিতেছি। তথাপি ইহাতে আমার কত আনন্দ জান? আসন্ন-প্রসবা জননী যেমন সন্তানের আবির্ভাবের আশায় আনন্দিতা। গণক ব্রাহ্মণ জড়পিণ্ড প্রসবের ভবিষ্যদ্‌বাণী করা সত্ত্বেও তার যে আনন্দ,—আমারও তদ্বৎ।"

জাতির ভিত্তি-সংগঠকের কৃতিত্ব

প্রাতঃকাল হইতেই ব্রজধামের ভিত্তি-গাঁথা সুরু হইল। ভিত্তি গাঁথিতে গাঁথিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গৃহের যেমন গোঁড়া বাঁধতে হয় আগে, জাতির তেমন ভিত্তি গাঁথিতে হয় আগে। যাঁরা ভিত্তি গাঁথেন, লোকে তাঁদের চেনে না, কারণ, যে সৌধ যত উচ্চ, তার ভিত্তি তত গভীর। কিন্তু চূড়ার উপরে সোনার পাত মু'ড়ে দেন যাঁরা, তাদের চেয়ে ভিত্তি-সংগঠকদের কৃতিত্ব বেশী।

সংগঠনের প্রথম কথা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মহৎ ব্রত মহৎ পণ, সবার গোড়া সংগঠন। কোথায় কি আছে অজ্ঞাত উপাদান, তাকে খুঁজে বে'র কত্তে হবে। কোথায় কি আছে অব্যবহৃত উপাদান, তাকে সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে এনে জমা কত্তে হবে। কোথায় কি আছে অবজ্ঞাত উপাদান, তার আদর শিখ্‌তে হবে। কোথায় কি আছে অপব্যবহৃত উপাদান, তার বৃথা অপচয় বন্ধ কত্তে হবে। এইটী হ'ল সংগঠনের প্রথম কথা অর্থাৎ পিপীলিকার শক্তিও শক্তি, চাম্‌চিকা বা আরসোলাও উপেক্ষার নয়।

সংগঠনের দ্বিতীয় কথা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যেখানে যা-কিছু উপাদানের খোঁজ মিলেছে, সবগুলির ভিতরের সম্পূর্ণ শক্তিকে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। যে উপাদানের যে শক্তিটুকুর বৃহত্তর বিকাশ বা মহত্তর উৎকর্ষ সম্ভব, তার সেটুকু বিকশিত ও উৎকর্ষিত ক'রে তুল্‌তে হবে। অর্থাৎ চড়াই পাখী দিয়ে বাজের কাজ, গোষ্পদে সমুদ্রের কাজ, কয়লা দিয়ে হীরার কাজ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা দেখতে হবে। কাউকেই তুচ্ছ ব'লে জ্ঞান না ক'রে সম্ভব হ'লে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া তৈরী কত্তে হবে, মূষিককে দিয়ে গজরাজের কাজ করাতে হবে, এইটী হ'ল সংগঠনের দ্বিতীয় কথা।

সংগঠনের তৃতীয় কথা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উত্তম,অধম, অধিকারি-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের প্রাণে একটী মাত্র লক্ষ্য লাভের জন্য উন্মাদনা সৃষ্টি করা হ'ল, সংগঠনের তৃতীয় কথা। যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেইখানে থেকেই লক্ষ্য লাভের জন্য প্রাণ দাও।

হাতে কাম, মুখে রাম

কাজ করিবার সময়ে একটী শৃঙ্খলা সর্ব্বদাই শ্রীশ্রীবাবা কর্ম্মিগণের মধ্যে রক্ষা করিয়া চলিয়া থাকেন। তাহা এই যে, কাজ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসু-দের আবশ্যকীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাইতে থাকিবেন, সকলে তাহা যার যার সুযোগমত শুনিতে থাকিবে, কিন্তু কথা শুনিবার জন্যও কেহ নিজ নিজ কাজে শিথিলতা করিবে না। শ্রীশ্রীবাবা অত্যন্ত দ্রুতকর্ম্মা ব্যক্তি। ইট গাঁথিবার সময়ে যে ব্যক্তি তাঁর হাতে ইট যোগাইয়া থাকে, সাধারণতঃ সেই শ্রীশ্রীবাবার সব কথা শুনিয়া থাকে, কিন্তু কথা শুনিতেছে বলিয়া যে তার নির্দ্দিষ্ট কাজে সে শিথিল-প্রযত্ন বা অমনোযোগী হইবে, এই সাধ্য নাই। একটী গ্রাম্য প্রবচন আছে,—"হাতে কাম, মুখে রাম।" শ্রীশ্রীবাবা সেই প্রবচনটীকে প্রতিদিনকার সঙ্ঘবদ্ধ কাজগুলিতে দৃষ্টান্তীকৃত করিতেছেন। অথচ নিজে যখন একাকী কোনও কাজ করেন, তখন ঢাক পিটাইলেও সেই শব্দ তাঁর কর্ণে প্রবেশ করে না। কোনও কোনও দিন কাজ করিবার সময়ে তিনি সকলকে নিঃশব্দ থাকিতে বাধ্য করেন এবং নিজেও নিঃশব্দ থাকেন।

রহিমপুর,
১৫ ফাল্গুন, ১৩৩৮

সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরেই 'ব্রজধামের' গাথুনির কাজ সুরু হইয়াছে। অদ্য রবিবার বলিয়া রহিমপুর, নবীপুর ও হোসেনতলার অনেক ছেলেই আসিয়া কাজে লাগিয়াছেন। একাকী কাজ করিতে যাহারা উৎসাহ পায় না, সদলবলে কাজ করিতে তাহাদেরও উৎসাহের অবধি থাকে না।

অরন্ধন

বর্ত্তমান কাজের চাপ বেশী পড়াতে নিয়ম করা হইয়াছে যে, আশ্রমের ব্রহ্মচারীদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিশ্রান্ত, রন্ধনের কাজটা সেই করিবে, অপরাপরেরা ইষ্টক নির্ম্মাণ, ইষ্টক বহন, গাঁথুনি প্রভৃতির কাজ করিবে। কিন্তু গত সন্ধ্যায় আশ্রমের আহার্য্য-ভাণ্ডার শূন্য হইয়াছে। আশ্রমীয়েরা অর্দ্ধোদরে রাত্রি কাটাইয়াছেন। মন্ত্রবাণী বিক্রয় হয় নাই, সুতরাং হাতে অর্থ নাই। গ্রামবাসীদিগকে অভাবের কথা জ্ঞাপন করা নিয়মবিরুদ্ধ, অতএব গ্রামীণগণও কিছুই জানেন না। কিন্তু আজ যখন রন্ধন-দ্রব্যের সঙ্গে সাক্ষাৎই নাই, তখন আর রন্ধন-গৃহে একটী ব্রহ্মচারীকে বৃথা আটক করিয়া রাখিয়া লাভ কি? সুতরাং সেই ব্রহ্মচারীও শ্রীশ্রীবাবার আদেশে কাজে লাগিয়াছে। ভারবহনে শারীরিক অসুবিধা থাকায়, ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবাবার হাতে ইটের যোগান দিতেছে।

বেলা এগারটা পর্য্যন্ত কাজ করিবার পরে গ্রামের যুবকেরা নিজ নিজ গৃহে আহার করিতে চলিয়া গেল। শ্রীশ্রীবাবা এবং আশ্রমের ব্রহ্মচারীরা আরও ঘণ্টাখানিক কাজ করিয়া গোমতী নদীতে স্নান করিতে গেলেন।

নবীপুরের বদান্যতা

স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল, নবীপুর হইতে অবিনাশ পোদ্দার ও বিধুভূষণ পোদ্দার দুইটি থালিকা ও কয়েকটী পাত্রে করিয়া অন্ন, আলুর দম, সীম ও উচ্ছে ভাজা, চাটনি, লুচি, পায়েস, পাটিশাবড়া পিঠা এবং মোহনভোগ নিয়া উপস্থিত। বলা বাহুল্য, প্রাপ্ত ভোজ্যের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা হইল।

বর্ত্তমান সময়ে আশ্রমের আহারীয় ব্যবস্থা বিধানে নবীপুরের শ্রীযুক্ত গুরুচরণ পোদ্দার, শ্রীযুক্ত হরিমোহন পোদ্দার এবং উক্ত গ্রামের রাধা-দেবী প্রমুখ ভক্তিমতী মহিলারা যাহা করিতেছেন, তাহা যেমনই অপ্রত্যাশিত, তেমনই প্রশংসার্হ। বলা প্রয়োজন, শ্রীশ্রীবাবা যে মন্ত্রবাণীসমূহ মোটা মোটা হরফে লিখিয়া বিক্রয়ার্থ স্কুলে পাঠাইতেন, কোনও কারণবশতঃ তাহার বিক্রয়ের পথে কিঞ্চিৎ বাধা উপস্থিত হওয়াতে নবীপুর-বাসীদের এই বদান্যতা আশ্রমের পক্ষে অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে। এতদিন রহিমপুরের সূর্য্যবাবু এবং গিরিশ দাদা গোপনে গোপনে আশ্রম-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেন। কাহার কাছ হইতে যে তাঁহারা কি আনিতেন, তাহা জানা যাইত না। এখন হইতে নবীপুরের গুরুচরণবাবু ও হরিমোহনবাবু এই দুই মহাপ্রাণ ব্যক্তি সূর্য্যবাবুরে সঙ্গে যুক্ত হইয়াছেন।

পুপুন্‌কীর কঠোরতার সহিত তুলনা করিলে রহিমপুরের কঠোরতা কিছুই নহে। কিন্তু কঠিন মৃত্তিকার উপরই হউক আর কোমল মৃত্তিকার উপরই হউক, উপবাস উপবাসই। বিশেষতঃ আশ্রমে কয়েকজন বালককর্ম্মী রহিয়াছে।

না চাহিতে যাঁহারা পরহিতব্রত ব্যক্তিরে ক্ষুৎপিপাসা বিদূরণ করেন, সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরা অনন্ত আত্ম-প্রসাদের অধিকারী হউন!

শৃঙ্খলা

সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পরেই শারীরিক শ্রমে বিরাম ঘটিল। নিজ নিজ উপাসনা সমাপনান্তে শ্রীমান উমাকান্ত সাহা এবং আরও দুই একটী যুবক শ্রীশ্রীবাবার উপদেশামৃত পান করিবার জন্য আগমন করিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শৃঙ্খলা আর আজ্ঞাবহতা সঙ্ঘের প্রাণ। কর্ত্তৃত্বলিপ্সা সঙ্ঘের ধ্বংসের সিঁড়ি। ক্ষুদ্রকাজেও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। তোরা শৃঙ্খলার দিকে প্রখর দৃষ্টি দিবি। শৃঙ্খলা বজায় রেখে কাজ কত্তে গেলে প্রথম প্রথম মনে হবে যেন, কাজ কম হচ্ছে। কিন্তু কিছুদিন পরে লক্ষ্য কল্লেই দেখতে পাবি, কাজ আগের চেয়ে দ্বিগুণ বেগে এগুচ্ছে।

রহিমপুর
১৬ ফাল্গুন, ১৩৩৮

শেষ রাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিতে বসিলেন।

অন্যায় বিবাহে আবদ্ধা যুবতীর প্রতি

অন্যায় ভাবে বিবাহে আবদ্ধা একটী যুবতীর নিকটে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"তোমাকে আমি মা কুমারীর মতই দেখি। একটী অপ্রত্যাশিত ও অন্যায় বিবাহ তোমার জীবনটাকে মৃত্যু পর্য্যন্ত কেবল দগ্ধই করুক, ইহা কখনই ধর্ম্মানু-মোদিত হইতে পারে না। তুমি যদি তোমার নিজের সুখের জন্য এককণাও না রাখিয়া সমগ্র জীবনটাকে ঈশ্বরের কাজে নিঃশেষে দিতে প্রস্তুত হও, তাহা হইলে জগৎটাও ভুলিয়া যাইবে যে, তোমাকে একদিন পিতামাতা না জানিয়া না বুঝিয়া সমাজের রক্তচক্ষুর ডরে বিবাহ নামক একটা রথের চাকার নীচে নির্ম্মম চিত্তে ফেলিয়া দিয়াছিলেন।

"মীরাবাঈ ছিলেন রাজরাণী, চিতোরের রাণা কুম্ভের পত্নী, কিন্তু শ্রীশ্রীভগবানের প্রেমের টান যখনি তাহাকে জগৎ ভুলাইল, তখনি তিনি নিন্দা প্রভৃতির অতীত মহাপুরুষ। ঢাকাতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কৃপাশ্রিতা যমুনা মাঈ এভাবেই তাঁর প্রেমময় স্বামী ও স্নেহপুত্তলী পুত্রকন্যাকে ভুলিয়া হরিনামে পাগল হইলেন, প্রথমে কিছুদিন অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়া সমাজ পরে তাঁর পূজা করিল। আমি ভগবৎপাদপদ্মে সম্যক আত্ম-সমর্পণের অভাবনীয় শক্তিতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী, সমাজবিধি বা সামাজিক নিষেধের শক্তিতে আমার আস্থা তার চেয়ে প্রভূতপরিমাণে অল্প।"

রহিমপুর
১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৮

কেমন ছেলে চাই ?

মুঙ্গের-জেলার অন্তর্গত বেগুসরাই নামক স্থানে একটী যুবককে আজ শ্রীশ্রীবাবা কবিতাতে একখানা পত্র লিখিলেন,—

"প্রাণের--,

অতীতের শত শৌর্য্য-বীর্য্য
কীর্ত্তি-কাহিনী-চয়
করেছে কি তোর কুসুম-কোমল
চিত্তখানিরে জয় ?

বর্ত্তমানের দুঃখ-বেদনা
জাগিয়েছে কিরে ব্যথার চেতনা ?
পরার্থে প্রাণ করিতে প্রদান
হলি কিরে নির্ভয় ?

দৃষ্টি কি তোর ভেদিল হতাশা
তমো-আবরণ-ময় ?

বিশ্ব যখন বিশ্ব-পতিরে
একেবারে গেল ভুলে,
তুই কি তখন দেখেছিস্ তাঁরে
প্রেমারুণ আঁখি তু'লে ?
ক্ষুধিতের ঐ দগ্ধ জঠরে,
তৃষিতের ঐ কণ্ঠের স্বরে,
দুঃখীর বুকে, আর্ত্তের মুখে,
চির-ক্রন্দন-রোলে,
তাঁর বিচিত্র চিত্র কি তুই
দেখেছিস্ চ'খ খুলে ?

সহস্র জন সহস্র পথে
করিছে আত্ম-তোষ ;—
পরার্থে দিয়া বুকের রক্ত
তোর কিরে সন্তোষ ?

গুপ্ত প্রাণের সুপ্ত কামনা
পরার্থ-পথে জানাইলে মানা
নিজের উপরে শতবার তোর
জাগে কি রুদ্র রোষ ?
দগ্ধ করিস্ সে অনলে তুই
স্বার্থপরতা-দোষ ?

এমন ছেলেই শত সহস্র
চাই কোলে তু'লে নিতে,
এমন ছেলেই চাই, কোনো ভয়
কভু নাই যার চিতে,
মৃত্যুরে করে শত পদাঘাত,
লোকমানে করে অভিসম্পাত,
বজ্রের মত ব্যর্থতাহীন
অধর্ম্মে দগ্ধিতে,
চাপল্যহীন স্থির বিদ্যুৎ
অজ্ঞান পরাজিতে।

সবাই যখন স্বার্থের দায়ে
আদর্শে দিবে বলি,
তুই কিরে বাছা স্পর্দ্ধিত পায়ে
সব-কিছু যাবি দলি ?
সবাই যখন নিদ্রা-কাতর,
তুই কি জাগিবি মৃত্যু-বাসর ?
অপরে যখন লালসা-নেশায়
ভূমিতলে পড়ে ঢলি,'
তুই কি তখন লভিবি লক্ষ্য
বীর-বিক্রমে চলি ?

আয় বাছা বুকে আয়,
আমার অধর তোর অধরেই
শত চুম্বন চায়। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ”

দৃষ্টান্তের শক্তি

দ্বিপ্রহরের পরে প্রায় তিন ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা যখন কর্ণি লইয়া ইট গাঁথিবার কাজে ব্যস্ত রহিয়াছেন, এই সময়ে গুঞ্জরবাসী জনৈক ভদ্রলোক পথ দিয়া যাইতেছিলেন। প্রথমত তিনি ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন, তারপর শিবমন্দিরের বারান্দায় একটু বসিলেন, কিছুক্ষণ পরে আগাইয়া আসিয়া স্বয়ং ইট যোগাইবার কাজে লাগিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—দৃষ্টান্তের শক্তি! কেমন, না? যোগীদের যোগ, জাপকদের জপ, সাধকদের সাধনা দে'খে যদি এই রকম হয়, তবে কিই না সুখের হয়!

ভদ্রলোক বলিলেন,—যোগের, জপের আর সাধনার দৃষ্টান্ত আমাদের চ'খে পড়্‌লে তবে ত? আমরা ত দিনরাত ভণ্ডামিরই দৃষ্টান্ত দেখ্‌ছি।

শ্রীশ্রীবাবা উচ্চৈঃস্বরে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

অদ্য পুপুন্‌কীর শ্রীমান্ পঞ্চানন হালদার নারায়ণগঞ্জের পথে পুপুনকী রওনা হইয়াছে। মাস দুই ধরিয়া সে এখানে ইষ্টক নির্ম্মাণের কাজে ব্যস্ত আছে। এতদিন গ্রামের সকলকে সে ইষ্টক নির্ম্মাণ শিখাইয়াছে এবং নিজে প্রত্যহ পাঁচ ছয় শত করিয়া ইষ্টক কাটিয়াছে। এই দুই মাস শ্রীযুক্ত অশ্বিনী পোদ্দার পঞ্চাননের আহারীয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতার বন্ধন

কথায় কথায় শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কল্‌কাতার কোনও একটী সংস্কৃতি-মূলক সমিতি আমাকে একখানি মুদ্রিত প্রশ্নপত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে একটা প্রশ্ন ছিল,—ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিতর সহযোগিতার বন্ধন কি ক'রে সৃষ্টি

করা যায়। আমি তদুত্তরে জানিয়েছিলুম যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরস্পরের মধ্যে সাময়িক ভাবে কর্ম্মি-বিনিময়ের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হ'তে পারে। পঞ্চানন এখানে এসে দুমাস কাজ ক'রে গেল, না, রহিমপুরের ওপরে পুপুন্‌কার যেন একটা অধিকার-সৃষ্টি হ'য়ে গেল।

রহিমপুর

১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৮

ভক্তশ্রেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র

ভোর পাঁচটার সময়ে ব্রজধামের গাঁথুনির কাজ সুরু হইল, দ্বিপ্রহর দুইটায় থামিল। অপরাহ্ণ তিনটায় পুনরায় কার্য্যারম্ভ হইল এবং সন্ধ্যা সাতটায় থামিল। বৃদ্ধ গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নিঃশব্দে একখানা কর্ণি লইয়া আগাগোড়া শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে সঙ্গে খাটিয়া গেলেন। কি যে অদ্ভুত ভক্তি এই ব্যক্তিটীর তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে পারিব না।

সৃষ্টি ও ধ্বংস

সন্ধ্যার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা গিরিশ, এই যে এত কষ্ট ক'রে ইট গাঁথছ, কিছুদিন পরে যদি দেখ, সব ধ্বংসস্তূপ, তখন কেমন লাগ্‌বে?

শ্রীযুক্ত গিরিশ বলিলেন,—সে দৃশ্য আমি সইতে পার্‌ব না।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমি কিন্তু সৃষ্টিতে আর ধ্বংসে কোনও তফাৎ দেখি না। গড়ার সময়েই আমি স্থির ক'রে রাখি যে এ জিনিষ নিশ্চিতই ভাঙ্গবে।

সূর্য্যোদয় হইতে বেলা এক ঘটিকা পর্য্যন্ত গাঁথুনির কাজ চলিল। নবীপুরের এক বাড়ীতে অষ্টপ্রহর নাম-কীর্ত্তন ছিল, প্রায় দুই ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা সেইখানে গেলেন। আশ্রমের একটি ব্রহ্মচারী নাম-কীর্ত্তনকারীদের সহিত মিলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা নিস্তব্ধ মৌন-সহকারে নামকীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন।

শৈশবই দেবত্ব

অষ্টপ্রহর হইতে ফিরিবার পথে অর্দ্ধ ঘণ্টাকালের জন্য শ্রীশ্রীবাবাকে শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র সাহার বাড়ীতে অপেক্ষা করিতে হইল। ছোট ছোট বালক-বালিকারা চারিদিক হইতে শ্রীশ্রীবাবাকে ঘিরিয়া ফেলিল। শ্রীশ্রীবাবা সকলের সঙ্গে রঙ্গকৌতুকে মাতিয়া গেলেন।

ছেলেমেয়েদের উৎসাহের তোড় কিছু প্রশমিত হইলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শৈশবই দেবত্ব। কারণ শৈশব হচ্ছে সরলতা, নির্ভীকতা, সরসতা।

নাম কীর্ত্তনে লম্ফঝম্ফ

নবীপুর হইতে আশ্রমে আসিয়াই পুনরায় ইট-গাঁথুনির কাজ সুরু হইল। যে ব্রহ্মচারীটী অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনের সময়ে উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিলেন, তিনি কিছুকাল কাজ করার পরেই হাঁপাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্যাপার কি রে?

ব্রহ্মচারী যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, নর্ত্তন-কুর্দ্দন একটু অধিক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া শরীরে ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভূত হইতেছে।

রাত্রিকালে ব্রহ্মচারিজী বক্ষে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা সময়োপযোগী একটা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিয়া পরিশেষে বলিলেন,—নাম-কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য হইল, ভগবানে মনকে ধ্যানাবিষ্ট করা। ব্যায়াম-কুস্তি করার জন্য ত' নাম-কীর্ত্তন নয়, কীর্ত্তন কত্তে গিয়েছিলি, কীর্ত্তন নিয়েই থাকা সুসঙ্গত হ'ত। লাফালাফি কল্লি কেন?

ব্রহ্মচারী প্রকাশ করিলেন যে, সবাই লম্ফঝম্ফ দেন দেখিয়া তিনিও উহা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য ভগবানের মাঝে মন-প্রাণকে ডুবিয়ে দেওয়া। মনপ্রাণকে তাঁর ভিতর ডুবিয়ে দিতে হ'লে শরীরের অচঞ্চলতা আর অঙ্গভঙ্গীর স্থিরতাই অধিকতর ফলপ্রদ।

নাম কীর্ত্তনে উচ্চ-চীৎকার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তুই কণ্ঠস্বর বিকৃত ক'রে কীর্ত্তন কচ্ছিলি কেন?

ব্রহ্মচারী কোনও উত্তর দিলেন না, নতমুখে রহিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধ্যাতীত উচ্চ চীৎকার মাথা গরম করে, ধ্যানের শক্তি কমায়। বড়ই দুঃখের বিষয়, যাঁরা নাম-কীর্ত্তনের সমর্থক, তাঁরা একথা ভাব্‌তে ভুলে যান যে, কীর্ত্তন যাতে ধ্যানাবেশের অনুকূল হয়, তার দিকে প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা সঙ্গত।

রহিমপুর
২০শে ফাল্গুন, ১৩৩৮

কথা ও কাজ

গাঁথুনির কাজে সুকঠোর পরিশ্রম চলিয়াছে। গ্রামের একটি ছেলে কাজ করিতে করিতে বড় অসম্ভব রকমের বাচালতা প্রকাশ করিতেছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার যদি এমন কথা থাকে, কাজের সময়ে যা না বল্‌লে কাজের ক্ষতি হয়, তবে সে কথা বল। তোমার যদি এমন কথা থাকে, কাজের সময়ে যা বল্‌লে কাজের ক্ষতি হবে না, তাও বল্‌তে পার। কিন্তু তা না বল্লেই বা ক্ষতি কি? কথার চেয়ে কাজের দাম বেশী। কথা ক'য়ে ক'য়ে যারা কাজের ক্ষতি করে, তাদের কি কেউ বুদ্ধিমান বলবে?

নীরবতার শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মৌনের শক্তি অভাবনীয়। আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাসের মত সে শক্তি হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। বাক্যকে সংযত কর এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্তির সঞ্চয় রাখো। তুব্‌ড়ীর মত সব শক্তি এখনি নিঃশেষিত ক'রে দিও না।

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—আমার কি ইচ্ছা করে জানিস্? তোদের সকলের সংসর্গ ত্যাগ ক'রে মৌনী হ'য়ে একটা জনবিরল স্থানে শুধু তপস্যা করি। তপস্যার শক্তিতে জগতে আপনা আপনি কল্যাণ হবে। কিন্তু তা পেরে উঠছি না। কারণ, তোদের ভালবাসি।

এই কথা বলিয়া শ্রীশ্রীবাবা নিঃশব্দে গাঁথুনির কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। যত জন ছিল, প্রত্যেকে নীরবে কাজ করিতে লাগিল। বেলা বারো ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা কর্ণি রাখিয়া ছায়ায় আসিয়া বিশ্রামে বসিলেন।

পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে

অপরাহ্ণ কালে একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মহামেধাবী গুরুও নির্ব্বোধ শিষ্যপালের মধ্যে প'ড়ে ব্যর্থকাম হ'য়ে যান্। মহাতেজস্বী গুরুও দুশ্চরিত্র ও অপবিত্র-চেতা শিষ্যদলের মাঝখানে প'ড়ে নিষ্প্রভ হ'য়ে যান্। এই জন্যই অনেক মহাপুরুষেরা অধিক শিষ্য করেন না।

মানব-গুরু ও ব্রহ্ম-গুরু

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরু যতক্ষণ মানব, ততক্ষণ মানবোচিত এই সব সীমাবদ্ধতা তাঁর থাক্‌বেই। এজন্য আর আফশোষ ক'রে কি হবে? গুরু যখন ব্রহ্ম, তখন পদ্মপত্রে জলের ন্যায় মানব-ধর্ম্মে তিনি অলগ্ন। অতত্রব প্রত্যেকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত একমাত্র ব্রহ্মগুরুর। দিকে দিকে ধ্বনি উঠুক "জয় ব্রহ্মগুরু"।

জগতে সকলেই পরস্পরের গুরু-ভ্রাতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষ যখন গুরু, তখন এঁর গুরু. তাঁর গুরু ব'লে ভিন্ন ভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার কত্তে হয়। ব্রহ্ম যখন গুরু, তখন সবার গুরু এক। তখন মানুষের পাদোদক, আর মানুষের পদধূলি নিয়ে কাড়াকাড়ির প্রয়োজন থাকে না, তখন সবাই এক অক্ষয় অব্যয় অখণ্ড গুরুর শিষ্য, সবাই এক অক্ষয় অব্যয় অখণ্ড পিতার সন্তান, জগতের ছোট বড় সবাই তখন পরস্পর গুরুভাই।

দীক্ষাদাতাকেও গুরু-ভ্রাতা বলিয়া জ্ঞান কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমাকে যিনি মঙ্গলময় ভগবানের আনন্দময় নামে দীক্ষা দিবেন, তাঁকে তোমার গুরু ব'লে জ্ঞান না ক'রে গুরুভ্রাতা ব'লে জ্ঞান কর। তাঁর মূর্ত্তি ধ্যান না ক'রে, তাঁর কথিত মন্ত্রের ধ্যান কর। এতে তাঁকে অসম্মান করা হবে না কিম্বা তাঁর যদি সাধনার সঞ্চিত শক্তি কিছু থাকে, তবে আশীর্ব্বাদরূপে তোমার ভিতরে তার সঞ্চারণার পথও রুদ্ধ হবে না।

কৃত্রিম গুরুত্ব ও কৃত্রিম শিষ্যত্ব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতে সকলেই সকলের কাছ থেকে সাহায্য

নেবে, দীক্ষিত দীক্ষাদাতার কাছ থেকে, দীক্ষাদাতা দীক্ষিতের কাছ থেকে। তোমরা জানো না, কিন্তু সাধকেরা এমন দৃষ্টান্ত অনেক জানেন, যেখানে দীক্ষা-দাতা মন্ত্রদানের ছল ক'রে দীক্ষিতের কাছ থেকে শক্তি আহরণই করেছেন। সুতরাং দীক্ষিত ও দীক্ষাদাতার মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ ক'রে একটা কৃত্রিম গুরুত্ব ও কৃত্রিম শিষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার কি খুব বেশী সার্থকতা আছে?

ইষ্টমন্ত্রই গুরু

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—আপনিও ত' আমাদের অনেককে দীক্ষা দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু আমি কি তোদের গুরু? আমি যে মন্ত্র তোদের দিয়েছি, সেই মন্ত্রই তোদের গুরু। অর্থাৎ আমারও যিনি গুরু, তোদেরও তিনিই গুরু। মন্ত্রগুরুকে প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি তোদের গুরু।

ধারাবাহিক গুরুবাদের অবসান

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—আপনার হয়ত এই ভাব থাকৃতে পারে। কিন্তু আপনার পাঞ্চভৌতিক দেহ যখন থাকৃবে না তখন আপনার শিষ্যেরা কি কেউ কেউ সাধনপ্রার্থী লোককে দীক্ষা দেবেন না এবং তাঁরা কি তাদের গুরু হবেন না?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমার পরবর্ত্তীরা নূতন নূতন লোককে দীক্ষা দিয়ে সাধনের পথে টেনে আন্‌বেন বৈকি! কিন্তু মন্ত্রদান ক'রেও তাঁরা কারো গুরু হবেন না। মন্ত্রদানকে একটা গুপ্ত ব্যাপার ক'রে রাখাতেই ব্যক্তিগত গুরুবাদ এমন শক্ত হ'য়ে শিকড় গেড়েছে। মন্ত্রদান একটা প্রকাশ্য ব্যাপার হবে এবং এক সঙ্গে ধর্ম্মনিষ্ঠ তিনজন সমসাধক আচার্য্য দীক্ষার্থীকে দীক্ষা দিয়ে মন্ত্ররূপী ব্রহ্মগুরুর শিষ্য ক'রে দেবেন। ধারাবাহিক গুরুবাদ চলবার আর প্রয়োজন নেই, যিনি যাকে দীক্ষা দেবেন, তিনি তাকে ওঙ্কাররূপী সদ্‌গুরুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবেন মাত্র;—নিজে গুরু হবেন না। এই নিষ্ঠাকে এই সত্যকে সাধক-জীবনে ব্যাপক দৃঢ়তা দেবার জন্যই আমার গুরুবেশ ধারণ।

রহিমপুর

২১শে ফাল্গুন, ১৩৩৮

শিবচতুর্দ্দশীর দিন। অদ্য শ্রীশ্রীবাবা আশ্রম-পুকুরের পশ্চিম পাড়ে

"তপোবনের" নেও খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। অদ্য শ্রীশ্রীবাবার মুখে কথা নাই, সঙ্গীরাও কথাবার্ত্তা বলিতে অনুমতি পান নাই।

গতকল্য নবীপুর হইতে শ্রীযুক্ত হরিমোহন পোদ্দার মহাশয় আশ্রমীদের জন্য সব্যঞ্জন পক্কান্ন প্রেরণ করিয়াছিলেন। অদ্য নবীপুরের শ্রীযুক্ত গুরুচরণ পণ্ডিত মহাশয় অর্দ্ধমণ আতপ তণ্ডুল প্রেরণ করিলেন।

শিব-মন্দিরে ওঙ্কার অর্চ্চনা

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই এই ভূমির উপরে যে শিবমন্দিরটী ছিল, কতিপয় দিবস আগে সেই মন্দিরের শিব-বিগ্রহটী পরধর্ম্মদ্বেষী দুর্ব্বৃত্তদের দ্বারা অপসারিত হইয়াছিল। অদ্য পর্য্যন্তও সেই বিগ্রহ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। কিন্তু আজ শিবচতুর্দ্দশী। প্রহরে প্রহরে শিবার্চ্চনা হইবে, অথচ বিগ্রহ নাই। শ্রীশ্রীবাবা বারাণসী হইতে একটী ওঙ্কার-বিগ্রহ নিয়া আসিয়াছিলেন, যাহা এতদিন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর গৃহে পূজিত হইয়া আসিয়াছেন। কাহারও ইঙ্গিত-নিরপেক্ষ ভাবে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেই ওঙ্কার-বিগ্রহ আনিয়া গৌরীপট্টের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। প্রহরে প্রহরে শ্রীশ্রীবাবা ওঙ্কার-স্তোত্র বলিয়া যাইতে লাগিলেন, সমবেত ভক্তগণ পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। শিববিগ্রহ অপহরণজনিত ক্লেশ আজ ওঙ্কার-বিগ্রহের পুনঃ-স্থাপনে গ্রামবাসীদের অন্তর হইতে দূরীভূত হইল। পরিশেষে দীর্ঘকালব্যাপী সুমধুর "হরি ওঁ" কীর্ত্তনে ভক্ত-জন-হৃদয় প্রেমরসে যেন কাণায় কাণায় পূর্ণ হইল।

রহিমপুর

২২শে, ফাল্গুন, ১৩৩৮

অদ্যও "তপোবনের" কার্য্য চলিল। শ্রীশ্রীবাবা ও কর্ম্মীরা বলিতে গেলে একরূপ নিঃশব্দেই কাজ করিলেন।

বাঙ্গরার বালকগণের বদান্যতা

শ্রীমান্ ধ্রুবদাস ভট্টাচার্য্য বাঙ্গরা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েন। অদ্য তিনি বাঙ্গরা স্কুলের ব্রহ্মচর্য্যানুরাগী লোকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঁচটী

টাকা রহিমপুর প্রেরণ করিলেন। বালকদের এই স্বতঃপ্রণোদিত বদান্যতা দর্শনে শ্রীশ্রীবাবা মুগ্ধ হইলেন।

রহিমপুর
২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩৮

গতকল্য ও অদ্য "তপোবনের" যেরূপ কাজ চলিতেছে, তাহাতে কাহারও সহিত কাহারও কথা কহিবার অবসর নাই। বলিতে গেলে একরূপ নিঃশব্দেই সকলে কাজ করিতেছে। শ্রীশ্রীবাবার ত উপদেশই আছে, কাজের সময় নিঃশব্দ থাকিলে মনে মনে ভগবানের নাম জপ করিবার।

নবীপুরের ললিত পোদ্দার ও রহিমপুরের হলধর চক্রবর্ত্তী ইট বোঝাই দিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাবা, নবীপুরের অবিনাশ পোদ্দার এবং আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী প্রচণ্ড রৌদ্রতাপের মধ্যে পুকুরের পূর্ব্বপার হইতে পশ্চিম পারে ইষ্টক বহন করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিশ চক্রবর্ত্তী ইটের বোঝা নামাইতেছেন।

ভগবান ভারহারী

শ্রীযুক্ত গিরিশের একটী কথায় শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেউ বহন করে ধানের বোঝা, কেউ বহে জটার বোঝা, কেউ বহে সংসারের বোঝা, কেউ বহে সংস্কারের বোঝা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির বোঝা, কেউ বহন করে পাপের বোঝা, তাপের বোঝা, দুঃখের বোঝা। সকল বোঝা ঘাড় থেকে নেমে যায় যাঁর কাছে আস্‌লে, তিনিই ভগবান্।

দুঃখ কি দুর্ভাগ্য ?

বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। আশ্রমের এক ব্রহ্মচারী হঠাৎ অসতর্কতা বশতঃ মাথার ঝুড়ি-শুদ্ধ ইটের বোঝা পথের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে কিন্তু ইট-গুলি খুব ভাল পোড়া ছিল বলিয়া একখানাও ভাঙ্গিল না।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—দেখ্ দেখি, আগুনে পুড়্‌লে মাটি কেমন শক্ত হয়! তোরা এই রকম শক্ত হ, অগ্নিতে দগ্ধ হ'য়ে হ'য়ে খাঁটি হ! দুঃখের

জ্বলনে জ্ব'লে পু'ড়ে মানুষ হ। দুঃখকে দুর্ভাগ্য মনে না ক'রে সৌভাগ্য ব'লে গ্রহণ কত্তে সমর্থ হ।

নিষ্কাম কর্ম্মযোগ

অতঃপর স্নানের জন্য সকলেই গোমতীর জলে নামিলেন। আজিকার কাজ অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া কর্ম্মীরা পরস্পর আলোচনা করিতেছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমাদের এই পরিশ্রমকে বৃহত্তর শ্রমের সূচনা মাত্র ব'লে মনে কর্ব্বে। শ্রম কর সমস্তটা প্রাণ দিয়ে, কিন্তু একেবারে অনাসক্ত হয়ে। এত কষ্ট ক'রে যা ক'রছি, দরকার হ'লে নিমেষ মধ্যে তা পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাবার শক্তি থাকা চাই। কিন্তু বর্জ্জন ও নিঃস্পৃহ হয়ে, ভয়ে অথবা লোভে নয়।

অপরাহ্নে নূতন করিয়া কাদা ছানিয়া ইট কাটা সুরু হইল। কারণ, এখন হইতেই প্রত্যহ কিছু কিছু ইট না কাটিলে কয়েকদিন পরেই ইটের টান পড়িবে। একবেলা গাঁথুনীর কাজ ও একবেলা ইটকাটার কাজ হইবে। বিকাল বেলা স্কুল-ফেরৎ ছেলেরা আসিয়া যোগ দিতে পারিবে বলিয়াই এই ব্যবস্থা করা হইল, কারণ বিকালেও যদি গাঁথুনীর কাজ চালাইতে হয়, তবে অনেক যুবককে কাজের অভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে।

এই সময়ে দারোরা হইতে জননেতা শ্রীযুক্ত হলধর চৌধুরী মহাশয় কতিপয় সঙ্গী সহ রহিমপুর আশ্রমে আসিলেন। তিনি পূর্ব্বে কুমিল্লাতে ওকালতী করিতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ওকালতী ত্যাগ করিয়া এখন দেশের নানাবিধ সেবায় ব্রতী আছেন। সম্প্রতি কেওটগ্রামে একটী আশ্রম স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে, জনৈক ভূমিপতি কতকটুকু ভূমি দিতেছেন। এই ভূমির দলিল কি ভাবে রেজেষ্টারী করা সঙ্গত, তদ্বিষয়ে উপদেশ নেওয়াই হলধর বাবুর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য।

মানুষই প্রকৃত প্রতিষ্ঠান

এই বিষয়ে আবশ্যকীয় পরামর্শ দানের পরে উপসংহাররূপে শ্রীশ্রীবাবা

বলিলেন,—দেখুন হলধর বাবু, দলিল ত' একটা হবেই। কিন্তু এই বিষয়ে আপনার মেজাজ হওয়া উচিত,—"দলিল নিষ্প্রয়োজন"। একটুকরা ভূমি বা একখণ্ড ইট মানুষ তৈরী কর্ব্বে না। মানুষেই ভূমি করে, ইট গড়ে। মানুষ নিজেই হচ্ছে প্রকৃত প্রতিষ্ঠান।

সকল গুরুর শিষ্যেরাই স্বজাতি

নিলখি হইতে শ্রীযুক্ত হরিচরণ আচার্য্য আসিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—এক গুরুর শিষ্যরা সব নিজেদিগকে স্বজাতি মনে কত্তে পারে কি না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আপনি মনে ক'রে নিচ্ছেন যে, একজন ছাড়া জগতে দুইজন গুরু থাকতে পারেন। সেই মতকে স্বীকার ক'রেই বল্‌ছি,—জগতের সকল গুরুর শিষ্যেরাই স্বজাতি। কাউকে পর, কাউকে দূর মনে কর্ব্বার উপায় নেই।

গুণ-বিভাগ ও জাতি-নির্ণয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু একটা হিসাব আছে, যেই হিসাবে এক গুরুর শিষ্যেরাও সবাই স্বজাতি নয়। যেমন, এক সার্কাসওয়ালার খাঁচার জানোয়ারগুলি সব স্বজাতি নয়। সেই হিসাবটা হ'ল প্রকৃতির। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেরা সব একজাতি। রাজসিকেরা এক, তামসিকেরা এক। তামসিককে যদি সাত্ত্বিকতার দিকে টেনে আনতে না পারে. তা হ'লে সাত্ত্বিক জাতি তামসিকের সঙ্গে মিশে জাতি-সঙ্কর সৃষ্টি কর্ব্বেই কর্ব্বে। অথবা ওটাকে জাতি-সঙ্কর না ব'লে জাতি-সঙ্কট ব'ল্লেই কথাটা সুন্দরতর হয়। গর্ভে বা ঔরসে নয়, চামড়ার রংয়ে বা ধনের প্রাচুর্য্যে নয়, ভাষায় বা ভৌগলিকতায় নয়, জীবিকায় পাণ্ডিত্যে নয়, স্বজাতিত্ব নির্ভর করে চরিত্রের সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা আর তামসিকতায়।

রহিমপুর

২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩৮

ত্যাগের অর্থ

আশ্রমের ব্রহ্মচারিগণ ব্যতীত নবীপুরের অবিনাশ পোদ্দার, রহিমপুরের

সুকুমার ঘোষ, উমাকান্ত সাহা এবং হোসেন তলার ব্রজেন্দ্র সাহা শ্রীশ্রীবাবার সহিত গাঁথুনীর কাজ করিতেছেন। কাজ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবা বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

"ত্যাগনৈকেনামৃতত্বম্ আনশুঃ।"

পরে বলিলেন,—অমৃতত্ব চাও ত' ত্যাগী হও। ত্যাগী হওয়ার প্রথম মানে ক্ষুদ্রকে ক্ষণস্থায়ীকে ত্যাগ ক'রে মহৎকে অবিনশ্বরকে গ্রহণ করা। পরের মানে,—কর্ম্ম করা কিন্তু কর্ম্ম-ফলকে ত্যাগ করা।

অনেক চিঠি জমিয়াছে। দ্বিপ্রহরে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবা পাঁচ ছয়খানা পত্রের জবাব দিলেন। অপরাহ্নে ইষ্টক নির্ম্মাণের কাজ সুরু হইল।

অদ্য বৃহস্পতিবার হইলেও সমস্বরে স্তোত্রাদি পাঠপূর্ব্বক সমবেত উপাসনা হইল না। জন দুই তিন যুবকসহ শ্রীশ্রীবাবা মন্দিরের চত্বরে বসিয়া নীরবে উপাসনা করিলেন।

একটী নববিবাহিত যুবক উপদেশ-প্রার্থী হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

স্ত্রীকে সহ সাধন-পথে চল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিয়ে করেছ ব'লেই নিজেকে হেয় মনে ক'রো না। বিবাহিত জীবনে এমন অনেক কর্ত্তব্য আছে, যা ব্রহ্মচারীর পক্ষে কল্পনাও দোষের। তার জন্যও জীবনকে নিষ্ফল ব'লে জ্ঞান ক'রো না। ভগবানের নামে বিশ্বাস কর আর এই অমূল্য পাথেয় হৃদয়ে বেঁধে নির্ভয়ে সাধন-পথে অগ্রসর হও। সঙ্গে ক'রে তোমার কচি সঙ্গিনীটীকেও নিয়ে নাও।

বিবাহ করিয়াও পবিত্র থাকা যায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিবাহ করেছ ব'লেই যে পশুর জীবন যাপন কত্তে হবে, এ কথা কে বলেছে? বিবাহ ক'রেও পবিত্র থাকা যায়, দেহ-মন-প্রাণ পবিত্র রাখা যায়, যদি সত্যি সত্যি কেউ ঈশ্বর-নিষ্ঠ হয়। ভগবানের দিকে যার অণুক্ষণ দৃষ্টি, গর্ত্তে পড়্‌লেও সে আবার উঠ্‌তে পারে, পা ভাঙ্গলেও সে পুনরায় সুস্থ সবল হ'য়ে দ্বিগুণ বেগে চল্‌তে পারে। ভগবানে বিশ্বাস কর, বাবা, ভগবানে বিশ্বাস কর।

প্রবৃত্তির দাসের সুখ নাই

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কাম-তৃষ্ণার ভিতরে বর্ত্তমান সভ্যতার প্রাণ। সভ্যতা, ভব্যতা, কাব্য, সাহিত্য, রুচি, প্রবৃত্তি সব শুধু কামের মূলে অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠ্‌তে চাচ্ছে। এই ত' তোমাদের প্রধান বিপত্তি? কিন্তু ভয় কি? সভ্যতাকে অস্বীকার কর। সংযত সুন্দর জীবন যাপন কত্তে যদি অসভ্য হ'তে হয়, তাই হও। পবিত্রতা বড়, না সভ্যতা বড়? প্রশান্তি বড, না দুর্ণিবার ইন্দ্রিয়-তাড়নার ক্রীতদাস হ'য়ে এর পা থেকে ওর পায়ে, ওর পা থেকে তার পায়ে বারংবার লাঞ্ছিত হওয়া ভাল? প্রবৃত্তির যে দাস, জগতে তার সুখ কোথায়?

লক্ষ্য ঊর্দ্ধে রাখ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জীবনটাকে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার ঊর্দ্ধে তু'লে ধর। পদস্খলন হয় হোক্, লক্ষ্য ঊর্দ্ধে রাখ। ভ্রমকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ক'রো না, অভ্রান্ত ও সুখময় ভবিষ্যতের আলেখ্যই ধ্যানে জাগিয়ে রাখ। অতীতকে জান্‌বে মৃত, বর্ত্তমানকে ক্ষণস্থায়ী, ভবিষ্যৎকে অনন্তযুগব্যাপী।

রহিমপুর

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৮

তিন দিন ধরিয়া প্রায় নিঃশব্দেই কাজ চলিতেছে। প্রাতে গাঁথুনি, দুপুরে পত্র-লেখা, অপরাহ্ণে ইষ্টক-নির্ম্মাণ ও রাত্রে পত্র-লেখা।

অদ্য রাত্রে আন্দিকুট হইতে যশস্বী ডাক্তার ক্ষেত্রমোহন সাহা আসিয়াছেন। এ অঞ্চলে পল্লীগ্রামে 'বৈষ্ণব-সেবা' ও 'কিশোরী-ভজন' নাম দিয়া ধর্ম্মের আবরণে কদর্য্য ব্যভিচার ও ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণ চলিয়াছে, সেই সকলের কথা কহিয়া ক্ষেত্রবাবু বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কামুক গুরু ও কামুক শিষ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এর দোষ "বৈষ্ণব-সেবার"ও নয়, "কিশোরী ভজনের"ও নয়। দোষ গুরুর আর শিষ্যের। কামুক গুরু শিষ্যকে কামুক করে, কামুক শিষ্য গুরুকে কামুক করে। আর যদি কামুক গুরুর কামুক শিষ্য হয়, তবে ত' সোণায় সোহাগা হ'ল। তখন যদি "বেদান্ত-চর্চ্চা" নাম

দিয়েও কিছু কর, দেখ্‌বে সে ব্যাপারটাও অতি জঘন্য কদর্য্যতায় পূর্ণ হ'য়ে গেছে।

ধর্ম্মের নামে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার প্রতীকারোপায়

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইহার প্রতিকার কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রথম প্রতিকার,—যার-তার কাছে দীক্ষা নেবার প্রবৃত্তিকে প্রবল প্রচারের দ্বারা মন্দীভূত করা। দ্বিতীয় প্রতিকার,—ধর্ম্মের সঙ্গে যে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার আপোষ নেই, সেই মতবাদ ব্যাপকভাবে সমাজের প্রত্যেকটী স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া। তৃতীয় প্রতিকার,—যারা ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার প্রসারিত কচ্ছে, রাজদ্বারে বা সামাজিক দণ্ডে তাদিগকে দণ্ডিত করা। আর সূক্ষ্মতম প্রতিকার হচ্ছে,—আমরা যারা ধর্ম্মের নামে ইন্দ্রিয়-তর্পণকে দোষের ব'লে মত প্রকাশ ক'রে থাকি, তাদের মধ্যেই সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বপ্রযত্নে এমন অটুট পবিত্রতার সৃষ্টি করা, যা প্রলোভনের অতি গোপন পদ-সঞ্চারেও কণামাত্র কলঙ্কিত হয় না ; এবং তারপরে মনে মনে প্রবলভাবে প্রার্থনা করা যে, ব্যভিচারীরা সদাচারী হোক্, মিথ্যাচারীরা সত্যপ্রতিষ্ঠ হোক্, অসংযমী পাপিষ্ঠেরা সংযমী সাধু হোক্, লজ্জাকর কার্য্যানুষ্ঠানকারীরা গৌরবজনক কার্য্যে রুচি-সম্পন্ন হোক্।

রহিমপুর
৩০শে ফাল্গুন, ১৩৩৮

জীব-প্রবাহ

বেলা বারোটার সময় গাঁথুনির কাজ ছাড়িয়া শ্রীশ্রীবাবা গোমতীর জলে স্নান করিতে নামিয়াছেন। গুঞ্জরবাসী এক ভদ্রলোক আসিয়া নদীতীরে বসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে বলিলেন,—নদীর স্রোত যেমন ক'রে অবিরাম ব'য়ে যাচ্ছে, জীব-প্রবাহ ঠিক্ তেমনি চলেছে। তফাৎ এই,—নদীর সব জল এক উৎস থেকে আস্‌ছে, আর জীব-প্রবাহ পথে পথে নিজে থেকে নিজে বেড়ে

যাচ্ছে। নদীর একবিন্দু জল থেকে আর একবিন্দু জল সৃষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু একটি জীব থেকে একটি বা একাধিক জীবের সৃষ্টি হচ্ছে।

অকৃত-বিবাহ ব্যক্তির জীব-সেবার সুবিধা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাঁরা সন্তান-সৃজন নিয়ে ব্যস্ত, তাঁদের চেয়ে নিঃসন্তান গৃহী বা অকৃতবিবাহ ব্যক্তির কাজ করার সুযোগ বেশী। একজন সন্তান-সন্ততির প্রতি কর্ত্তব্য নিয়ে ব্যস্ত, অপরজন নিরঙ্কুশ, স্বাধীন, দু'মুঠো উদরান্ন সংগ্রহের পর ইচ্ছা করলেই অফুরন্ত কাজ কত্তে পারেন।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেবাব্রতী হইতে হইবে

স্নানাহারের পরেও গুঞ্জরবাসী ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন এবং প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রত্যেক লোককেই ব্রত নিতে হবে সেবার। এখন সে সেবা দেশের সেবাই হোক্, সমাজের সেবাই হোক্ কিম্বা জগতের সেবাই হোক্। বিবাহিত হোক্, অবিবাহিত হোক্, সবাইকে সেবাব্রতী হ'তে হবে। স্ত্রী হোক্, পুরুষ হোক্, সকলেরই জীবনের সার্থকতা হবে সেবার যজ্ঞে আত্মাহুতি দানে।

সেবা-বুদ্ধির স্বরূপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সেবার প্রথম কথাই হচ্ছে আত্ম-কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধির লোপ। অহমিকা নিয়ে সেবা হয় না। নিজেকে একটা আদর্শের কাছে সম্পূর্ণ অনুগত ক'রে দিলে তবে মানুষ সেবা কর্ব্বার যোগ্য হয়। সেবকের কার্য্যের মধ্যে ভুল-ত্রুটী অমার্জ্জনীয় নয়, কারণ, নির্ভুল কাজ জগতে ক'টা হ'তে পারে? কিন্তু সেবকের সেবা-বুদ্ধিতে ত্রুটী থাক্‌লে চল্‌তে পারে না।

সেবাবুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সেবাবুদ্ধির প্রথম প্রমাণ হচ্ছে, সেবা-দ্বারা আত্ম-শুদ্ধির অনুভূতি। সেবা করলুম অথচ চিত্তশুদ্ধি এল না,—এমন অবস্থায় বুঝ্‌তে হবে আমার সেবাবুদ্ধি ছিল না।

অভ্যাস ও সেবাবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অভ্যাসের দ্বারা সব করা যায়। দৈনিক যে কর্ত্তব্যগুলি দায়ে ঠেকে কচ্ছ, চেষ্টা কর্ল্লেই তাকে সেবাবুদ্ধিমণ্ডিত ক'রে কত্তে পার। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ব্যবহার সেবা-বুদ্ধির দ্বারা যখন পরিচালিত হয়, তখন তাতে ছিটেফোঁটা কলুষ থেকে গেলেও সামান্য চেষ্টায় তা দূর ক'রে দেওয়া যায়। শিক্ষক ও ছাত্র, প্রভু ও ভৃত্য, রাজা ও প্রজা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সেবাবুদ্ধি নিয়ে যখন চলে, তখন তাদের আচরণে কখনো কখনো রুক্ষতা, রূঢ়তা, দৃঢ়তা পরিব্যক্ত হ'লেও, সেই রূঢ়তার গ্লানি সহজ চেষ্টায় নাশ করা যায়।

সেবাব্রত ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সেবাব্রত আর কর্ত্তব্যপরায়ণতায় কার্য্যতঃ বা বাহ্যতঃ তফাৎ নেই। ভিতরের তফাৎ প্রচুর। সেবায় আমিত্বের দাপট নেই, অহং-বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার না ক'রে কর্ত্তব্য-নির্ণয় চলে না। রজঃপ্রধান ব্যক্তির প্রেরণা কর্ত্তব্যবুদ্ধি, সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তির প্রেরণা সেবাবুদ্ধি। অর্থাৎ কর্ত্তব্যজ্ঞান যেন সোনার পাতে ঢাকা রূপা, আর সেবা যেন সোনার পাতে ঢাকা হীরা।

নিরামিষ ও সাধুত্ব

দ্বিপ্রহরে দুই ঘটিকার সময়ে ইট তৈরীর কাজে লাগা হইল।

একজন কর্ম্মী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেহ নিরামিষ খাইলে তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করা যাইতে পারে কি না।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—গণ্ডারেও ত' নিরামিষ খায়, তাই ব'লে সেকি কম হিংস্র ?

যথার্থ শিক্ষা

সান্ধ্য উপাসনার পরে কামাল্লা হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আসি-লেন। ইনি কুমিল্লাতে ওকালতী করিতেন। সম্প্রতি নিজ গ্রামে একটি হাইস্কুল খুলিয়া তাহার প্রধান শিক্ষকতা করিতেছেন। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন

করিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবৎসাধনার মধ্য দিয়ে জীবনকে পূর্ণ ক'রে তোলার শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজন নয়।

যথার্থ শিক্ষালয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবৎসাধনার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধারণা থাকতে পারে। কিন্তু কামক্রোধকে ভগবানের দোহাই দিয়ে চর্চ্চা না ক'রে যেখানে ভগবৎ প্রেমকেই ভগবানের নামের দোহাই দিয়ে অনুশীলন করা হবে, তাই প্রকৃত শিক্ষালয়। ঈশ্বর-সাধনাকে ভিত্তি ক'রে শিল্প, বিজ্ঞান, রসায়ন, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্র, সঙ্গীত বা সেলাই যাই শিক্ষা দেওয়া হোক্, তাই সার্থক।

ধর্ম্ম-বিপ্লবের যুগে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এমন দিন আস্‌তে পারে, যেদিন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষে বিশ্ববিদ্যালয় জর্জ্জরিত হবে। এমন দিন আস্‌তে পারে, যেদিন ঈশ্বর-বিশ্বাসকে আইনের বলে শাস্তি দেওয়া হবে। এমন দিন আস্‌তে পারে, যেদিন মানবের বুদ্ধি ও মেধা আস্তিক্যের বনিয়াদ উৎখাত কর্ব্বার জন্যই নিজেকে নিঃশেষ করবে। কিন্তু সেইদিনও, সাধকের উপলব্ধ সত্যের শক্তিতে ভগবৎসাধনার উপরেই দাঁড়িয়ে থাক্‌বে পূর্ণ মানবের জড়-বিদ্যা ও চৈতন্য-তত্ত্বের সকল শিক্ষা।

ভগবানকেই জীবনের সার কর

রাত্রি নয় ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত সূর্য্যারায় স্বর্গীয় অমৃত ভৌমিকের বিধবা কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবীর বিশেষ অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবাকে তাঁহার বাড়ী লইয়া গেলেন। অর্দ্ধঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীবাবা সেখানে অবস্থান করিলেন এবং শ্রীযুক্তা জ্ঞানদা দেবীর জিজ্ঞাসানুসারে তাঁহাকে বলিলেন,—অতীত ভবিষ্যৎ মা, সব বিস্মৃত হ'য়ে যাও। ভগবানকেই জীবনের সার ব'লে জানো। তাঁকেই কর স্মরণ, তাঁকেই কর মনন, তাঁরই কর অনুক্ষণ ধ্যান। তাঁকে ভালবাসার মত যে আর সুখ নেই, এই কথা অবিরাম চিন্তা কর। তাঁর

প্রতি যাতে ভালবাসা যায়, তার জন্য তাঁর পায়ে অনুক্ষণ আকুল ক্রন্দন জানাও।

সমগ্র ভারতকে তপোবনে পরিণত কর

৮অমৃত ভৌমিকের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিতেই আশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারী একটী আবশ্যকীয় প্রসঙ্গ তুলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সমগ্র ভারতভূমিকে একটা বিশাল তপোবনে পরিণত কত্তে হবে। প্রত্যেকটা সংসারকে এক একটা আশ্রমে পরিণত কত্তে হবে। আশ্রমের শান্তি, আশ্রমের তৃপ্তি, আশ্রমের নির্ভয় নির্ভরতা, আশ্রমের অনাবিল প্রশান্তি গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠা কত্তে হবে। এই হবে তোমাদের আদর্শ। এর চেয়ে ছোট আকাঙ্ক্ষা তোমরা ক'রো না। ছোট আকাঙ্ক্ষা কত্তে কত্তে মানুষ নিজেও ছোট হয়ে যায়।

আশ্রম-জীবন সংগ্রামেরও জীবন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আশ্রম-জীবন শান্তিরও জীবন, সংগ্রামেরও জীবন। এ সংগ্রাম চিত্তের অশুদ্ধতার সঙ্গে।

প্রত্যেকে আশ্রমী হউক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রত্যেকের মনে এই ধারণা ছড়িয়ে দাও যে তারা আশ্রমী। ব্রহ্মচর্য্য, আর গার্হস্থ্য দুটা আশ্রমেরই মর্য্যাদা সমান, যদি আশ্রমীয় বোধটা অন্তরে থাকে। প্রত্যেকের মনে আশ্রমিত্ব-বোধ জাগিয়ে দাও। যে কোন স্থানে বাস ক'রে প্রত্যেক নরনারী আশ্রমী হোক্।

লক্ষ্য ঠিক রাখ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংসারাশ্রমে নরনারী একত্রে বাস করে, তাতে কি তাদের আশ্রমিত্ব নাশ পেতে পারে, যদি তাদের লক্ষ্য থাকে স্থির? ধ্রুবতারার দিকে দৃষ্টি দিয়ে পথ চল্‌লে কি কখনো দিগ্‌ভ্রম হ'তে পারে? তাদের কাছে এই বাণীই তোমরা বহন ক'রে নিয়ে যাও,—"লক্ষ্য ঠিক্ রাখো।"

দৃষ্টান্তের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একটী দুটী গৃহস্থের জীবন যখন আশ্রমীয় জীবনে পরিণত হবে, তখন তাদের দেখাদেখি আরও কত সুন্দর সুন্দর পবিত্র জীবন স্ফুরিত হয়ে উঠ্‌বে। দৃষ্টান্তের অসীম শক্তি। শেয়ালের সঙ্গে বাস করলে হুক্কা-হুয়া কত্তেই হয়।

শ্রীশ্রীবাবার একটী ভক্তসন্তান কলিকাতায় তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া বহু বৎসর পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া কাছাড়ের একটী সন্তান সস্ত্রীক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন। পুনরায় তাঁহার দৃষ্টান্ত দর্শনে ত্রিপুরার এক দম্পতী ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত পালন আরম্ভ করিয়াছেন।

এইরূপ কয়েকটি ঘটনা বর্ণনার পরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লোকে যা শোনে, তার চেয়ে, যা দেখে, তার দ্বারা বেশী অনুপ্রাণিত হয়।

রহিমপুর

১লা চৈত্র, ১৩৩৮

প্রাতে ছয় ঘটিকায় গাঁথুনির কাজ আরম্ভ হইবার কথা ছিল। কিন্তু কর্ম্মীর অভাবে তাহা সম্ভব বলিয়া মনে না করায় শ্রীশ্রীবাবা এবং একটি অতি শ্রমক্লান্ত ব্রহ্মচারী ইট কাটিতে বসিলেন। আজ শ্রীমান্ জীবনের জ্বর হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ দোল্লাই-নবাবপুর গিয়াছেন।

আদর্শবাদ ও ব্রহ্মচর্য্য

ইট কাটিতে কাটিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আদর্শবাদ আর ব্রহ্মচর্য্য এই দুইটী জিনিষ অধ্যবসায়কে ধ'রে রাখে। সহকর্ম্মীর অভাব দেখে আজ ঘাব্‌ড়ে যেও না।

বেলা বারোটা পর্য্যন্ত নিঃশব্দে কার্য্য চলিল। অপরাহ্নে পুনরায় দুই ঘটিকায় কার্য্যারম্ভ হইল। নবীপুরের উপেন্দ্র পোদ্দার ও অবিনাশ পোদ্দার এই দুইটী মাত্র যুবক অপরাহ্ন চার ঘটিকার সময় কাজে যোগ দিতে আসিলেন। সকল গ্রামেরই যুবকদের মধ্যে কর্ম্মোৎসাহের যেন ভাটা পড়িয়াছে।

রহিমপুর
২রা চৈত্র, ১৩৩৮

শেষরাত্রে বসিয়া ফুলস্কেপ কাগজে শোলার কলম দিয়া নানা রংয়ে শ্রীশ্রীবাবা কতকগুলি মন্ত্রবাণী লিখিলেন। সূর্য্যোদয়ের পরে ইটের কাজ আরম্ভ হইল। আশ্রমের একটি ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবাবার পাশে বসিয়াই ইট কাটিতেছেন।

গুরুবাদ ও অখণ্ডবাদ

কথায় কথায় শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ, যতই কেন নূতন মত আর নূতন পথের তুমি প্রদর্শক হও না, পুরোণো ব্যবস্থার সঙ্গে একটু হ'লেও আপোষ রাখ্‌তে হবে। পুরাতনের প্রভাবকে একেবারে বর্জ্জন করা যায় না। আমি বল্‌ছি,—গুরুবাদ জগতে থাকবে না, থাকবে শুধু অখণ্ডবাদ, অখণ্ড-মন্ত্রকেই তোমরা গুরু ব'লে মান্‌বে, গুরু ব'লে জান্‌বে, অথচ আমি তোমাদের কাছ থেকে নিজের গুরুত্বটাকে সরিয়ে নিতে পাচ্ছি না। কারণ, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি আমাকে সরিয়ে নিলে অখণ্ডবাদ তার প্রতিষ্ঠাভূমিতে দৃঢ় হ'তে পারে না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অথচ অখণ্ডবাদ যখন তোমাদের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে, তখন দীক্ষাদাতারা মন্ত্রের তুল্য হবেন না, হবেন মন্ত্রের অধীন, মন্ত্রের লক্ষ্য হবেন না, হবেন মন্ত্রের সমসাধক, ব্রহ্মদাতা পিতা হবেন না, হবেন একবীর্য্যজাত গুরুভ্রাতা।

গুরুবাদ ও মানুষ-পূজা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরুবাদীর দেশ, ফলে মানুষ-পূজার বাড়াবাড়ি। তিনজন যদি ব'লে থাকেন, ভগবানকে ধ্যান কর, তবে ত্রিশজন বলেছেন যে, মন্ত্রদাতাকে ধ্যান কর। কিন্তু আসলে তোমাকে যে ধ্যান কর্ত্তে হবে, মন্ত্রময় ব্রহ্মের বা ব্রহ্মময় মন্ত্রের! আমি ধ্যান কচ্ছি যাঁর, তোমরাও ধ্যান কর তাঁর। আমাকে ধ্যান ক'রে কি হবে?

বহির্ম্মুখ চীৎকার ও আন্তরিক সাধনা

অপরাহ্নে গ্রাম হইতে দুই তিনটি ছেলে আসিয়া কাজে যোগ দিল।

সূর্য্যাস্ত-প্রাক্কালে কাজ যখন ছাড়িবার সময় হইয়া আসিয়াছে, তখন শ্রীশ্রীবাবা একজনের কথার উত্তরে বলিলেন,—বহির্ম্মুখ চীৎকার আন্তরিক সাধনার দারিদ্র্য-সূচক।

রহিমপুর
৩রা চৈত্র, ১৩৩৮

ধর্ম্মহীন ব্যক্তি

শেষরাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবা পাট-শোলার কলম দিয়া যে মন্ত্রবাণীসমূহ লিখিলেন, তাহার একটিতে লেখা হইল,—ধর্ম্মহীন ব্যক্তি আর পত্রহীন বৃক্ষ সমান শ্রীহীন।

বাহির দেখিয়া কাজের বিচার

মধ্যে অনেকদিন পর্য্যন্ত আশ্রমের কাজে কোনও শ্রমজীবী ছিল না। কালাগাজী নিজের কাজে বাড়ীতেই ব্যস্ত। আশ্রম-বিরোধী প্রচার-কার্য্যের ফলে এখনও কোনও মুসলমান শ্রমজীবী আশ্রমের কাজে আসিতে সম্মত নহে। হিন্দু শ্রমজীবী এ অঞ্চলে নাই—কিন্তু অন্য একটি মুসলমান শ্রমিক এক মাসের চুক্তিতে আশ্রমের কাজে আসিয়া লাগিয়াছে।

কাদা ছানিবার জন্য শ্রীশ্রীবাবা মজুরটির সহিত কাজে লাগিয়া গেলেন এবং হাসিতে হাসিতে পার্শ্ববর্ত্তী ব্রহ্মচারীকে বলিলেন,—আমি যা কচ্ছি, এ'ত মজুরের কাজ, কয়েক আনা পয়সা দিলেই লোককে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায়। একথার যখন বিচার হবে, তখন ভবিষ্যতের লোক আমাকে একটা কুলী ছাড়া আর কিছু বল্‌বে না।

ব্রহ্মচারী বলিলেন,—কুলীর মন প'ড়ে থাকে তার মজুরীতে, কিন্তু আপনার মন প'ড়ে আছে কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমার আচরণের যিনি বিচার কত্তে বস্‌বেন, তিনি কি ক'রে জান্‌বেন, যে আমার মনে কি ছিল?

ব্রহ্মচারী বলিলেন,—এ যদি দেখ্‌বার ক্ষমতা না থাকে, তবে সে ব্যক্তির বিচার কত্তে বসার অধিকারই নেই। বাইরে থেকে দেখেই কি কাজের মূল্য নির্ণয় হবে?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিলেন এবং নিজ কাজে মনোনিবেশ করিলেন।

স্বর্গের কথা

ইট কাটিবার জন্য তৈরী কাদা ছিল না, সুতরাং—অপরাহ্নে আর ইট না কাটিয়া শ্রীশ্রীবাবা গাঁথুনিতে হাত দিলেন।

সূর্য্যাস্তের কিছু আগে নবীপুরের শ্রীযুক্ত গুরুচরণ পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন পোদ্দার আসিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

কাজ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্বর্গের কথা সবাই বলে, কিন্তু স্বর্গে যাবার জন্য চেষ্টা করে কয়জন? দুনিয়ার যত নোংরা কাজ, পাপকথা আর ইতর আসক্তি নিয়ে জড়িয়ে প'ড়ে থাকব, আর রোজ তিনবার ক'রে স্বর্গে যাব, এসব ত' বড়ই অদ্ভুত! রাবণ রাজা স্বর্গে যাবার সিঁড়ি তৈরী কত্তে চেয়েছিলেন। কিন্তু নারীহরণ প্রভৃতি পবিত্র কার্য্যগুলি ফেলে রেখে ত' আর আগেই স্বর্গের সিঁড়িতে হাত দেওয়া যায় না! ফলে আর স্বর্গের সিঁড়ি হ'ল না,— মরণকালে অনুতাপ নিয়ে রাবণ দেহত্যাগ কর্ল্লেন। আমাদেরও তাই। মুখে স্বর্গ কামনা করি, কিন্তু সারাদিন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরি, ফাঁকিবাজি ও ফন্দীবাজি নিয়ে কাটবে, আর ঘুমুবার সময়ে বড় আশা ক'রে নিদ্রিত হব যে স্বর্গ আমার সুনিশ্চিত। অবাক কাণ্ড!

দয়া, স্নেহ, প্রীতি ও মমতাই স্বর্গ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জানেন পণ্ডিত মশাই, আপনি যখন স্বর্গে যাবেন, তার অনেক আগেই স্বর্গ নিজে থেকে আপনার হৃদয়ে এসে স্থান নেবে। দয়ারূপে, মমতারূপে, স্নেহরূপে, সর্ব্বজীবে প্রীতিরূপে স্বর্গ এসে আপনার প্রাণে প্রতিষ্ঠা পাবে।

রহিমপুর

৪ঠা চৈত্র, ১৩৩৮

গতকল্যকার অতিরিক্ত শ্রমবশতঃ অদ্য শারীরিক বিশ্রাম গ্রহণ করা হইল। ধ্যানজপে অধিক সময় অতিবাহিত হইল।

অদ্য শ্রীমান্ উমাকান্ত সাহা আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, মুরাদনগর হাইস্কুলের হেড মাষ্টার আদেশ দিয়াছেন, আশ্রমের লিখিত মন্ত্রবাণী স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিক্রয় করা চলিবে না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিস্ময়ের কথা!

উমাকান্ত বলিলেন,—বর্ত্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এত প্রাধান্য যে, হেডমাষ্টার চাক্‌রী যাবার ভয়ে এসব যুক্তিহীন আদেশ দিচ্ছেন। বর্ত্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক উৎপাতের ভয়েই আপনার প্রতি কোন সহানুভূতি প্রকাশ কত্তে অনেকে সাহস পান না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সে কথা ভাল। কিন্তু স্কুলের সীমার বাইরে মন্ত্রবাণী বিক্রয়ের অধিকার তোমার আছে। সুতরাং বাইরে বিক্রয় কত্তে কুণ্ঠিত হয়ো না।

উমাকান্ত স্কুলের সীমার বাহিরেই মন্ত্রবাণী বিক্রয়ে সম্মত হইলেন।

পরের জন্য কাষ্ঠাহরণ

শ্রীযুক্ত সূর্য্যরায় আশ্রমের সকল কাজে প্রাণ দিয়া খাটিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবা কোথাও ভ্রমণে গেলে সংসারের সকল কাজ ফেলিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। কিন্তু এদিকে আশ্রমে অর্থের এত অধিক প্রয়োজন যে, সূর্য্য-বাবুকে তজ্জন্য ধার করিতে হইতেছে। আয় নাই বলিয়া শ্রীশ্রীবাবা সূর্য্যবাবুকে ধারশোধের টাকা দিতে পারিতেছেন না। ইট পুড়িবার কয়লা খরিদের জন্য পনের দিনের চেষ্টায় ৪০৲ চল্লিশ টাকা ধার করা হইয়াছে। পুকুরের পাঁক তুলিবার জন্যও কিছু ধার করিতে হইয়াছে। তিনদিন যাবৎ আশ্রমবাসীরা প্রাতে কোনও জলযোগ করেন না, কিন্তু পরিশ্রম অবিরাম চলিয়াছে। পাওনাদারেরা আসিয়া সন্ধ্যার সময়ে সবাই সূর্য্যরায়কে ঘিরিয়া ধরিল। সূর্য্যরায় বলিলেন,—তোমরা সবাই আমাকে কাম্‌ড়ে খেয়ে ফেল।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—পরের জন্য কাষ্ঠাহরণ ক'রতে গেলে নবকুমারের মতই অবস্থা হয়।

তৎপরে সকলে সমবেত উপাসনায় বসিলেন।

রহিমপুর
৬ই চৈত্র, ১৩৩৮

তাসখেলা ও ধূমপান

অদ্য প্রাতে রহিমপুর এবং নবীপুরের যুবকেরা সকলে সমবেত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল,—কেহ আজ হইতে আর তাস খেলিবে না বা ধূম পান করিবে না।

ইহাতে শ্রীশ্রীবাবা কত যে প্রীত হইলেন, তাহা বলিবার নহে।

যুবকেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেই শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—রুদ্রাক্ষবাড়ী হরিষ সাধুর আশ্রমে একবার গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরে এসে সংবাদ-পত্রে পাঠ কর্‌লাম, আমার আগমনকে স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় যুবকেরা ধূমপান আর তাসখেলা ত্যাগ করেছে। সে সংবাদ পাঠ ক'রে যেমন সুখী হয়েছিলাম, আজ তোমাদের সঙ্কল্প শ্রবণ ক'রেও তেমনি সুখী হয়েছি। কিন্তু বাবা প্রতিজ্ঞা যেমন করেছ, তেমন তা আবার রাখা চাই।

এগার ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা কোম্পানীগঞ্জ গেলেন এবং বেলা একটার সময়ে কুমিল্লা পৌঁছিলেন। সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরীর কয়লার গুদামে জিনিষ-পত্র রাখিয়া শ্রীশ্রীবাবা কান্দিরপাড় হরিমোহন পোদ্দারেরভবনে গমন করিলেন।

মধুর মতন মিষ্টি হও

শ্রীশ্রীবাবাকে দেখিয়াই সুরেশ, বিধূভূষণ ও ললিত পোদ্দার আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। ললিত পোদ্দার বলিলেন,—লোমশ বুকের স্পর্শ বড় মিষ্টি। শ্রীশ্রীবাবা ললিতকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেবল আমার বুক নয়, ব্রহ্মাণ্ডের সকলের বুকের স্পর্শই মধুর। কারণ, মধু কারো বুকে নেই, মধু তোর নিজের মনে। নিজে মধুর মতন মিষ্টি হও, দেখ্‌বে ব্রহ্মণ্ডটাই মিষ্টি হ'য়ে গেছে।

স্বদেশকে ভালবাসা

বিকাল পাঁচটার গাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবা লাকসাম রওনা হইলেন। মুরাদনগরের

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালীমোহন চক্রবর্ত্তীও এই ট্রেণেই লালমাই যাইতেছেন। কালীমোহন বাবুর সহিত আলাপ হইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্বদেশকে ভালবাসা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু আসল স্বদেশ যে কোথায়, তাও ভুল্‌লে চল্‌বে না।

ওঁ মধু

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীবাবা লাকসাম পৌছিলেন। লাকসাম হাইস্কুলের হেড-মাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীশ্রীবাবাকে দর্শন মাত্রেই বলিতে লাগিলেন,—ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—মধুই মধুর উৎপত্তিস্থল, মধুতেই মধু বর্দ্ধিত হয়, মধুতেই মধু আত্ম-নিমজ্জন করে, নিখিল বিশ্ব মধুরই প্রকাশ।

প্রলোভন হইতে দূরে থাক

লাকসামের যুবকদের মধ্যে শ্রীযুক্তকৃষ্ণবন্ধু গোস্বামীই শ্রীশ্রীবাবার ভাবগুলিকে যেন শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে বলিলেন,—যুবকদিগকে প্রলোভন থেকে রক্ষা কর্। ভাল হ'তে চেষ্টা কর্ব্ব, অথচ প্রলোভনের সাম্‌নে দৌড়ে যাব, এ দুটী অবস্থা একসঙ্গে বেশীক্ষণ খাপ খায় না। আত্মগঠন কর্ব্বে যে, লোভের বস্তু থেকে তাকে, অন্ততঃ প্রথম সময়ে ত' নিশ্চিতই, দূরে থাক্‌তেই হবে। ইচ্ছা ক'রে আগুনে হাত দিব, আর, চীৎকার ক'রে প্রার্থনা কর্ব্ব—"হে ভগবান্, জ্বালা যেন না সইতে হয়,"—এ অত্যন্ত বিপজ্জনক বুদ্ধি। প্রাণপণ যত্নে প্রলোভন থেকে দূরে থাক্‌বে, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্ব্বে,—"হে ভগবান্, এমন শক্তি দাও, যেন অনিচ্ছায় কখনো প্রলোভনের সাম্‌নে প'ড়ে গেলে স্খলিতপদ না হই, সঙ্কল্পচ্যুত না হই, বলহীন, বীর্য্যহীন, ক্লীব ব'লে প্রমাণিত না হই।" ইচ্ছা ক'রে, চেষ্টা ক'রে, যত্ন ক'রে গরল খাব, আর ভগবানকে বল্‌ব,—"দেখো ঠাকুর, প্রাণটা যেন না যায়,"—এসব কোনো কাজের বুদ্ধিই নয়।

আত্মশ্রদ্ধা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আত্মশ্রদ্ধা জাগাতে পার্‌লে, লোভের বস্তুতেও দৃক্‌পাত

করার প্রবৃত্তি কমে যায়। "এই যে আমি একটা ভোগের জিনিষের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এতে কি আমার আত্মমর্য্যাদা রক্ষিত হচ্ছে ? না, ক্ষয়িত হচ্ছে ?"—এইরূপ বিচার সহজে লুব্ধতাকে কমিয়ে দেয়। "আমি মানুষ, সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ, দেবতারাও ভগবানকে পাবার জন্য যে তনু আশ্রয় করেন ব'লে কথিত হয়, সেই সুদুর্ল্লভ তনু আমি পেয়েছি,—আমি কি আমার মানব-মর্য্যাদা পশুত্বের পদতলে বিকিয়ে দেব ?"—এই প্রশ্ন বারংবার মনে জাগ্‌তে থাক্‌লে লুব্ধতা লজ্জিত হ'য়ে মুখের উপরে অবগুণ্ঠন টানে। সুতরাং প্রাণপণে চেষ্টা কর, যাতে প্রত্যেক যুবকের ভিতরে আত্মশ্রদ্ধার উন্মেষ হয়। আত্মশ্রদ্ধা যার যত বেশী, পাপের সম্ভাবনা তার তত কম। আত্মশ্রদ্ধী পাপকে ঘৃণা করে, অনাত্মশ্রদ্ধী পাপে গৌরব বোধ করে। আত্মশ্রদ্ধী পাপ থেকে দূরে সরে, অনাত্মশ্রদ্ধী পাপের সঙ্গ সুখপ্রদ জ্ঞান করে।

পবিত্রতার আদর্শের প্রসার সাধন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পবিত্রতার আদর্শকে সকলের চখের সাম্‌নে এনে দেদীপ্যমান ক'রে ধর। কে কোথায় কদর্য্য কার্য্য করেছে, তার আলোচনাকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে কে কোথায় নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের বিমল প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত করেছে, তার আলোচনাকে স্রোতঃশালিনী কর।

রাত্রি দুই ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা মেইল ট্রেণ ধরিলেন। এই সময়টুকু আর নিদ্রার অবসর হইল না। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধুর সহিত সদালোচনায় কাটিয়া গেল। কৃষ্ণবন্ধু এই সময়ে লাকসাম স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর (নবম মানের) ছাত্র।

কলিকাতা

৮ই চৈত্র, ১৩৩৮

গার্হস্থ্যাশ্রম ও আশ্রম-জীবন

গতকল্য রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতা পৌছিয়াছেন। কালীঘাট অঞ্চলে একটী ভক্তের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ভক্তের একটী জরুরী টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি এখানে আসিয়াছেন।

ভক্ত প্রকাশ করিলেন যে তিনি সস্ত্রীক পুপুন্‌কী আশ্রমে যোগদান করিবেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গার্হস্থ্যাশ্রমও আশ্রম। সুতরাং আশ্রম-জীবন যাপ-নের জন্য তোমাকে সংসার ছেড়ে যেতে হবে কেন বাবা? এমন অনেক প্রতিভাবান্ সাধক জগতে রয়েছেন, যাঁরা সংসারে অবস্থান ক'রেও নিত্যানন্দের আস্বাদন অনুক্ষণ পাচ্ছেন।

তীর্থ-দর্শনাদির সার্থকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য সংসারের সহস্র সীমাবদ্ধতার কথা একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। সংসারের অসংখ্য জটিলতা সংসারকে অতি মারাত্মক স্থান ক'রে রেখেছে। কিন্তু সংসারের তিক্ততার জোর কমিয়ে দেবার জন্যই আবার তীর্থ-দর্শনের ব্যবস্থাও রয়েছে। মাঝে মাঝে নিজেকে সংসারাতীত সত্তা ব'লে জ্ঞান ক'রে বাইরে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া কর্ত্তব্য এবং সাধুসঙ্গ, সজ্জন-সঙ্গতি, সদালাপ ও হিতকর চিন্তনের দ্বারা বল-সঞ্চয়ের প্রয়োজন।

তীর্থ কাহাকে বলে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু তীর্থ বল্‌বে কাকে? যার তীর্থ-খ্যাতির সুযোগ নিয়ে শত শত তীর্থকাক শুধু দেহি দেহি রব তুলে মেদিনী কাঁপাচ্ছে, ফলে মনের তৃপ্তি, শান্তি আর আত্মপ্রসাদ সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে নূতনতর তিক্ততা আর কটুতা চিত্তের রিক্ত ভাণ্ডারে এসে জম্‌ছে, তাকেই তীর্থ ব'লে মনে ক'রো না। কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা আর দ্বারকা সবই এক সময়ে ঋষিদের আশ্রম-কুটীর ছিল। সেই আশ্রম-কুটীরগুলিই ছিল প্রকৃত তীর্থ এবং সেই আশ্রমকুটীরগুলিতেই মিল্‌ত, শান্তি, তৃপ্তি, আনন্দ ও প্রসন্নতা। সুতরাং প্রয়োজন-ক্ষেত্রে কাশী-বৃন্দাবনের পাণ্ডা-নির্য্যাতিত তীর্থযাত্রী হওয়ার চেয়ে, শান্ত অনাবিল পবিত্রতার নিবাসভূমি সাধকদের আশ্রম-কুটীরগুলিতে তীর্থযাত্রী হওয়া অধিকতর শ্লাঘনীয় মনে কর্ব্বে।

কলিকাতা
৯ই চৈত্র, ১৩৩৮

জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা

ভক্তপত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন,—জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেহ, মন, প্রাণ, শক্তি, ইচ্ছা ও কৃতিত্ব সব-কিছু প্রেমস্বরূপ পরমাত্মার ইচ্ছার অধীন ক'রে দেওয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

কলিকাতা
১০ই চৈত্র, ১৩৩৮

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা কৈলাস-বসু ষ্ট্রীটে আসিয়াছেন। দলে দলে যুবকেরা শ্রীশ্রীবাবার চরণদর্শন মানসে আসিতেছেন। কেহ রোগের কথা, কেহ শোকের কথা, কেহ দুঃখের কথা, কেহ উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছেন।

জীবন মূল্যবান্

মেদিনীপুর জেলা নিবাসী একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জীবনকে মূল্যবান্ ব'লে মনে ক'রো, আবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসও রেখো যে, জীবনের মালিক হচ্ছেন ভগবান্,—জীবন তোমার ব্যবহারের জন্য, কিন্তু তুমি এর মালিক নও। জীবন যখন মূল্যবান্, তখন তোমাকে এর প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার কত্তে হবে, একে নীচতা থেকে বাঁচিয়ে এবং মহৎ কর্ম্মে নিয়োজিত ক'রে, কিন্তু জীবনের মালিক যখন ভগবান্, তখন, যে কোনো সময় তাঁর ইচ্ছা, তিনি একে নিয়ে যান্, তার জন্য তুমি প্রস্তুত থাক।

ভগবদ্বিশ্বাসের প্রমাণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবদ্বিশ্বাসের প্রমাণ কি জানো? যে কোনও সময় মর্‌বার জন্য তৈরী থাকা।

সকল সম্প্রদায় তোমার

বিক্রমপুর-নিবাসী একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতে শতশত সম্প্রদায় থাক্‌বেই। হয়ত চুলচেরা মত-পার্থক্যের জন্য একটা সম্প্রদায় আবার পাঁচটা ভাগ হ'য়ে যাবে। কিন্তু এর জন্য ভাব্‌না করা বৃথা। তোমরা অন্তরে আস্থা রাখ যে, সাম্প্রদায়িক আচার ও বিচার যেখানে যতই পৃথক্ হোক্, জগতের সকল সম্প্রদায় তোমাদের, তোমরা সকল সম্প্রদায়ের।

অসাম্প্রদায়িকতার অর্থ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—"সকল সম্প্রদায় তোমার",—এই কথার মানে কি এই যে, বকরঈদের দিন মুসলমানের সঙ্গে গিয়ে মাংস-প্রসাদ নেবে, বড়দিন উপলক্ষে খ্রীষ্টানের সঙ্গে গিয়ে সুরা-প্রসাদ নেবে, শ্যামাপূজার দিন বামাচারীর সঙ্গে পঞ্চ-মকার কর্ব্বে, আর ঝুলন-যাত্রার দিন নেড়ানেড়ীর সঙ্গে কদাচার কর্ব্বে। না, তা নয়। সকল সম্প্রদায় তোমার, একথার মানে, যে যে-ভাবে ভগবানের উপাসনা করুক, তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পথে চলুক, আর নিকৃষ্ট পথে চলুক, তার প্রতি তুমি হবে নির্ব্বিদ্বেষ প্রেমশীল, তার প্রতি তুমি হবে মরমী, দরদী। তার দুঃখকে তার হৃদয় দিয়ে, তার ব্যথাকে তার মন দিয়ে, তার উদ্বেগকে তার চিত্ত দিয়ে, তার বিঘ্নকে তার প্রাণ দিয়ে তুমি অনুভব কত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। "সকল সম্প্রদায় তোমার",—মানে তুমি একেবারে অসাম্প্রদায়িক। সামাজিক শৃঙ্খলা বা সাধন-সৌকার্য্যের দায়ে তুমি হয়ত একটা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পার, কিন্তু নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি কর্ত্তব্যপালন-কালেও লক্ষ্য তোমার থাক্‌বে যে, সকল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত লোকেরাই তোমার আপন, ত্রিজগতে একটী প্রাণীও তোমার পর নেই।

সম্প্রদায় কি জগৎ হইতে উঠিয়া যাইবে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য, একথা স্বীকার্য্য যে, জগৎ থেকে সম্প্রদায়-পার্থক্য কখনও লোপ পাবে না। যাঁরা বলবেন, আমরা অসাম্প্রদায়িক, তাঁরাই হয়ত আবার একটা পৃথক্ সম্প্রদায় গ'ড়ে বস্‌বেন এবং এঁদের সাম্প্রদায়িকতার অত্যাচারেই হয়ত ধরণী পুনরায় প্রতপ্তা হবেন। ব্যক্তি-চেতনাও যেমন মানুষের স্বাভাবিক, একটা সাধারণ মঞ্চে ব্যক্তি-চেতনাকে আংশিক বলি দিয়ে সার্ব্বজনীন ভাবে একটী সঙ্ঘচেতনাকে অনুশীলন করাও মানুষের পক্ষে তেমন স্বাভাবিক। এই সঙ্ঘচেতনা যখন ধর্ম্মবুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে জাগে, তখনই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। সঙ্ঘও স্বাভাবিক, ধর্ম্মও স্বাভাবিক। অতএব দুইটীর সংমিশ্রণে সঞ্জাত সম্প্রদায়ও স্বাভাবিক।

সম্প্রদায়-বোধ ও সাম্প্রদায়িকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু সম্প্রদায় আছে ব'লেই যে তোমাকে সাম্প্রদায়িক

হ'তে হবে, এর কি কোনও মানে আছে? সম্প্রদায় থাক্‌লে সম্প্রদায়ের প্রতি কর্ত্তব্য-বোধও থাকে। এর নাম সাম্প্রদায়িকতা নয়। নিজে একটা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত আছ ব'লেই যদি অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ আসে, তবে তাকেই বল্‌ব সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতা স্বাদেশিকতার বিরোধী, বিশ্বভ্রাতৃত্বের বিরোধী এবং প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মধর্ম্মেরও বিরোধী। আর সম্প্রদায়-বোধ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে ত্যাগবুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়ে পরোক্ষভাবে দেশ-কল্যাণ ও জগৎকল্যাণ সাধন করিয়ে নেয়। সুতরাং সভ্যজগতে সম্প্রদায়-বোধের স্থান আছে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। সাম্প্রদায়িকতা আর বর্ব্বরতা একই কথা।

কলিকাতা
১১ই চৈত্র, ১৩৩৮

প্রেমের জাল

অদ্যও বহু যুবক কৈলাসবসু ষ্ট্রীটে ভীড় করিয়াছেন। সকলেই কথা শুনিতে চাহেন। শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—জেলেরা বোনে সূতোর জাল, মাছ ধরবার জন্যে। কেউ বোনে কথার জাল, লোক ধরবার জন্যে। আমি কিন্তু তোদের প্রেমের জালে ধরতে চাই, কথায় আমার আস্থা নেই।

নাম ও প্রেম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রেমের জালের সূতো হ'ল ভগবানের নাম। নাম যে যত বেশী জপে, প্রেম তার তত বেশী বাড়ে। কৌশলে নয়, ফন্দীতে নয়, অবিচ্ছিন্ন নামের সেবায় প্রাণের মাঝে প্রেম জাগে।

কলিকাতা
১২ই চৈত্র, ১৩৩৮

বালকের সংসার-ত্যাগ

অদ্য একটী বালক আসিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে জোর করিয়া ধরিল যে, সে সংসার ত্যাগ করিবে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংসার ত' বাবা ত্যাগ ক'রে যাবে, কিন্তু সংসার যদি তোমাকে ত্যাগ না করে ?

বালক।—মানে ?

শ্রীশ্রীবাবা।—মানে, যদি সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে যাও, আর তারপর ভোগ-লালসা তোমাকে চেপে ধরে ? তখন কি কর্ব্বে ? তখন কি আবার কৌপীন ছেড়ে লম্বা কাপড় পড়া সুরু ক'রে দেবে ? হঠাৎ কোনও কাজ ক'রো না বাবা। সংসারে থেকেই অবিরাম ভগবানের নাম জপ কর। নামের গুণে চিত্ত শুদ্ধ হোক্, নামের গুণে পূর্ব্বসংস্কার ক্ষয় পাক্, দুর্ব্বলতার নাশ হোক্, স্বচ্ছ-প্রজ্ঞার আবির্ভাব হোক্, তারপরে একদিন "হরি ওঁ" ব'লে বেরিয়ে পড়্বে।

কলিকাতা

১৩ই চৈত্র, ১৩৩৮

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবা কৈলাসবসু ষ্ট্রীট হইতে পদব্রজে কালীঘাটের দিকে রওনা হইলেন। শ্রীযুক্ত দি—সঙ্গ লইলেন। দি—সম্প্রতি আই-এ পাশ করিয়া চাকুরী খুঁজিতেছেন। তিনি তাহার ব্যক্তিগত জীবনের কতকগুলি প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীবাবা পথ চলিতে চলিতে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন।

নারীরা প্রেমের অধীন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ইন্দ্রিয়ের সুখ সম্পাদন ক'রে ক'রে কোনও স্বামী তাঁর স্ত্রীকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পার্বে, এ অতি অসম্ভব কল্পনা। কামের অনলে ভোগের আহুতি যত দিবে, আগুন ততই শতশিখায় বেড়ে উঠ্বে। প্রেম দিয়েই স্ত্রীকে অনুগত কত্তে হয়। স্ত্রীকে ভালবাস। এমন ভালবাসা দাও, যা তাকে ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। ভগবান্ যেমন প্রেমের অধীন, নারীজাতিও তেমন প্রেমের অধীন,—ভোগের অধীন নয়।

কলিকাতা

১৪ই চৈত্র, ১৩৩৮

দেহ সুস্থ রাখার আবশ্যকতা

কালীঘাটে অদ্য শ্রীশ্রীবাবা একটী ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী কিশোরী সধবাকে

কতকগুলি যৌগিক ব্যায়াম প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে বলিলেন,—দেহকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই কর্ত্তব্য। কারণ, এই দেহ দিয়ে ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধন কত্তে হবে, এই দেহ দিয়ে তাঁকে ডাক্‌তে হবে। শরীরকে পাঞ্চভৌতিক অনিত্য বস্তু ব'লে অবজ্ঞা ক'রো না। অনিত্যকে কাজে খাটিয়ে নিত্যকে লাভ কত্তে হবে।

কলিকাতা
১৫ই চৈত্র, ১৩৩৮

নামই গুরু

একজন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেন বাবা মানুষকে গুরু ব'লে মনে ক'রে এত কষ্ট পাচ্ছ। ভগবানের অমৃতময় নামই তোমার গুরু। এই নাম আর ভগবান একই বস্তু। এই জ্ঞান ক'রে অনুক্ষণ নামের সেবা কর। "গুরু" "গুরু" ব'লে মানুষ-পূজা ক'রে যথেষ্ট ঠকেছ। এখন "গুরু" "গুরু" ব'লে নামের পূজা ক'রে জীবন সার্থক কর। নিত্য বস্তু নাম, নিত্য সত্য নাম, নিত্য গুরু নাম। নামকেই জীবনের সার কর।

কলিকাতা
১৬ই চৈত্র, ১৩৩৮

কয়েকদিন ধরিয়া শ্রীশ্রীবাবার খুব ছুটাছুটিতে আর কথা-বার্ত্তায় কাটিয়াছে। আজ তিনি লোকের ভিড় অগ্রাহ্য করিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন।

নারী কি নরকের দ্বার?

ত্রিপুরা-নবীপুর নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"কল্যাণীয়েষু ঃ—

"সবাই বলিছে, নারী প্রলোভন,
নারী নরকের দ্বার,
নারীই এনেছে যত যন্ত্রণা,
সংসারে ছারখার;

"নারীই শুষিছে নরের রক্ত,
"নারীই হরিছে আয়ু,
চর্ব্বণ করে অস্থি-মাংস,
কর্ত্তিত করে স্নায়ু,
নারী রাক্ষসী, রক্ত-পিপাসু,
পিশাচী, সর্ব্বনাশী,
মৃত্যুর শ্বাস বহিছে নিয়ত
নারীর বক্র হাসি।

"আমার চক্ষু দেখিছে তাহারে
অপর দৃষ্টি দিয়া,
আমি যেন দেখি জগজ্জননী
গেছে তারে পরশিয়া,
তার চোখে মোর জননীর চোখ,
তার মুখে মোর জনননীর মুখ,
তার বুকে মোর জননীর বুক
স্তন্য-পীযূষ নিয়া
ভক্তি-বিভোর করিছে আমার
স্নেহ-নন্দিত হিয়া।

"চোখের দৃষ্টি আমার মতন
তোমারো হোক্ না আজ,
রমণী—জননী, নহে নারকিণী,
কহিতে কি আছে লাজ ?

ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ"

বিবাহিত জীবন পশুর জীবন নয়

উক্ত যুবকের নব-বিবাহিতা পত্নীকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

"স্নেহের মা, পাগলা ছেলে তার ছোট্ট মাটিকে আর চিঠি না লিখে পারল না।

"তোকে কিন্তু মা আমার মায়ের যোগ্যা হতে হবে। তোকে পবিত্রতার বল সঞ্চয় কত্তে হবে, তোকে তপস্যার শক্তি লাভ কত্তে হবে। তোকে সাধনের পথে অগ্রসর হতে হবে। তোর ভিতরে আগ্রহ, অনুরাগ, আবেগ ও রুচির সৃষ্টি হওয়া দরকার।

"যে স্ত্রীর সত্য সত্যই পবিত্রতা লাভ কর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা প্রবল, তার জন্য পরিশ্রম স্বীকার কত্তে তপস্বী স্বামীর কত আনন্দ! যে স্ত্রী নিজের জীবনটাকে সত্যই গ'ড়ে তুলতে চায়, তার জন্য শ্রম স্বীকারে তার স্বামী নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হবেন না। তুই মা সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে নিজেকে গ'ড়ে তোল্‌বার জন্য প্রস্তুত হ।

"বিবাহিত জীবন একটা পশুর জীবন নয়। পশুরা যেমন ভাবে বিচার-বিবেচনা-হীন উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করে, তেমনি ক'রে ইন্দ্রিয়ের দাস হ'য়ে লালসার দাস হ'য়ে কাটাবার জন্য দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম পাও নাই, মা। স্বামী তার স্ত্রীকে দিনের পর দিন মঙ্গলের পথে উৎসাহিত কর্ব্বে, তারই জন্য বিবাহিত জীবন। পূতিগন্ধময় কদর্য্য জীবন-যাপন করার জন্য মা তোমরা বিবাহিত হও নাই। ইন্দ্রিয়ের সেবায় নিজেদের সকল শক্তি নিঃশেষ ক'রে দেবার জন্যই তোমরা বিবাহিত হও নাই। সহস্র কুচিন্তা ও কুপথ থেকে মনকে ফিরিয়ে এনে, সহস্র কুকার্য্য ও কদভ্যাস হ'তে দেহটাকে মুক্ত ক'রে একজন আর একজনকে দিব্য-ভালবাসায় আবৃত ক'রে রাখ্‌বে, তারই জন্য তোমাদের এই আনন্দময় মিলন। বিধাতা তোমাদের দুজনকে দুই দেশ থেকে এনে একত্র ক'রে দিয়াছেন, বিষ্ঠার কৃমির ন্যায় ন্যক্কারজনক কাম-কূপের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে মর্ব্বার জন্য নয়, পরন্তু একজন আর একজনের প্রাণকে পবিত্রতম প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ ক'রে একসাথে ঈশ্বর লাভ করার জন্য।

"তুমি মা তোমার ঈশ্বর-পরায়ণতা দিয়ে তোমার স্বামীর ঈশ্বর-পরায়ণতাকে বর্দ্ধিত কর। তুমি মা তোমার পবিত্রতা দিয়ে তোমার স্বামীর পবিত্রতাকে পরিপুষ্ট কর। তুমি মা তোমার সংযমের দৃঢ়তা দিয়ে তোমার স্বামীর সংযমকে প্রবলতর কর। তুমি মা তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিয়ে তোমার স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আকাশস্পর্শী ক'রে তোল।

"সব সময় ভাব্‌বে, তোমার মধ্যে মহাশক্তি জগজ্জননী তাঁর সব শক্তি নিয়ে বাস কচ্ছেন। সব সময় মনে রাখ্‌বে, তোমার মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি রয়েছে। নিজেকে ছোট ভাবিস্ না মা, নিজেকে হেয় ভাবিস্ না মা, অন্যান্য রমণীরা নিজদিগকে যেমন তুচ্ছ ও নগণ্য ব'লে মনে করে, তুই নিজেকে তা করিস্-না। তুই নিজেকে সকল সাংসারিক নীচতার ঊর্দ্ধে স্থাপন কর্, নিজেকে ইন্দ্রিয় জয়ী মহাপুরুষ ব'লে জান্, নিজের জীবনে অনমনীয় আত্ম-সংযমকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে আমার ন্যায় সহস্রকোটি সন্তানের পূজা-পুষ্পাঞ্জলীর যোগ্য হ'য়ে ওঠ্ মা।

ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ"

দাম্পত্য-জীবনে পবিত্রতা ও মৃতবৎসা-দোষ নিবারণ

নবীপুর গ্রামেরই অপর একটী সধবা রমণীকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"স্নেহাস্পদাসু :—

"স্নেহের মা—, * * * মায়ের জাতি হ'য়ে, তোরা জন্মেছিস্, মা হওয়ার চেয়ে বড় গৌরব তোদের জীবনে আর কিছুই নেই। পিতার সহস্র স্নেহের অধিকারিণী হ'য়েও তোদের প্রাণের আশা মেটে না। স্বামীর সকল সোহাগের অধিকারিণী হ'য়েও তোদের প্রাণের সাধ মেটে না। সন্তানের জননী হ'য়ে, সন্তানকে বুকে ধ'রে, সন্তানকে ভালবেসে তোদের যে আনন্দ, সন্তানের হাসিমুখের দিকে স্নেহোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে তোদের যে তৃপ্তি, ত্রিভুবনে তার তুলনা নেই।

"কিন্তু মা, যা-তা বল্‌তে চাচ্ছি ব'লে তুই তোর এই পাগ্‌লা ছেলেকে ক্ষমা

করিস্,—সন্তান-লাভের লোভ তোদের জীবনকে বড় তরুণ বয়সে, বড়ই অকালে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার দিকে নিয়ে ঠেলে দিচ্ছে। তোরা মা হিতাহিত-বুদ্ধি-বর্জ্জিত হ'য়ে, দিগ্বিদিগ্-জ্ঞান হারিয়ে অন্ধের মত কাম-চর্চ্চায় গা ঢেলে দিচ্ছিস্। এজন্য আমি তোদের দোষ দিচ্ছি না, কারণ, কেউ এসে তোদের শিক্ষা দেয় নি যে, বিবাহের পরে দীর্ঘকাল সযত্নে সংযম রক্ষা ক'রে স্বামি-পত্নী ভ্রাতা-ভগ্নীর ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন ক'রে তারপর উপযুক্ত সময়ে সন্তানের জননী হ'লে সেই সন্তান সত্য সত্যই জনক-জননীর নয়নানন্দ-বিধায়ক হয় এবং সেই সন্তানকে প্রসব ক'রে জননী চির-রুগ্না, স্বাস্থ্যহীনা, ক্ষীণদেহা ও দুর্ব্বলা হন না। কি পিতৃ-গৃহে কি শ্বশুর-কুলে তোদের এ-বিষয়ে সৎশিক্ষা দান কর্ব্বার মত লোক কেউ নেই। একজনও তোদের বিবাহিত জীবনকে সংযমে সুপ্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে এক মিনিটের জন্য চিন্তাশক্তির বিন্দুমাত্র ব্যয় করেন নাই। একটী লোকও তোদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল যে ইন্দ্রিয়-সংযমকে আশ্রয় ক'রেই প্রস্ফুটিত হবে, সেই কথাটি তোদেরকে বুঝিয়ে দেবার জন্য একটী মাত্র বাক্য ব্যয় করেন নাই। তোদের জীবনকে দেবদুর্ল্লভ পবিত্রতায় স্বর্গীয়-সৌরভ-মণ্ডিত ক'রে তোলবার জন্য একটী কাকপ্রাণীও এককণা চেষ্টা দেখে নাই। বরং কি ক'রে দাম্পত্য-জীবনে প্রবেশ মাত্রই নানা কদর্য্য সুখ ও কুৎসিত আমোদে মত্ত হ'য়ে যেতে হয়, কি ক'রে নির্ব্বিকার স্বামীর চিত্তে বিকার সৃষ্টি ক'রে তাকে ক্ষণিক সুখের পানে আকৃষ্ট কর্ত্তে হয়, প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে প্রত্যেক কিশোরী বিবাহের পরমুহূর্ত্ত থেকে কেবল সেই বিষয়টায়ই যত জঘন্য প্ররোচনা পেতে থাকে। তারই ফলে সন্তানের জননী হ'য়েও এ সন্তানকে বালিকা-জননীরা দীর্ঘকাল বুকে ধ'রে রাখতে পারে না, যেখান থেকে তারা এসেছিল, সবাইকে কাঁদিয়ে আবার তারা সেইখানেই চলে যায়। তুমি যদি মা জান্তে, সন্তানের অকাল মৃত্যুর কারণ তোমারই আচরণের মধ্যে, তাহ'লে নিশ্চয়ই তুমি তথাকথিত বন্ধুবান্ধবদের প্ররোচনায় প'ড়ে বা তাদের ইঙ্গিতে চ'লে এত তরুণ বয়সেই নিজেকে ইন্দ্রিয়-সেবার পায়ে বলি দিয়ে কলঙ্কিত কর্ত্তে না। তোমার স্বামীও বর্ষীয়ান্ পুরুষ নয়, তারও বয়স অল্প, সেও এ সব জান্ত না, তাকেও এ বিষয়ে সৎশিক্ষা দেবার মত বান্ধব কেউ ছিল না। নইলে সে তোমাকে তার

জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, পবিত্রতা লাভের প্রেরণা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিয়ে নিশ্চয়ই রক্ষা কত্তে পাত্ত।

"আজ ত মা তোমরা একটী সন্তান নষ্ট হইয়া যাওয়ার কঠিন শোকে মুহ্যমান হবার পরে জান্‌বার সুযোগ পেয়েছ যে, চিরজীবী সন্তান ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলস্বরূপেই ভূমিষ্ঠ হয়। আজ ত মা তোমরা দুজনেই এমন উপদেষ্টা পেয়েছ, যিনি যে কোনও মুহূর্ত্তে প্রয়োজন, তোমাদিগকে গত-সংশয় ও উৎসাহিত কত্তে পারেন। আজ ত মা তোমর দাম্পত্য জীবনের গুপ্ত অংশটুকুর মধ্যেও যে অখণ্ড পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক,তা' বুঝ্‌তে পেরেছ। আজ তোমরা বিগত সহস্র ভুলের জন্য আর ব্যাকুল বিহ্বল হয়ো না, আজ তোমরা গভীর উৎসাহে কোমর বাঁধ, আজ তোমরা এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হও যে, দেহ ও মনকে উপযুক্ত ভাবে সুগঠিত ক'রে তোলার আগ পর্য্যন্ত পরস্পর পরস্পরের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ স্থাপন কর্ব্বে না, এবং একজন আর একজনকে সংযমী, জিতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম ক'রে গ'ড়ে তোলার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা কর্ব্বে।

"যে গর্ভের একটী সন্তান একবার নষ্ট হয়, সেই গর্ভকে সর্ব্বদোষমুক্ত বিশুদ্ধ ক'রে নেওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয় বিষয়টীর প্রতি উপেক্ষা কর্ল্লে অধিকাংশ স্থলে এই গর্ভে একটীর পর একটী ক'রে সন্তান কেবল নষ্টই হ'তে থাকে। ক্রমান্বয়ে দুই তিনটী সন্তান নষ্ট হ'য়ে গেলে পরে শেষে জরায়ুর এমন দুরারোগ্য ব্যাধি জ'ন্মে যায় যে, অধিকাংশস্থলে এ গর্ভে আর জীবিত সন্তান জন্মেই না, জন্মালেও অত্যন্ত রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য, অন্ধ বা খঞ্জ প্রভৃতি হ'য়ে জন্মায়। এইজন্যই মা তোমাকে আমি আজ থেকেই গর্ভ-শোধনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূঢ় হ'তে বল্‌ছি।

"তোমাদের অঞ্চলে অনেক সাধু-মহাত্মা আছেন এবং ছিলেন। বহু নরনারী তাঁদের কাছে যায় এবং মৃতবৎসার প্রতীকার প্রার্থনা ক'রে থাকে। তাঁরা কাউকে ধূলাপড়া, কাউকে জলপড়া, কাউকে কবচ, কাউকে অষ্টধাতুর মাদুলী প্রভৃতি দিয়ে মৃতবৎসা নিবারণের চেষ্টা করেন। এসব কথা ত' তুমি নিজে নিশ্চয়ই জান। আমার কিন্তু মা কোনও তাবিজ, কবচ, মাদুলী বা জলপড়া

নেই। অ্যমার কোনও তুক্‌তাক্ ঝাড়্‌ফুক্ নেই। আমার শুধু একটা ঔষধ এই রোগের জন্য জানা আছে। সেইটী হচ্ছে ঈশ্বরের নাম এবং সেই ঔষধের অনুপান হচ্ছে যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন। আজ থেকে তুমি ঈশ্বরের নামের উপর আস্থাবতী হও, আজ থেকে তুমি প্রবল বিক্রম সহকারে ঈশ্বরের নামের সাধনা কত্তে লেগে যাও, আজ থেকে তুমি তোমার দেহ-মন সবই ঈশ্বরের জিনিষ জেনে দেহমধ্যে তথা উদরমধ্যে ঈশ্বর-চিন্তা কত্তে থাক; তোমার জরায়ুর মধ্যে ছোট্ট শিশুটীর মত তিনি গিয়ে দীর্ঘ নিদ্রায় দিন কাটাচ্ছেন, তাঁর সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি দেব-বিগ্রহ যুক্তকরে তাঁর বন্দনা-গীতি গাইছে, তাঁর সেই দিব্য দেহ তোমার রক্ত থেকে নিজে পুষ্টি সংগ্রহ কচ্ছে, স্বয়ং পরমাত্মার মাতা হয়ে তুমি তোমার গর্ভকে পবিত্রতায় উপনীত অনুভব কচ্ছ,—এইরূপ চিন্তা কত্তে থাক। প্রাতে দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় এই তিনবার চেষ্টা করবে, কিন্তু তিনবার পার আর না পার রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে তোমাকে বিছানায় ব'সে যত দীর্ঘ সময় পার, চেষ্টা কত্তেই হবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রবল নিদ্রাকর্ষণে না আচ্ছন্ন হয়ে যাও, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই পবিত্র ক্রিয়াটুকুর অভ্যাস কত্তে থাক। গর্ভবিশোধনের ও কামপ্রদমনের ইহা অমোঘ পন্থা।

"আশীর্ব্বাদ করি, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-নিষ্ঠ হ'য়ে আমার এই ছোট্ট মা-বাবারা দেহে মনে অপূর্ব্ব তেজ ও শক্তি লাভ করুক। ইতি

"আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ"

তারে আমি ভালবাসি

মুঙ্গের-বেগুসরাই-নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"কল্যাণীয়েষু ঃ—

"অন্তর-ভরা আনন্দ যার
মুখভরা যার হাসি,
পবিত্রতায় দীপ্ত আনন,
তারে আমি ভালবাসি।

"উন্নতি লাভে উৎসাহ যার,
অসত্যে অনাদর,
বিশ্বজগতে সবাই আপন,
কেহ নাই যার পর,
সংযত যার চিত্তবৃত্তি,
সংহত যার মন,
সে আমার প্রিয়, প্রাণের অধিক,
চির-সোহাগের ধন।

"দুঃখেরে দলে যারা পদতলে,
মৃত্যুরে দেয় লাথি,
লক্ষ বিপদে নির্ভয়ে যারা
বিশাল বক্ষ পাতি,
বীর বিক্রমে সহে নিপীড়ন,
ক্রন্দন নাহি মুখে,
তাহাদেরে আমি বাঁধি আশ্লেষে
স্নেহ-প্রশান্ত বুকে।
ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ"

পবিত্র সুন্দর

বেগুসরাই-নিবাসী একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"হাসি মুখে কথা কয়
পবিত্র সুন্দর
তার চিত্ত-মাঝে মোর
চিরদিন ঘর।"

ভগবানকে ডাকিতে থাক

রহিমপুর-নিবাসিনী জনৈকা ভক্তিমতী মহিলাকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"মা, অহর্নিশ তাঁর নাম স্মরণ করিতে থাক। দিনক্ষণের কালাকালের বিচারের প্রয়োজন নাই; উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে মনে মনে তাঁর নামোচ্চারণ করিতে থাকিবে। এ জগতে তাঁর নামই একমাত্র সত্য বস্তু। নামের যে আশ্রয় লয়, নামের শক্তি তার জন্য ভক্তি ও মুক্তির দুয়ার খুলিয়া দেয়। নিরন্তর শুধু তাঁকে ডাকিতে থাক। সন্তানের আকুল আহ্বান শুনিয়া কি তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিবেন ?—কথনই নহে। সংসারের সহস্র আবল্যের মধ্যেও তাঁর নামকেই একমাত্র শান্তি জানিয়া ইহাকে সমগ্র মন-প্রাণ দিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধর।"

আশ্রমগঠন-প্রয়াসকে চরিত্র-গঠনের উপায়রূপে গ্রহণ কর

থোল্লা-গ্রামের জনৈক যুবক বিদ্যার্জ্জনোপলক্ষে রহিমপুর বাস করিয়া থাকেন; শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে লিখিলেন,—

"বাবা—, * * * যে কষ্ট-সহিষ্ণুতা, কর্ম্মোৎসাহ, সাহসিকতা ও সৎসঙ্কল্প থাকিলে মানুষ বড় কাজের যোগ্য হইতে পারে, তার কিছু কিছু প্রাথমিক অবস্থায় তোমাদের চরিত্রমধ্যে আমি লক্ষ্য করিয়াছি। উপযুক্তভাবে উৎকর্ষ সাধিত হইলে এই সকল সদ্‌গুণ বহু-প্রসারিত মহীরুহের ন্যায় বিশালতা প্রাপ্ত হইবে এবং আজ যাহা তোমাদের পক্ষে একান্তই অকল্পনীয়, একদিন তেমন মহৎ কার্য্য তোমাদের দ্বারা অতি সহজে সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর হইবে। কিন্তু বহু সদ্‌গুণের সহিত বহু অসদ্‌গুণও যুবক-চরিত্রে উঁকিঝুঁকি মারে। সেই সময়ে প্রত্যেক আত্মগঠনেচ্ছু যুবকের কর্ত্তব্য নিজ চরিত্রের প্রকৃত অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্ম-বিশ্লেষণের দ্বারা পরীক্ষা করা এবং যাহা মঙ্গলকর, তাহাকে পরিপোষিত করিয়া যাহা অমঙ্গলপ্রদ, তাহাকে উপবাসে নির্জ্জিত করা। আমি চাহি, তোমরা নিজ নিজ জীবনকে নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক করিয়া গড়িয়া তুলিতে প্রযত্নপর হও এবং আশ্রমের সহিত তোমাদের সংশ্রবকে সার্থকতা প্রদান কর।

"আশ্রমকে আমি তোমাদের চরিত্রগঠনের একটী যন্ত্র বলিয়া মনে করি। আশ্রমের সংস্পর্শ তোমাদের জীবনকে অপূর্ণতার মোহ হইতে টানিয়া আনিয়া পূর্ণতার দিকে প্রধাবমান করুক, ইহাই আমি চাহি। যদি একদল হুজুগ-বিলাসী সহসা-কর্ম্মীর একটা খেয়ালখেয়ালের আড্ডা মাত্র হওয়া ছাড়া আশ্রমের অপর কোনও যোগ্যতা না থাকে, তবে আমার মতে সে আশ্রম ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত। যে প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসিয়া অলসের আলস্য দূর হইবে না, বাক্যবীরের বাগ্-বাহুল্য কমিবে না, অসাধকের সাধন-রুচি সৃষ্ট হইবে না, অসংযমী সংযম শিখিবে না, যে প্রতিষ্ঠানের সংশ্রবে আসিয়া দায়িত্বজ্ঞানহীনের কর্ত্তব্যবোধ জাগিবে না, পরমুখাপেক্ষীর স্বাবলম্বন আসিবে না, অগঠিত-চরিত্র বিমনা বালকের মানসিক আত্মকর্তৃত্ব, দৃঢ় সঙ্কল্প ও চারিত্রিক সম্পদ লাভ হইবে না, তেমন প্রতিষ্ঠানকে আশ্রম বলিয়া অভিহিত করা আর আশ্রম কথাটার অপমান করা এক কথা। কলিকাতাতে রুটির দোকানের নাম অন্নদা-আশ্রম, রেষ্টুরেণ্টের নাম কালিকা-আশ্রম, হোটেলের নাম মহৎ-আশ্রম, পানের দোকানের নাম বিন্ধ্যাশ্রম,—এই রকম বহু আশ্রম আছে। নিশ্চয়ই তোমাদের রহিমপুর আশ্রম সেই শ্রেণীর আশ্রম নহে। নিশ্চয়ই রহিমপুর আশ্রম তাসখেলার, জুয়াখেলার বা ধূমপানের আশ্রম নহে। এখানকার সংস্পর্শ তোমাদের নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করিতেছে, সৎকর্ম্মের প্রবৃত্তিকে প্রবল করিতেছে, আত্মবিশ্বাস ও আর্ত্তসেবা-বুদ্ধিকে উজ্জীবিত করিতেছে, আমি ইহাই চাহি। কতিপয়-মাস-ব্যাপী তোমাদের পূর্ব্বজীবনটুকু আলোচনা করিয়া বল দেখি বাবা, তোমরা আমার এই প্রার্থনাটুকু পূর্ণ করিবার চেষ্টা কায়-মনোবাক্যে করিয়াছ কিনা ?

"আমি এই জিদ্ করিতে চাহি না যে, তোমাদের কাহারও যদি ব্যক্তিগত কোনও বিশেষ উচ্চ লক্ষ্য থাকিয়া থাকে, আশ্রমের পায়ে আসিয়া তাহা বলি দাও। আমি তোমাদের স্বাধীন সুরুচি, স্বাধীন সৎপ্রেরণা, স্বাধীন সুবুদ্ধির উৎসমুখ রুদ্ধ করিয়া দিবার জন্য এই আশ্রমের উদ্বোধন করি নাই। ভবিষ্যৎ জীবনে যে যত মহৎ হইতে পার বাবা, হইও। তোমাদের প্রত্যেক উৎকর্ষ-কামনার সহিত আমার আত্মার পূর্ণ সমর্থন ও আশীর্ব্বাদ আছে। কিন্তু

নিজ নিজ চরিত্র-সাধনার এবং নিজ নিজ আত্মোৎকর্ষ বিধানের উপায়রূপে আশ্রমকে যতটুকু তোমাদের কাজে আনিতে পার, তার চেষ্টা করিতে তিলমাত্র পরাঙ্মুখ হইও না, ইহাই আমার একমাত্র অনুরোধ।"

কোলাহলের মধ্যে ধ্যান-সাধনা

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা হেদুয়ার মাঠে (কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে) গেলেন। চতুর্দ্দিকে জনতা, কিন্তু কেহ কাহারও প্রতি আসক্ত নহে, প্রত্যেকটী মানব নিজ নিজ রুচির স্রোতে ভাসিয়া স্বাধীন ভাবে বেড়াইতেছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাইরের বিশ্বের প্রতি ঔদাসীন্যের সাধনা থাক্‌লে, এই জনতাই তপঃসাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত হ'তে পারে। কেউ এখানে স্থায়ী নয়, কেউ আস্‌ছে, কেউ যাচ্ছে, যে এসেছে সে থাক্‌বে না, যে গিয়েছে হয়ত সে শীঘ্র আস্‌বে না, যদি বা আসে, তবে আবার যাবে, এই যে চির-চঞ্চল বিকারশীল বিপ্লবময় অবস্থা, এর মাঝখানে নির্ব্বিকার হ'য়ে সাধন করা খুব কঠিন নয়। চাই মাত্র একটু ঔদাসীন্য, একটু নিরপেক্ষতা।

বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবা ধ্যান-নিমগ্ন হইলেন। শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে যে তিনটী যুবক ছিলেন, তাঁহারাও ধ্যানস্থ হইলেন।

পাপ-পুণ্য উভয়েরই অতীত হও

ধ্যানভঙ্গের পরে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিতে লাগিলেন,—পাপে জর্জ্জরিত হ'য়ে কলুষের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে অনুভব করেছ যে, পাপের অতীত হতে হবে, নইলে তাপের অতীত হওয়া যায় না। তাই তুমি ঈশ্বরানুধ্যানে রুচি পাও, তৃপ্তি পাও, তাই তাঁর কথায় তোমার প্রাণে আশা জাগে, উৎসাহ জাগে। কিন্তু সাধন কত্তে কত্তে তুমি পুণ্যেরও অতীত হবে। পাপ বা পুণ্য কোনও কিছুরই তুমি অপেক্ষা রাখ্‌তে পার না। তুমি হবে উভয়ের সম্পর্কেই নিরপেক্ষ।

নিরপেক্ষ আস্বাদন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দুঃখের অতীত হ'লে সুখ আসে, কিন্তু সুখ-দুঃখের অতীত হ'লে আনন্দ আসে। পাপের অতীত হ'লে পুণ্য আসে, কিন্তু পাপ-পুণ্য উভয়ের অতীত হ'লে শান্তি আসে। শান্তি ও আনন্দ হচ্ছে নিরপেক্ষ আস্বাদন।

কলিকাতা
১৭ই চৈত্র, ১৩৩৮

বহির্ম্মুখ কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে অন্তরঙ্গ সাধনার দ্বারা শক্তি-আহরণ

শেষ রাত্রি প্রায় সাড়ে তিন ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিতে বসিলেন। রহিমপুর নিবাসী জনৈক যুবক-ভক্তকে লিখিলেন,—

"আশ্রমের কাজে তোমাদের উৎসাহের কথা আমি শ—র পত্রে জানিয়াছি। আশ্রমকে তোমরা ভালবাসিয়াছ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু আমার সব চাইতে বড় আনন্দ এই যে, তোমরা আশ্রমকে তোমাদের চরিত্র গঠনের উপায়স্বরূপে ব্যবহার করিতেছ। আশ্রমের সংশ্রবে তোমাদের মধ্য হইতে যদি নিরাশা-নিরুদ্যম দূরীভূত হয়, তোমাদের মধ্যে যদি সঙ্ঘবদ্ধতার প্রতিষ্ঠা হয়, তোমাদের মধ্যে যদি পারস্পরিক সহযোগিতার সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটে, তোমাদের মধ্যে যদি আত্মকর্ষণ ও আর্ত্তত্রাণের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়, তবেই আমি বুঝিব যে, আশ্রম তাহার নামকে সার্থক করিয়াছে, আশ্রম তাহার যথার্থ উপযোগিতার প্রমাণ দিয়াছে।

"কিন্তু বাবা, আশ্রমের মাটিকাটা, পুকুর খোঁড়া, কাদা মাড়া, ইট গড়া, দালান গাঁথা প্রভৃতি কাজের সীমাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে আমি সব চাইতে বড় যে বস্তুটীকে দেখিতে চাই, তাহা হইতেছে তোমাদের সাধন। বাহিরের সহস্র কর্ম্মকোলাহলের সঙ্গে সঙ্গেও যে নিরন্তর অন্তরের সঙ্গোপন সাধন অপ্রমত্ত চিত্তে অব্যাকুল গভীরতায় করিতে পারে, তারেই আমি আজ চাই। কোদালের শব্দে, ফর্ম্মার ধ্বনিতে, হাতের থপ্ থপানি আওয়াজে তোমাদিগকে ভগবানের অমৃতময় নামের সুমধুর ঝঙ্কার শুনিতে হইবে। কাজ কর হাতে, মন ফেলিয়া রাখ পরমাত্মায়, আর কর্ম্মজনিত প্রত্যেকটী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নীরবে নিঃশব্দে নামের সেবা করিয়া যাও। আমি তোমাদিগকে একাগ্র, উদগ্র, ব্যগ্র সাধক দেখিতে চাহি। ভারতের ভবিষ্যৎ বাবা তোমরাই নির্ণয় করিবে, তোমাদেরই তপস্যার বীর্য্যে নবভারতের জন্মলাভ হইবে, তোমাদেরই তপঃপূত প্রেরণার

অমোঘ ঘাতপ্রতিঘাতে নিদ্রিত এ মহাজাতির শত শতাব্দীর আলস্য-তন্দ্রা অপগত হইবে, দেশ জাগিবে, উঠিবে, শক্তির প্রচণ্ড তাড়নে যৌবনের প্রবল প্লাবনে বিশ্বজগৎ নূতন করিয়া ভাঙ্গিবে গড়িবে, জগতের ইতিহাস নূতন কালীতে নূতন কলমে নূতন ভাবে নূতন ভঙ্গীতে নূতন ভাষায় নূতন ঝঙ্কারে রচনা করিবে। বৃথা-কোলাহলকারী বৃথা-আন্দোলন-পরায়ণ চির-চীৎকার-কুশল জিরাফ-গ্রীব কতকগুলি অসাধক অকর্ম্মণ্য সন্তানের পিতা হইয়া আমি আমার অন্তরে এককণা সুখও অনুভব করি না, একটীমাত্র তপস্বী সন্তান, একটীমাত্র সাধনশীল পুত্র বা কন্যা আমার প্রাণের সকল কামনা পূরাইয়া দিবে। বাবা, তোমরা আজ সাধক হও, তোমরা আজ তপস্বী হও, কি করিয়া ইট গড়িবার সময়েও ভগবানের নামের প্রবাহ অফুরন্ত ধারায় ছুটিতে পারে, কি করিয়া মাটি কাটিবার কালেও পরমাত্মার পুণ্যময়ী স্মৃতি-চেতনা নিরন্তর অন্তরে জাগরূক থাকে, তার অবিরত অভ্যাস চালাইয়া অসার সংসারের বহির্মুখ কর্ম্মের মধ্য দিয়াও নিত্য বস্তুর সার তত্ত্বকে অন্তর্মুখে আস্বাদন কর।

"তোমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছ যে, কাজের সময়ে কথা বলিলে আমি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি, সামান্য গোলযোগের সৃষ্টি হইলে কঠিন শাসনে তাহা রুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হই। ইহার কারণ এই নহে যে, আমি সত্য সত্যই রুক্ষ-চেতা ও স্নেহহীন। ইহার কারণ ইহাও নহে যে, বালকের পক্ষে তার বয়সোচিত চাপল্যকে আমি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করি। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, তোমরা প্রত্যেকে আজ যৌবনের সন্ধিক্ষণে দণ্ডায়মান, তোমাদের উপরে তপঃ-সাধনার দাবীই আজ সর্ব্বোপরি প্রধান। বহির্ম্মুখ বৃথালোচনায় নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে টানিয়া আনিয়া অপব্যয়িত করিবার অধিকার আজ তোমাদের নাই। তোমাদের আজ সমগ্র বিশ্বের সকল শক্তি শ্বাসের প্রবাহে টানিয়া আনিয়া নিজেদের ভিতরে পুঞ্জিত, সঞ্চিত ও শৃঙ্খলিত করিতে হইবে। অপরে যখন কথা কহিয়া কহিয়া নিজেকে নিঃশেষিত করিয়া দিতেছে, তুমি তখন ব্রহ্মাণ্ডের সকল শক্তি আনিয়া নিজের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত কর, জাগ্রত কর, জগতের মহৎ কল্যাণের মহতী সাধনায় উপযুক্ত সময়ে সমর্পণ করিবার জন্য শক্ত

করিয়া পুঁজি বাঁধ। আশ্রম তোমার শক্তি-সাধনার পীঠস্থান, আশ্রম তোমার শক্তি অর্জ্জনের উৎসাহোৎস, আশ্রমের কর্ম্ম তোমার জীবনব্যাপী তপঃসাধনার প্রভাতারুণ, আশ্রমের সেবা আজ তোমাকে যে তপঃপরায়ণতা, যে তপোনুরক্তি, যে সংগুপ্ত তপস্যার সামর্থ্য প্রদান করিতে চাহিতেছে, আমৃত্যু ইহা তোমার এক পরম সম্পদরূপে বিরাজমান রহিবে, ইহপর জীবনে ইহা তোমার পরমবান্ধবরূপে সকল দুঃখ-শোকে সকল বিঘ্নবিপদে তোমার দুঃখ সহিষ্ণুতা ও রণজয়িষ্ণুতা বিবর্দ্ধিত করিবে। ইহাই আশ্রমের mission, এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই mission পরিপূরণের প্রয়াস আশ্রমের অন্তরাত্মা হইতে বিদূরিত না হইবে, ততদিনই আশ্রমের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার, ততদিনই আশ্রমের বক্ষ তরুণের চরণচুম্বন করিবার অধিকারী।"

কর্ম্মীর ব্রহ্মচর্য্যহীনতার পরিচয়

"তোমাদের মধ্যে অনেকেই আবার বিমনা বিক্ষিপ্তচেতা হইয়া পড়িয়াছে। আমি জানি, ইহার পশ্চাতে তাহাদের কোন্ দুর্ব্বলতা রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়-সুখের দুর্ণিবার তাড়না যখন তোমাদের পরমসুখোন্মুখ চিত্তকে পুনরায় পূর্ব্বসংস্কারের নাকাদড়ি দিয়া টানিতে চাহিতেছে, তখনি তোমরা আশ্রমের তপঃপূত জীবনের সুখময় সংসর্গকে ভীতিসঙ্কুল বলিয়া পরিহার করিতে চেষ্টিত হইয়া পড়িতেছ। তোমাদের একজনেরও চিত্তভাব আমার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তোমাদের একজনেরও কর্ম্মোদাসীন্যের যথার্থ কারণকে অনুসন্ধান করিতে আমি বাকি রাখি নাই। আমি অভ্রান্তভাবে জানিয়াছি, তোমরা যে মহাপাপকে, বীর্য্যক্ষয়রূপ যে মহানিষ্টকে অভাবনীয় তৎপরতার সহিত একদিনে বর্জ্জন করিয়াছিলে, পুনরায় ধীরে ধীরে তারই সঙ্গে সঙ্গোপন সৌহৃদ্য স্থাপন করিতেছ। উন্মাদিনী তরঙ্গিনীর সহস্র বিঘ্নসঙ্কুল আবর্ত্ত ঠেলিয়া যে তরণীকে নিরাপদ তীরভূমির অতি সন্নিকটে টানিয়া আনিয়াছিলে, আজ আবার তাহা আবর্ত্তের কুটিল আক্রমণের বুকেই বৈঠা ঠেলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এই গতি কি দ্রুত ফিরাইতে হইবে না?

বৃহস্পতি-সম্মিলনী

" * * * সর্ব্বশেষে বৃহস্পতি-সম্মিলনী সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে।

দেব তাদের গুরু বৃহস্পতির নামানুসারে এই নির্দ্দিষ্ট দিনকে বৃহস্পতিবার বলা হয়। বৃহস্পতিকে জগতের সকল গুরু-শক্তির প্রতিনিধিস্বরূপ ধরিয়া আমি বৃহস্পতিবারটা তোমাদের পক্ষে বিশেষ পবিত্র বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছি। ভক্তিমানের পক্ষে এই দিনটি গভীর সাধনার জন্য এবং সম্ভব হইলে উপবাসাদি-পূর্ব্বক চিত্ত সংযমনের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই দিন তোমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া জাতি-বর্ণাদি-বিদ্বেষ-বিহীনভাবে একত্র একমনে একপ্রাণে একাসনে ভগবদুপাসনা করিয়া সদ্‌বৃত্তির উৎসবানন্দ করিবে, ইহাই আমার অভি-প্রায়। আমি স্বয়ং তোমাদের মধ্যে জড়দেহ লইয়া উপস্থিত থাকি আর না থাকি, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; যেথানে আমার জীবনাদর্শের পূজা হইয়া থাকে, আমি আমার নিত্য-সিদ্ধ দেহ লইয়া চর্ম্মচক্ষুর অগোচরে সেখানে অবস্থান করিয়া থাকি। কোনও ব্যাখ্যান বা উপদেশ-ভাষণ দিবার জন্য আমি যখন উপস্থিত থাকিব না, তখন তোমরা আমার কোনও গ্রন্থ পাঠ করিও।”

গৈরিকের অপব্যবহার নিবারণ আবশ্যক

রহিমপুর আশ্রমের জনৈক কর্ম্মী শত নিষেধ সত্ত্বেও বারংবার গৈরিক পরিধান করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে লিখিলেন,—

“অনেক আশ্রমেই গৈরিক বস্ত্রের ছড়াছড়ি দেখা যায় এবং যে ইচ্ছা সেই গেরুয়া কাপড় পরিয়া থাকে। আমি গৈরিকের এই অপব্যবহারের তীব্র বিরোধী। গৈরিক বস্ত্র যার তার জন্য নয় এবং গেরুয়ার ধ্বজা উড়াইয়া লোকমান সংগ্রহ করিবার চেষ্টার ন্যায় নীচতা, কাপুরুষতা ও জুয়াচুরী এ জগতে আর কিছু নাই। আমি তোমাদিগকে গেরুয়াধারী ভণ্ড তপস্বী রূপে দেখিলেই পরম পরিতৃপ্ত হইয়া যাইব না। তোমাদের মধ্যে চরিত্রের মাধুর্য্যই আমি দেখিতে চাহি। তোমাদের মধ্যে তপস্যার প্রার্থনাই আমি দেখিতে চাহি। তোমাদের মধ্যে চিত্তের নিরহঙ্কার নিরভিমান স্থৈর্য্যই আমি দেখিতে চাহি। পুনরায় বলি, গেরুয়া কাপড় পরিবার জন্য ব্যস্ত হইও না, চরিত্রের সম্পদ, সাধনের সম্পদ, উপলব্ধির সম্পদ অর্জ্জন করিবার জন্যই ব্যগ্র হও। একটা গাধার পিঠে গেরুয়া চাপাইয়া দিলে তাকে সুন্দর দেখাইতে পারে, কিন্তু উহাতে

লাভ কিছু হয় কি? একটা কুম্ভীরের বক্ষে-পৃষ্ঠে গেরুয়া আঁটিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহার অর্থ কিছু হয় কি? শতবার যে মিথ্যা কথা কহে, মনে মনে যে নিয়ত পাপবুদ্ধির সেবা করে, সে যদি গেরুয়া পরে, তবে ওর মত শয়তানী জগতে আর কি আছে? তুমি কি একটা পয়লা নম্বরের চোর হইতে চাও? তাহা হইলে বিনা বিচারে গেরুয়া পরিও। আর যদি সত্যি সত্যি মানুষ হইতে চাও, প্রকৃত সাধু ও ভক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে গেরুয়া পরিয়া লোকের প্রণাম পাইবার লোভ পরিহার কর এবং চরিত্রের প্রত্যেকটী দোষ প্রত্যেকটী ত্রুটী সংশোধনে যত্নবান্ হও। আমি নিজে গেরুয়া কাপড় পরিত্যাগ করিয়াছি কেন, তার কি তুমি ইতিহাস জান না? একপাল অলস নাস্তিকের জন্মদাতা গৃহীও যে যুগে গেরুয়া পরিবে, তেল-নুন-লঙ্কার দোকানদার যে যুগে গেরুয়া পরিবে, বাজারের গণিকা যে যুগে গৈরিক বস্ত্রে অঙ্গাচ্ছাদন করিবে, সেই যুগে গেরুয়ার দোহাই দিয়া লোকমান পাইবার চেষ্টা তোমার সঙ্গত কিনা, তাহাও ভাবিয়া দেখিও। যেই গেরুয়া অবস্থা-বিশেষে শ্লাঘ্যতম ভূষণ, সেই গেরুয়াই স্থল-বিশেষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আপত্তি-জনক। * * * আমি দুই একটী সুপাত্রের পক্ষে গৈরিক লাভ সঙ্গত বলিয়া মনে করি, ইহা সত্য; কিন্তু এই জিনিষটী পরিধান করিবার জন্য তাহাদিগকে কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতে হইবে।

লোকমান-লুব্ধতা বর্জ্জন কর

"লোকমান পাইবার লোভ কি তুমি পরিত্যাগ করিতে পার না? লোকে তোমাকে না মানিলে কোন্ ক্ষতিটা হইবে? লোকে তোমাকে মানিলেই বা কোন্ লাভটা হইবে? লাভ ক্ষতির দিকে দৃষ্টি দিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর। জগতের বড় বড় শক্তিশালী পুরুষ-ধুরন্ধর লোক-সম্মান কুড়াইতে গিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনাকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছেন, জলাঞ্জলি দিয়াছেন। তোমারও কি বাবা সেই সুমহৎ দুর্ভাগ্যের প্রতিই লোভ জন্মিয়াছে? তুমিও কি লোকের পূজা পাইয়া পাইয়া অপমৃত্যু বরণ করিতে চাও? আমি বলি বাবা, স্থির হও, কুবুদ্ধিকে শাসন কর, লোকমান-লুব্ধতা বর্জ্জন কর, নিজেকে সকলের মাঝে

সব চেয়ে অনাদৃত রাখিয়া নিজ কর্ত্তব্য নিজে সাধ, মান-সম্মান বর্দ্ধনের প্রয়াসগুলিকে বর্জ্জন করিয়া সকল শক্তি আত্মোৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত কর।"

সন্তান-সম্পর্কে মায়ের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য

বহিমপুর নিবাসিনী জনৈকা ধনবতী মহিলাকে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"মা, তুমি নিশ্চয়ই জান যে, সন্তানকে কর্ম্মবিমুখ করিয়া ঘরের কোণে লুকাইয়া রাখিলেই তাতে সন্তানের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় না। তাকে আলস্যের পিঞ্জরে বাঁধিয়া রাখিলেই সে মানুষ হইয়া ওঠে না। তাকে জীবনের কঠোর কর্ম্ম-সংগ্রামের মাঝখানে ঠেলিয়া ফেলিতে হয়, তার আলস্যের মোহ-কারাগার ভাঙ্গিয়া দিয়া তাকে কর্ম্মঠ ও উদ্যমশীল করিয়া তুলিতে হয়। তবে গিয়া তাকে দিয়া সংসারের বা জগতের কাজ হয়। দশমাস দশদিন জঠরে ধারণ করিয়া যাহার জন্ম দিয়াছ, প্রাণান্ত যন্ত্রণা সহিয়া যাহাকে প্রসব করিয়াছ, তাহাকে যদি মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পার, তবে কি মা তোমার নিজেরও অন্তরে কোনও কষ্ট হইবে না? যার জন্য তোমার পক্ষে কোনও দুঃখই দুঃখ নহে, তাকে শক্তিমান, বীর্য্যবান, চরিত্রবান ও কঠোর অধ্যবসায়বান্ করিয়া তুলিবার জন্য তুমি কি মা একটুও যত্ন নিবে না? যার শ্রমপ্রিয়তা দেখিয়া আমরা প্রত্যেকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকাইতাম, আজ সে শ্রমবিমুখ। যার চরিত্রের মাধুর্য্যে আমরা প্রত্যেকে আকৃষ্ট হইতাম, আজ সে অবিনয়ী, অবাধ্য ও অনাদর্শ। নিজ সন্তানের এই অধোগতি দেখিয়া কি মা তোমার প্রাণে কোনও ব্যথাই সৃষ্ট হয় না?

"তুমি তার জননী, তুমি ইচ্ছা করিলে তাকে সৎপথে অগ্রসর করাইয়া দিতে পার। সন্তানের উপরে মায়ের শক্তি যে কি অপরিমিত ক্রিয়া করে, আমি নিজ জীবনে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছি। আমার জীবনের প্রত্যেকটী গৌরব, প্রত্যেকটী কুশল ও প্রত্যেকটী নিপুণতা আমি আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর স্তন্যের সাথে লাভ করিয়াছি। তুমিও তোমার সন্তানকে সকল সদ্গুণের আকরে পরিণত করিতে পার। সে শক্তি তোমায় পায়ের একটা অঙ্গুলীর মধ্যে রহিয়াছে। আজ তুমি নিজ সন্তানকে বীরবীর্য্যসম্পন্ন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তোমার

এককণা শক্তির সদ্ব্যবহার কর মা, তোমার নিকটে ইহাই আমার কাতর অনুরোধ।

"আমি অভিক্ষু, অযাচকবৃত্তিধারী, অপ্রার্থী কর্ম্মী। এজন্য অন্নাভাব ও ক্ষুধার তাড়নার সহিত আমার নিত্যসাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। শূন্যোদরে জঠরানল যখন প্রবল বিক্রমে জ্বলিতে থাকে, তখনো আমি কারো কাছে নিজ অভাব অভিযোগের বিন্দুমাত্র পরিচয় ঘৃণাক্ষরে প্রদান না করিয়া আশ্রমের মাটি কাটা, ইট গাঁথা প্রভৃতি কার্য্যে নীরবে নিজেকে নিয়োজিত রাখি। আর সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণাস্বরূপিনী তোমরা সেই সময়ে কতদিন গিয়া আমাকে দেবভোগ্য সুখাদ্য স্বহস্তে ধরিয়া খাওয়াইয়াছ। তোমাদের সেই প্রেম, সেই স্নেহ, সেই অযাচিত ভালবাসার পবিত্রতার মধ্যে আমি পরমাত্মার সাক্ষাৎ রূপাকে দর্শন করিয়াছি। কিন্তু মা, আমাকে পেট ভরিয়া খাইতে দিলেই আমি পরিতৃপ্ত হই না, যদি তোমরা নিজ নিজ গর্ভপ্রসূত সন্তানগুলিকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য শক্তির ব্যবহার না কর। তোমার নিজের সন্তান অলস অকর্ম্মণ্য রুগ্ন হইয়া নিজের ধ্বংস নিজে সাধন করিতেছে, তুমি মা চুপ করিয়া বসিয়া বিনা প্রতিবাদে দেখিতেছ, আর আমাকে আনিয়া ক্ষীর, সর, ননী, নাড়ু, দই, সন্দেশ প্রভৃতি খাওয়াইতেছ, এই দৃশ্য যে মা আমি সহিতে পারিতেছি না। আমাকে স্নেহ করিবার তোমার কোনও অধিকার নাই মা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজ সন্তানের জন্য আবশ্যকীয় শ্রম স্বীকার তুমি না করিতেছ।"

আত্ম-সংশোধনের চেষ্টাই গুরুভক্তির প্রমাণ

উল্লিখিত পত্রখানা যে পুত্রের মাতাকে লিখিত হইল, সেই পুত্রকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

অনেক সময় তোমাদের ব্যবহারে মনে হয়, তোমরা আমাকে ভালবাস। অথচ আমি যে আলস্যকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না, তাহাকেই প্রাণপণ সমাদরে দুই বাহু দিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছ। কি করিয়া বুঝিব যে, আমার প্রতি তোমাদের প্রীতিটা একান্তই অকৃত্রিম? তোমাদের অসত্য-বর্জ্জনের মধ্য দিয়া, আলস্য-বর্জ্জনের মধ্য দিয়া, অসংযম-বর্জ্জনের মধ্য দিয়া আমি দেখিতে চাহি যে,

সত্যই আমাকে ভালবাস। ব্যক্তিগত ভাবে যে আদর আপ্যায়ন তোমরা আমাকে করিবে, তাহাকেই আমি ভালবাসার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিব না। যে কদর্য্য কুরুচি ও অকুশলপ্রদ কদাচারকে আমি সমগ্র জগতের শত্রু বলিয়া জানিয়াছি, প্রচণ্ড অধ্যবসায় সহকারে তাহাকে নিজ নিজ জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করিলেই আমি আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাইব।"

পরনিন্দায় ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা হেদুয়ার মাঠে আসিয়া বসিয়াছেন। কতিপয় যুবক শ্রীশ্রীবাবার অনুগমন করিয়াছে। নানা সৎ-প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে আলোচনার রস-ভঙ্গ করিয়া একটী যুবক ব্রাহ্ম-সমাজের নিন্দা সুরু করিয়া দিল। ব্রাহ্মরা নিরাকারবাদী, অথচ ব্রহ্মের "চরণে" মাথা নত করে, "চরণ-পদ্মের" মধু পান করে,—বিগত মাঘোৎসবে কত বালিকা যুবতী কত রকমের বিলাস-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া প্রার্থনা করিতে যোগ দিয়াছিল, উঁহাদের উৎসব উপাসনা প্রভৃতির মধ্যে কামিনী-কণ্ঠের চিত্তোন্মাদক গান হয়,—ইত্যাদি বলিয়া ছেলেটী ব্রাহ্ম সমাজের নিন্দা করিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবা নিঃশব্দে সব শুনিলেন। তারপরে, কথা বলিতে বলিতে যখন ছেলেটীর দম ফুরাইয়া আসিল, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই যে এতক্ষণ ব্রাহ্ম-দের সমাজ ও উপাসনা-পদ্ধতির দোষ অনুসন্ধান কল্লে, তাতে লাভ হ'ল কিছু?

লাভ যে খুবই হইয়াছে, যুবকটী তাহা প্রমাণের জন্য উৎসাহ সহকারে বহু বাক্যাড়ম্বর করিয়া থামিলে, শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার যুক্তিতে তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ কি? আমি যদি কারো নিন্দা কত্তাম আর নিন্দাতে যে খুব লাভ হ'ল তা প্রমাণ কর্ব্বার জন্য এই সব যুক্তি দিতাম, তবে তুমি কি তা আকাটা ব'লে মেনে নিতে? নিশ্চয়ই নিতে না। কারণ, এগুলি অযুক্তি বা কুযুক্তি। কিন্তু এতক্ষণ ধরে কত ভাল ভাল কথা বলতে পাত্তে, তা না ব'লে পরনিন্দায় জীবনের খানিকটা অংশ বৃথা নষ্ট ক'রে দিলে। লাভ হয়েছে কি না, তা বিতর্কের বস্তু। কিন্তু ক্ষতিটা একেবারে তর্কাতীত। পরনিন্দায় ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। বল দেখি বাছা, কেন বৃথা এই ক্ষতিটাকে স্বীকার কল্লে?

পরনিন্দার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এস, এই পরনিন্দা-করণ আর পরনিন্দা-শ্রবণ রূপ দুই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। যার নিন্দা শুনেছি আর করেছি, এস তার প্রশংসা শুনি আর করি। তাতে পাপক্ষয় হবে।

পরনিন্দার স্বভাব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সত্য আবিষ্কারের জন্য অপরিহার্য্য দোষোদঘাটনকে পরনিন্দা বলা চলে না। কিন্তু কোনও ব্যক্তিকে বা সমাজকে নিজ চক্ষে বা অপরের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন কর্ব্বার উদ্দেশ্যে তার সম্পর্কে সত্য কথা বলাও পরনিন্দা, মিথ্যার ত' কথাই নাই। পরনিন্দার স্বভাবই এই যে, সত্য কথাও বিকৃত হয়ে বের হয়, প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাও যেন একটা অপ্রশংসনীয় আচ্ছাদন গায়ে দিয়ে নেয়।

গুণগ্রাহিতা শিক্ষা কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জ্জায়, আখড়ায়, দরগায়, আশ্রমে, মঠে, বিহারে, ইদ্‌গায় যেখানেই যাও, শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে যেয়ো, শ্রদ্ধার বুদ্ধি নিয়ে যেও, কিছু শিখবে, কিছু পাবে, কিছু নিয়ে আসবে এই সঙ্কল্প নিয়ে যেও। দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে দিলেও হাঁসে দুধটুকুই খায়। চিনির সঙ্গে নুন মিশিয়ে দিলেও পিঁপড়ে চিনিটুকুই সঞ্চয় করে। মধুর সঙ্গে শিশির-কণা মিশে গেলেও মৌমাছি মধুটুকুকেই এনে মধুচক্রে সঞ্চয় করে। এস বাছা, এই সব ইতর প্রাণীর কাছ থেকে আমরা গুণগ্রাহিতা শিক্ষা করি।

পরনিন্দা মহাপাপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—খুঁজতে গেলে দোষ কার না বেরুবে? বিশাল হিমালয়ের গায়ে কি বড় বড় ফাটল নেই? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির'ও কি একবার মিথ্যা কথা বলেন নি? লক্ষ্মণের মত ব্যক্তিও কি ক্ষণকালের জন্য পিতৃনিন্দা করেন নি? সীতার মত রমণীও কি কুণ্ডলী-লঙ্ঘন ক'রে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করেন নি? এইভাবে যদি দোষ খুঁজতে যাও, তবে জগতের সকল লোকের, সকল প্রতিষ্ঠানের, সকল সম্প্রদায়ের নিন্দা করা চলতে পারে। কিন্তু তাতে লাভ কি? সাকার-

বাদীরা নিরাকারবাদীদিগকে নিন্দা করে, কিন্তু সাকারপূজককে নিন্দা করার উপযুক্ত যুক্তি কি নিরাকার-উপাসকের তূণীরে নেই? বৈষ্ণব যদি বলেন, "শাক্তেরা মাতাল", অমনি কি শাক্তেরা বলে উঠবেন না, "বৈষ্ণবেরা ক্লীব?" নিন্দায় নিন্দা বর্দ্ধিত হয়, কারণ, জগতের কোনও নিন্দাকারী অপরের নিন্দার অতীত নয়। সুতরাং পরনিন্দা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। পরনিন্দাকে মহাপাপ ব'লে জানবে, মহানরক ব'লে জানবে।

ইষ্টনিষ্ঠাই পরনিন্দা-প্রবৃত্তির প্রতিষেধক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিন্দার প্রবৃত্তিকে যদি দমন কত্তে না পার, তা হ'লে কারো ধর্ম্মোৎসবে যোগ দিতে যেয়ো না। কালীপূজার পাঁঠা খাবে আর তন্ত্র-ধর্ম্মের নিন্দা কর্ব্বে, মহোৎসবের খিচুড়ী খাবে আর বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিন্দা কর্ব্বে, মাঘোৎসবের গান শুনবে আর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নিন্দা কর্ব্বে, এসব অতীব অসমর্থনীয় আচরণ। অপরের ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মপথ নিয়ে আলোচনা কত্তে গিয়ে অনেক মানুষ ইষ্টনিষ্ঠা হারায়। এই জন্যই প্রত্যেকের উচিত, অহর্নিশ সমগ্রটুকু সময় অবিরাম নিজের ইষ্টকে নিয়ে ধ্যান জমিয়ে থাকা। যার ধ্যান নিজ ইষ্টকে নিয়ে যত জমে, তারপক্ষে পরনিন্দার সম্ভাবনা ও প্রবৃত্তি তত ক'মে যায়। তাঁর স্বামীকেই কেউ পিতা ব'লে, কেউ ভ্রাতা ব'লে, কেউ সখা ব'লে, কেউ প্রভু ব'লে পূজা কচ্ছে,—এ দৃশ্য দেখে কি সতী নারী কোনও পূজকের উপরে নিন্দা বর্ষণ কত্তে রুচিসম্পন্না হন? তাঁর স্বামীকেই কেউ পূর্ব্ব দিকে, কেউ পশ্চিম দিকে, কেউ সর্ব্ব দিকে পূজা কচ্ছে,—এ দৃশ্য দেখে সতী সাধ্বী রমণীর ত' আনন্দ হবার কথা।

ধর্ম্মোৎসবের স্থান তীর্থভূমি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মোৎসবের স্থানগুলিকে জান্‌বে তীর্থস্থান। ধর্ম্মাচরণে মতদ্বৈধ থাক্‌তে পারে, জগতে চিরকাল তা থাক্‌বেও। কিন্তু বহু লোক যেখানে প্রকাশ্যে ধর্ম্মের নামে মিলিত হয়, সেখানে দুই-চারিজন লোকের মনেও যে ভগবানের প্রতি একটা গভীর অনুরক্তি আছে, তা' স্বীকার করা উচিত। লক্ষ লোক জগন্নাথের রথ টানে, তার ভিতরে দুই চারি জন লোকের প্রাণ নিশ্চয়ই

এই উপলক্ষ ক'রে জগৎপতির জন্য কেঁদেছে। লক্ষ লোক কাবার মস্‌জেদে ঈদের নামাজ পড়ে, তার ভিতরে দুই চারিজন লোকের প্রাণে পরমপ্রভুর জন্য আবেগ ও আকুলতা নিশ্চয়ই জেগেছে। বহিরাচারে তোমার এই বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু একটী ভক্তও যেখানে আকুল হ'য়ে ভগবানকে ডাকেন, সেই স্থানই যে পরম তীর্থ। কাশী গিয়ে বিশ্বনাথ না দেখে নোংরা পল্লীগুলিকে কেন খোঁজ ?

তীর্থের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লোকে তীর্থ করে চিত্তশুদ্ধির জন্য। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না হ'য়ে অনেকের চিত্তের অশুদ্ধিও হয়। মক্কা থেকে ফিরে এসে অনেকে বেদুইন দস্যুরই গল্প করে। কাশী থেকে ফিরে এসে অনেকে গুণ্ডার গল্প করে। অনেকে গয়া থেকে ফিরে এসে, দুর্ব্বৃত্ত পাণ্ডার গল্প, আর কামাখ্যা থেকে ফিরে এসে যাদুবিদ্যাপটিয়সী 'ভেড়া-বনানেওয়ালী'র গল্প করে। এর মানে জানো ? এরা তীর্থ কত্তে কেউ যায়নি,—দেশ দেখ্‌তে গিয়েছে। দেশ দেখ্‌তেই যদি যেতে হয়, তবে ঢাকা, কল্‌কাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লণ্ডন, প্যারী, টোকিও, বার্লিন যাও, কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, পুরী, রামেশ্বর যাওয়া কেন ? সুন্দরী যুবতী রমণী কেমন ক'রে ভেড়ার লোমে কম্বল বোনে, আর কেমন ক'রে অশ্বপৃষ্ঠে চড়াই উৎরাই উত্তরণ করে, তা দেখ্‌বার জন্য কেদারনাথ, বদ্রীনারায়ণ যাওয়া যেন বহুমূল্য পৈতৃক শালখানা দিয়ে চটী-জুতোর ধূলা মোছার মত। তীর্থস্থানে গিয়ে তীর্থের উদ্দেশ্য ভোলা অন্যায়। ধর্ম্মোৎসবে যাবে ত' যাওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেন ভুলে যাবে ?

কলিকাতা

১৮ই চৈত্র, ১৩৩৮

নিঃসন্তান গৃহী নহে, সংযম-শক্তিসম্পন্ন গৃহী চাই

অপরাহ্নে বহু যুবক নানা বিষয়ে উপদেশপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন। একটী যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ক্লাসে পড়েন। তিনি বিবাহিত। শ্রীশ্রীবাবার লিখিত "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থ তিনি পাঠ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধেই তিনি প্রশ্ন করিলেন।

যুবক।—আপনি ঐ গ্রন্থে বল্‌ছেন যে, দম্পতীরা সর্ব্বপ্রকার দৈহিক মিলন পরিবর্জ্জন ক'রে বিবাহিত জীবনেও পূর্ণ ব্রহ্মচারী ও পূর্ণ ব্রহ্মচারিণী হোক্। তার মানে কি এই নয় যে, দেশের লোক-সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাক্? মুসলমানদের শাস্ত্রে চারিটী পর্য্যন্ত বিবাহ ধর্ম্মজনক ব'লে নির্দ্দেশ আছে। ফলে সবাই চারিটী বিবাহ করুক আর না করুক, বহুবিবাহ প্রায় সকলেই করে এবং খুঁজলে প্রায়ই দেখা যাবে যে একটী পিতার ঔরসে অনেক স্থানে কুড়ি বাইশটী ক'রে সন্তান হয়েছে। এতে তাদের সংখ্যা-বৃদ্ধি হচ্ছে অতি ভয়ঙ্করভাবে, আর বর্ত্তমান সময়ে মুসলমানদের যাবতীয় রাজনৈতিক দাবীর ও প্রতিষ্ঠার গোড়াই যে হচ্ছে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি, তার আভাস আমরা বর্ত্তমান রাজনৈতিক ব্যাপারের ভিতরে লক্ষ্য কচ্ছি।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আভাস বল্‌ছ ত? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ বল না! আর সাত আট বৎসরের মধ্যে বাংলার রাজনীতিতে এই সংখ্যাধিক্যের সুযোগ নিয়ে কি অসম্ভব রণ-তাণ্ডব ও অবিচারের সৃষ্টি হবে, তা কি এখন স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছ না? তোমরা যেমন বুঝতে পার, আমরাও তেমন বুঝ্‌তে পারি! সুতরাং কোনও একটী সমাজের লোকের সংখ্যা কমে যাক্, এই কামনা নিয়ে কেউ বই লিখ্‌তে বসতে পারে না। আমি আমার বইতে যা লিখেছি বা লিখ্‌তে চেয়েছি, তার প্রাণের কথা হ'ল এই যে, সন্তান যার যা হবার হোক্, কিন্তু প্রত্যেকটী সন্তান পবিত্রতার ভিতর দিয়ে জন্মগ্রহণ করুক। স্বামী যদি স্ত্রীকে ভোগের উপকরণ মনে না করে, আর স্ত্রী যদি স্বামীকে ভোগের সঙ্গী জ্ঞান না করে, বীর্য্যবান্ ধীমান্ তেজস্বী সন্তানের জন্মের জন্যই উভয়ে মিলিত হচ্ছে, এই সঙ্কল্পকে যদি দৃঢ়রূপে অন্তরে পোষণ করে, আর তার পরে যদি শ্রদ্ধাবুদ্ধি পরিচালিত হ'য়ে সন্তান-জনন-মূলক অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়, তবে তার ফলে কারো অধিক সংখ্যক সন্তান হ'লেও তা অশ্লাঘ্য অবাঞ্ছনীয় হ'তে পারে না। বশিষ্ঠের শত পুত্র ছিল, তাতে তাঁর ঋষিত্ব যায় নি, কারণ, সন্তান-জনন-মূলক প্রচেষ্টা তাঁদের মত ঋষিদের ছিল ইচ্ছার অনুগত, ভোগবুদ্ধির তাড়নায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তাঁরা যখন তখন যা' তা' ক'রে বসতেন না। দাম্পত্য ভারতের ভিতরে সংযমের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হোক্, এই হ'ল "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থের গ্রন্থকারের মূল বক্তব্য। নিঃসন্তান

দম্পতীরা মৃত্যুমুখে পতিত হবার পরে ভারতবর্ষ পুত্রকন্যাহীন নির্জ্জন প্রান্তরে পরিণত হোক্, এ কথনো কোনো চিন্তাশীল লোকের কামনা হ'তে পারে না।

গৃহস্থের সংযত মিলনে পাপ নাই

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—সংযমী গৃহী ঘন ঘন স্ত্রী-সঙ্গ কত্তে পারেন না, কিন্তু সন্তানের প্রয়োজনে, লোক-সংখ্যা বর্দ্ধনের প্রয়োজনে, স্ত্রীর ও নিজের বাৎসল্য-প্রেমের চরিতার্থতার জন্য একটী বাৎসল্য-বিগ্রহ পাবার প্রয়োজনে, বংশ-বিনাশ নিবারণের প্রয়োজনে অথবা দৈহিক মিলনের মধ্য দিয়ে স্বামি-স্ত্রীর যতটুকু আত্মিক মিলন সম্ভব হ'তে পারে তৎসাধনের প্রয়োজনে, মাঝে মাঝে স্ত্রী-সঙ্গ কত্তে পারেন। এতে দোষও নেই, পাপও নেই। সন্ন্যাসী বা যতি হ'য়ে যাঁরা গৃহস্থের বৈধ স্ত্রীসঙ্গকেও ঘৃণাভরে নিন্দা করেন, তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন কত্তে ইচ্ছা করে যে, তাঁদের নিজ নিজ তপঃ-সাধক দেহের জন্ম হয়েছে কি ক'রে? অন্ততঃ এই কথাটা ভেবেও তাঁদের মনে একটু কৃতজ্ঞতা আসা উচিত যে, স্বামি-পত্নীর দৈহিক মিলন জগতে বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতির মত ব্যক্তিদের ধারণযোগ্য দেহগুলির জন্ম দিয়েছে।

নিজের প্রয়োজনের দিকে নহে, সমগ্র সমাজের প্রয়োজনের দিকে তাকান আবশ্যক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিবাহের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, জগতে ভগবদ্-ভক্তের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা। শুধু সংখ্যা-বর্দ্ধন এর উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্যাদির জন্ম দ্বারা সেই প্রকৃত উদ্দেশ্যটী সার্থকতা লাভ করেছে। কিন্তু সমাজের বা দেশের রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনের দিক তাকালে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারবে যে, এক এক সময়ে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির ও এক এক সময়ে লোক-সংখ্যা হ্রাসের প্রয়োজন পড়ে। সমাজে বাস ক'রে সমাজের গৃহী ও গৃহিণী সেই প্রয়োজন সম্বন্ধে অন্ধ থাকতে অধিকারী নয়। সুতরাং এক এক সময়ে তাদের উদ্যম এক এক প্রকারের হবে। কখনো তাদের উদ্যম হওয়া উচিত অধিক সন্তান লাভের, কখনও তাদের উদ্যম হওয়া উচিত অল্প সন্তান লাভের। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে নয়, সমগ্র সমাজের

প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে তাকে নিজ উদ্যমকে নিয়ন্ত্রিত কত্তে হবে। সমাজের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে যখন মানুষ কাজ করে, তখন সে জন্ম-দান বা জন্ম-শাসন যে কাজই করুক, তা দ্বারাই তার পক্ষে এক প্রকার স্বার্থ-ত্যাগের চর্চ্চা করা হয়।

জন্ম-সংখ্যা-বর্দ্ধন-চেষ্টার সহিত ত্যাগবুদ্ধি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু জন্মসংখ্যা বৃদ্ধির যখন প্রয়োজন হবে, তখন তাকে যথেচ্ছাচারে পরিণত হ'তে দিলে চল্‌বে না। জন্মসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টাটীর সাথে সাথে একটা সংযমের শুভ্রতা আগাগোড়া থাকা চাই। দৈহিক ক্রিয়ায় দৈহিক সুখানুভূতি অল্প-বিস্তর আছেই, কিন্তু স্বামী স্ত্রী-সংসর্গ দ্বারা সেই সুখটুকু নিজে পাবার লোভ না ক'রে স্ত্রীকেই সর্ব্বাধিক সুখ দেবার চেষ্টা কর্ব্বেন; আবার, স্ত্রী স্বামিসহবাস দ্বারা সেই সুখটুকু নিজে পাবার লোভ না ক'রে স্বামীকেই সর্ব্বাধিক সুখ দেবার চেষ্টা কর্ব্বেন। অর্থাৎ এই ভোগ-চর্চ্চার ভিতরেও আত্মসুখের লোভ সম্পূর্ণ বর্জ্জনের চেষ্টা ও অনুশীলন কর্ব্বেন।

জন্মসংখ্যা হ্রাস-চেষ্টায়ও আত্ম-সংযমই অবলম্বনীয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আবার, জন্মসংখ্যা হ্রাসের যখন প্রয়োজন হবে, তখনও তার ভিতরে যান্ত্রিক কৃত্রিমতার আমদানী না ক'রে মনঃ-শাসনের ক্ষমতাকেই আমদানী কত্তে হবে। মনঃশাসনের ভিতর দিয়েই জন্মশাসন কত্তে হবে। এতে যদি সম্যক সফলপ্রযত্ন কেউ নাও হতে পারে, তবু মনকেই এই ব্যাপারে অবলম্বন কত্তে হবে। তাতে যদি স্থল-বিশেষে লোক-সংখ্যা নাও কমে, তবু পিতামাতার মনের যে এক ক্ষমতা বাড়্‌বে, তা দিয়ে পরোক্ষভাবে সমগ্র সমাজ নানাভাবে লাভবান্ হবে।

জন্মশাসন আন্দোলনের প্রাণ চন্দন-বিলাসের লোভে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জন্মসংখ্যা হ্রাসের আন্দোলন বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে হিন্দুদের মধ্যেই হচ্ছে। অথচ ভারতে হিন্দুরা এখন ক্ষীয়মান জাতি। এ সবের ভিতরে আসল ব্যাপারটা কি, লক্ষ্য কচ্ছ? হিন্দু চন্দন-বিলাসীর জীবন যাপন কত্তে চায়। হিন্দু তার ছেলেকে রৌদ্রে পুরে বৃষ্টিতে ভিজে

মাঠে কাজ কত্তে দিতে চায় না। অথচ বহু সন্তানকে দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপরে লালন কত্তেও তার ক্ষমতায় কুলোয় না। ফলে এসব আন্দোলন সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে। হিন্দুর পক্ষে জন্ম-শাসনের আন্দোলন নিতান্তই কৃত্রিম ও নিষ্প্রয়োজনীয়। কয়েকজন বিলাসীর মনোরঞ্জনের জন্য সহস্র সহস্র নরনারীর ভবিষ্যৎকে ক্ষতিগ্রস্ত করার হচ্ছে এটী নির্ব্বোধ চেষ্টা।

অতিরিক্ত লোক-সংখ্যা বনে-জঙ্গলে পাঠাও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হিন্দুর প্রয়োজন, হিন্দুর উচিত, নিজেদের ছেলে-দিগকে মাঠে ঘাটে রৌদ্রে বৃষ্টিতে কাজ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া,—বন জঙ্গল পাহাড়-পর্ব্বত আবাদ ক'রে বন্য হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে বাস কর্ব্বার জন্য নির্ম্মম ভাবে উত্তেজিত করা। সমাজের কল্যাণে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির আবশ্যকতা থাক্‌লেও পন্থা এই, মনঃশাসনের দ্বারা জন্মশাসন চেষ্টা কত্তে কত্তেও পন্থা এই। বলা হচ্ছে, লোক-সংখ্যা বাড়লে লোকে খেতে পাবে না। কিন্তু যেখানে গেলে দু-দশ বছর বাঘ-ভালুক আর বন্য হস্তীর সঙ্গে লড়াই দিয়ে চিরস্থায়ীরূপে বহু পুরুষের জন্য অন্ন সংস্থান ক'রে নেওয়া সম্ভব, সেখানকার কথা কেন কারো মনে হয় না? কারণ, সবাই চন্দনবিলাসীর জীবনকেই পরম কাম্য জ্ঞান করেছে। খ্রীষ্টিয়ান মিশনারীরা হাজার কর্ম্মী পাঠিয়ে বন্য অসভ্য বর্ব্বরদের মধ্যে এক প্রকারের সভ্যতা ও ধর্ম্মের বিস্তার কচ্ছেন, আর তোমরা সবাই সীমাবদ্ধ একটুখানি দেশের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সংখ্যায় বেড়ে শুধু খাওয়া-খাওয়ি আর গুঁতাগুতি কচ্ছ। কারণ, দুঃখ কষ্ট কত্তে তোমরা নারাজ। কেমন, তাই নয় কি?

বিক্ষোভের মাঝেও নিভৃত সাধন

সন্ধ্যার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা সদলবলে পরেশনাথের মন্দিরে গিয়া বসিলেন। একস্থানে না বসিয়া ভিন্ন ভিন্ন জনকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসিতে বলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আজ বৃহস্পতিবার। আয় আমরা সবাই উপাসনা করি। কিন্তু নীরবে নিভৃতে করব। সবাই যার যার স্থানে ব'সে সমগ্র মনঃ-প্রাণ উজার ক'রে আয় একই মন্ত্রের সাধন করি। বহির্ম্মুখ দর্শক যখন এই

দেব-চত্বরের পার্শ্বে মধ্যে লক্ষ্যহীন ভাবে বিচরণ কর্ব্বে, তখন আমরা তাদের সম্পর্কে সকল অস্তিত্ব-জ্ঞান বিস্মৃত হ'য়ে নিজেদের গভীর অন্তরঙ্গ সাধন কর্ব্ব। আয়, আমরা তরঙ্গ-বিক্ষোভের মাঝে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ছবি দেখে নেই, ঝঞ্ঝা-বায়ুর সীমাহীন অধৈর্য্যের মধ্যেও নিবাত নিষ্কম্প হ'য়ে ব্রহ্মানুধ্যান করি।

কলিকাতা

১৯শে চৈত্র, ১৩৩৮

মহাপুরুষদের জীবনে অলৌকিক ঘটনা

গতকল্য রহিমপুর হইতে একখানা পত্র আসিয়াছে, যাহাতে কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপারের বর্ণনা আছে। শেষ রাত্রে উঠিয়া সেই পত্রের উত্তর-দান প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"স্নেহের,— * * * আমার সম্পর্কে কোনও অলৌকিক ঘটনার বিবরণ শ্রবণ করিলে তদ্বিষয়ে তোমাদের কর্ত্তব্য কি হইবে, আমি মনে করি, তৎসম্পর্কে একটা নীতি-নির্দ্ধারণ এখনই হইয়া থাকা ভাল। এই নীতির নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিতে পার, অন্ততঃ মূলতঃ প্রতিপালন করিলেও তাহা দ্বারা ভবিষ্যতের প্রভূত অনর্থ নিবারিত হইতে পারিবে। আমার সহিত বাহ্যতঃ যাহার সহিত পার্থিব বা আধ্যাত্মিক কোনও কুটুম্বিতা নাই, এমন ব্যক্তির মুখ হইতে আমার সম্পর্কে কোনও অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া-প্রকাশক ঘটনা শ্রবণ করিলে তাহা বিশ্বাস করিতে যে তোমাদের স্বতঃই প্রবৃত্তি হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু বিশ্বাস-অবিশ্বাস যাহাই কর আর না কর, সেই বিবৃতি সংরক্ষণ এবং তাহার প্রচার এই দুইটী কার্য্য হইতে সযত্নে বিরত রহিও। লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও রামকৃষ্ণ পরমহংস উভয়েই সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন। উভয়ের জীবনেই অনেক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছে। বহু ধ্যান-ধারণায় যোগনিদ্রাবিষ্ট হইয়া তপস্বীরা যাহা যাহা জানিতে পারেন, উঁহারা উভয়েই তাহা সাধারণ জাগ্রদবস্থায় বিনা চেষ্টায় ইচ্ছামাত্র অবগত হইতে পারিতেন। উভয়েই বাহিরের জগতে শত শত মানব-মানবীর মনের উপরে অসামান্য সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করিয়া

তাহাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া দিতে পারিতেন। বরদা নাগ আর বিবেকানন্দ এই ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্থল। গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া যতটুকু তত্ত্ব বা উপলব্ধি লাভ করা যায়, তাহা অপেক্ষা গুরুর নিকট শিক্ষা না করিয়া ঈশ্বরীয় প্রেরণার সহজ প্রকাশে যাহা আপনা আপনি অধিগত হয়, সেই অমূল্য উপলব্ধি-সম্পদে উভয়েই তুল্যরূপ সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু দেখ, প্রচার-ভঙ্গিমার পার্থক্য-হেতু এই দুই লোকোত্তর-চরিত সাধকের প্রভাব সমাজের উপরে কিরূপ পৃথকভাবে পতিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারীর জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলিই প্রাণপণ যত্নে প্রচারিত হইয়াছিল, ফলে তাঁর লৌকিক জীবনের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য জন-সমাজে সংক্রামিত হইতে পারিল না। আবার, পরমহংসের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি তাঁর জীবৎ-কালে প্রচারিত হইবার সুযোগই পায় নাই, ফলে তাঁর লৌকিক জীবনের মাধুর্য্য যেন অতি সহজে সম-সাময়িক সমাজের উপরে নিজের শ্রেষ্ঠ আসন সংরক্ষণ করিয়া লইল। আবার আরও লক্ষ্য কর যে, দেহাবসানের পরে শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীলোকের মত রজঃস্বলা হওয়া, হনুমানের মত লাঙ্গুলোদ্‌গম হওয়া প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনাগুলির আলোচনা যত বেশী উৎসাহের সহিত হইতে সুরু হইয়াছে, ততই যেন আবার নিকটতম প্রিয় মহাপুরুষটী মানব-মন হইতে একটু দূরে সরিয়া পড়িতেছেন।

সাধারণের জীবনে অলৌকিক ঘটনা

"আর একটী কথা। যাহাকে তোমরা অলৌকিক ঘটনা বলিয়া মনে করিয়া থাক, তদ্রূপ ঘটনা অত্যন্ত সাধারণ মানুষের জীবনেও দুই চারিটা ঘটিয়া থাকে। একটু উচ্চ স্তরের লোকের জীবনে হয়ত কিছু বেশী ঘটে। সাধারণ মানুষের জীবনে লৌকিক চরিত্রের দিক দিয়া সম্পদ থাকে স্বল্প, তারই জন্য তাহাদের জীবনের অলৌকিক ঘটনা প্রচার করিলে লোকে উপহাস করিতে পারে। প্রধানতঃ এই কারণেই সামান্য বক্তিদের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলি প্রচারিত হয় না। কিন্তু খুঁজিলে দেখিবে, জগতে সহস্র সহস্র সাধারণ লোকের জীবনেও অনেক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়া যাইতেছে।

রাজার বাড়ীতে ছেলে হইলে রাজ্যময় মহামহোৎসব লাগিয়া যায়, গরীবের বাড়ীতে ছেলে হইলে হয়ত কয়েক ঝাঁক উলুধ্বনি দিবারও লোক জোটে না। ব্যাপারটা এই রকমই জানিও। সুতরাং আমার জীবন সম্বন্ধে যদি কোনও অলৌকিক বিবরণ শুনিতে পাও, তাহা হইলে তাহা প্রচারের জন্য কণামাত্র শক্তিক্ষয় করিও না। আমি দৈনন্দিন মলমূত্র ত্যাগ করিলে তাহা যেমন তোমাদের মধ্যে উৎকটতম উৎসাহী ভক্তেরও প্রচারের বিষয় হয় না, অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কেও তদ্রূপ জানিও। এমন কি, নিজেরা যদি প্রত্যক্ষ এমন কিছু দর্শন বা অনুভবও কর, যাহাকে অলৌকিক ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া ভাবিতে তোমরা সমর্থ নহ, তবু জানিও, তাহাও প্রচার করিতে যাওয়া তোমাদের পক্ষে অসঙ্গত কাজ হইবে।

অলৌকিক কাহিনী প্রচারের কুফল

"যদি বল, অলৌকিক ঘটনা প্রচারের দ্বারা অপরের বিশ্বাস বর্দ্ধনে সহায়তা করা হইবে, তবে তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, কাহারও বিশ্বাস বর্দ্ধনের যদি প্রয়োজন থাকে এবং আমার যদি সত্যই কোনও অলৌকিক শক্তি থাকে, তাহা হইলে আমি কি নিজেই তাহাকে আমার অলৌকিক সামর্থ্য দ্বারা অভিভূত করিয়া বিশ্বাসী করিতে পারিতাম না? পরন্তু অলৌকিক ঘটনার প্রচারের দ্বারা তুমি তাহার বিশ্বাস বর্দ্ধনে সহায়তা না করিয়া অনেক স্থলে বিশ্বাস হননেরও ত উপলক্ষ ঘটাইতে পার! বিশেষতঃ একটী অলৌকিক সত্য ঘটনার প্রচারের দ্বারা শত শত অলৌকিক মিথ্যা কাহিনী প্রচারের এক উত্তেজনা জনসমাজে সৃষ্টি করা হয়। ইহা একটী মনস্তাত্ত্বিক সত্য। বিক্রমাদিত্য আর হারুণ-অল্-রসিদকে নিয়া যে এত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে, তার কারণ কি, চিন্তা করিয়া দেখিও। এত গল্পের প্রত্যেকটা কখনও সত্য হইতে পারে না! সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে অলৌকিক কাহিনী প্রচারে নিজেরা বিরত হওয়া এবং অপরকে বিরত করাই তোমাদের কর্ত্তব্য।"

গৌরাঙ্গ-ভক্তের শঙ্করাচার্য্য-নিন্দা অনুচিত

অদ্য অপরাহ্নে একটী শিক্ষিত বৈষ্ণব-মতাবলম্বী যুবক আসিয়া আচার্য্য শঙ্করের নিন্দা সুরু করিলেন। যুবকটী প্রথমে ভণিতা করিলেন যে, কিছুক্ষণ 'হরি-কথা' কহিবেন, কিন্তু আলোচনাকালে 'হরি' শব্দটী দুই একবারমাত্র উচ্চারিত হইল পরন্তু তিনি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় বিপুল বিক্রমে দার্শনিক মতামতের মহারণ্য লণ্ডভণ্ড করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন যে, শঙ্করাচার্য্য অতীব কপটী, তিনি বৌদ্ধমত মিথ্যা জানিয়াও বৌদ্ধ মতকেই প্রচ্ছন্নভাবে বেদান্ত মত বলিয়া চালাইয়া গিয়াছেন এবং ইহাতে জগতের লোক শতে সহস্রে নরকগামী হইতেছে।

যুবকটীর তথাকথিত 'হরি-কথা'-র অদম্য বেগ কিঞ্চিৎ উপশমিত হইবার পরে শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি বাছা দুই একবার নরক দর্শন ক'রে এসেছ?

যুবক বলিল,—মানে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নইলে তুমি জানলে কি ক'রে যে, বৌদ্ধমতাবলম্বীরা নরকেই যায়? আর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত যদি বেদান্ত ব'লে ব্যাখ্যাত হয়, তবে সেই মতাবলম্বীরাও নরকেই যায়? কেউ যদি স্বচক্ষে না দেখে আসে, তবে কি তার পক্ষে এত দৃঢ়তার সহিত এরূপ কথা বলা সম্ভব?

যুবকটী নিরুত্তর হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচার্য্য শঙ্কর যে কোন একটা মতবাদকে মিথ্যা ব'লে জেনেও সেই মতই জগতে প্রচার ক'রে গেলেন, তার কোনো প্রমাণ তোমার কাছে আছে?

যুবক কয়েকজন স্থানীয় খ্যাতনামা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারকের নামোল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাঁরা যে অভ্রান্ত, তার কোনো প্রমাণ তুমি দিতে পার?

যুবক নিরুত্তর হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ বাছা, পরের গায়ে কাদা ছুঁড়্‌তে গেলে নিজের গায়েই আগে লাগে। 'শঙ্কর কপটী' এই কথা যখনই বল্‌তে যাবে, তৎক্ষণাৎ একজন শঙ্করপন্থী তোমাকে শুনিয়ে দিতে পারেন যে, গৌরাঙ্গও কপটী। কারণ, তোমরাই ত' ব'লে থাক যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, জগৎকে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে ডুবিয়ে দিবেন।

"উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রীবৃদ্ধ বালক-যুবা সকলি ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে॥
জগৎ ডুবিল জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি পাঁচজনের * পরম উল্লাস॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবন॥
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুইতে নারিল॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন॥

* শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস।

কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা' সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার॥" †

—ফলে তিনি সন্ন্যাসী হলেন।

তোমরা ত' ব্যাখ্যা ক'রে থাক যে, কাউকে তিনি ছাড়্বেন না ব'লে কপট সন্ন্যাসী সাজ্লেল, মায়াবাদীর পোষাক নিলেন, বন্য হস্তী ধরবার জন্য যেমন পোষা হাতী দরকার, সেইরূপ তিনি মায়াবাদীদিগকে ভক্তিজালে বাঁধবার জন্য কপট সন্ন্যাসীর বেশে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কত্তে লাগলেন। এসব কথা তোমরাই ব'লে থাক। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস যে কপট সন্ন্যাস, তাঁর গৈরিক ধারণ যে একটা "রঙ্গ" মাত্র, খেলা মাত্র, একটা কৌশল বা ছল মাত্র, একথাত' তোমরাই ব'লে থাক। সুতরাং তোমাদের কখনও শঙ্করাচার্য্যকে কপটী ব'লে নিন্দা করা উচিত নয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ ছলনার জন্য নয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু আসল কথা এই যে, শঙ্করাচার্য্যও কপটী নন, শ্রীগৌরাঙ্গও কপটী নন। যে মতবাদ সত্য ব'লে জেনেছিলেন, শঙ্করাচার্য্য তাই প্রচার করেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও খেলার জিনিষ মনে ক'রে গেরুয়া পরেন নি। সন্ন্যাস জিনিষটী যে ছল-চাতুরীর জিনিষ নয়, তা বুঝবার মত বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স বা অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। বামন-অবতার বলিকে ছলনা করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কপট-নিদ্রা দ্বারা দুর্য্যোধনকে ছলনা করেছিলেন, এগুলি কোনও গৌরবের কথা নয়। শ্রীগৌরাঙ্গও মায়াবাদীগকে ছলনা কর্ব্বার জন্য সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, একথায় তাঁর গৌরব বাড়ে না। জগতে শ্রীগৌরাঙ্গের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা জীবন থেকে সকল প্রকারের ছলনা কপটতা দূর কর্ব্বার জন্য আমৃত্যু সাধন ক'রে গেছেন। আর, সকলের

---

† শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সেরা হয়ে তিনি নিজে ছলনার আশ্রয় নেবেন, এটা মোটেই শ্রদ্ধেয় বা সুন্দর কথা নয়। সুতরাং আমরা ব্যাখ্যা কত্তে বাধ্য যে, সন্ন্যাস গ্রহণকে তিনি লোক মজাবার জন্য নয়, নিজের প্রয়োজনেই গ্রহণ করেছিলেন।

মহাপুরুষদের জীবন-আলোচনা অপবাদবর্জ্জিত ভাবে করা উচিত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মহাপুরুষদের চরিত্র আলোচনার কালে সংস্কার বা গোঁড়ামির দ্বারা পরিচালিত না হ'য়ে আমাদের কর্ত্তব্য কিঞ্চিৎ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে তাঁদের জীবনকে দেখা। যে ভাবে তাঁদের জীবনের যে কার্য্যটীকে ব্যাখ্যা করলে তাঁদের জীবন অপবাদমুক্ত থাকবে, সেই ভাবে সেই কার্য্যটীকে দেখা। ছলনা, কপটতা, মিথ্যাচার, বাইরে একরকম উদ্দেশ্য দেখিয়ে ভিতরে অন্যরূপ উদ্দেশ্য পোষণ, এসব দোষ আমরা যেন পারতপক্ষে কোনও মহাপুরুষের উপরে আরোপ না করি। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা এমনই এক ভীষণ চীজ যে, আমরা নিজেদের গোঁ রাখ্‌বার জন্য কখনও নিজ নিজ প্রিয় মহাপুরুষকে কতকগুলি অপবাদ-সম্ভাবনায় নিয়ে ফেলি, অথবা অপর সম্প্রদায়ের মহাপুরুষকে বৃথাই কতকগুলি অপবাদ দেই। যেমন ধর, সাধু নাগ মহাশয়ের জীবনী লিখ্‌তে গিয়ে একজন লেখক বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর হেয়ত্ব-সূচক একটী কাহিনী লিখে বসেছেন, যে কাহিনী দু-চারটী সরল প্রাণ সাদা-সিধে লোক আর নিতান্ত পাগল ছাড়া অপরের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হবে। এই কর্দ্দম নিক্ষেপের চেষ্টা দ্বারা যে সাধক দুর্গাচরণ নাগকে কতটা খাটো করা হয়েছে, তা যদি লেখক বুঝতে পাত্তেন, তবে একাজে তিনি হাত দিতেন না। মহাপুরুষদের জীবন আমরা আলোচনা করি, কিন্তু তাঁদের জীবন আমরা আমাদের নিজেদের মাপ-কাটি দিয়ে মাপ্‌তে গিয়ে যে আমাদের জীবনেরই মতন ক'রে ফেলি, এদিকে আমরা লক্ষ্যই দেই না।

যুক্তি-তর্ক অপেক্ষা নামজপের শ্রেষ্ঠত্ব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার সঙ্গে যেটুকু আমার আলোচনা হওয়া উচিত ছিল, আশা করি, সেইটুকু হয়ে গেছে। এখন যাও, বাড়ী গিয়ে স্নান

ক'রে নিবিষ্ট চিত্তে ব'সে তোমার ইষ্টনাম প্রাণপণে জপ। মনপ্রাণ দিয়ে একবার ইষ্টনাম জপ্‌লে যে ফল হয়, শতবার দর্শন-শাস্ত্র পড়্‌লে সে ফল হয় না। বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যের প্রয়োগ মঙ্গলময়ের নাম জপনের ভিতরেই কর। যুক্তিতে আর তর্কে জীবনের মূল্যবান্ সময় বৃথা নষ্ট হ'তে দিও না।

অদ্য অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবা হাওড়ায় "স্ত্রী-শিল্প-শিক্ষায়তন" দেখিতে আসিয়াছেন। মেয়েদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইতে লাগিল।

বলিষ্ঠ আদর্শের পানে তাকাইয়া স্ত্রীশিক্ষা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এখনকার যে স্ত্রীশিক্ষা, তা সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার দিক্ দিয়েই হোক্, কি শিল্পাদি শিক্ষার দিক্ দিয়েই হোক্, প্রধানতঃ পরিচালিত হচ্ছে মাত্র পেটের ক্ষুধার তাগিদে। কোনো প্রকারে দুমুঠা ভাত জোগাড় করাই এর উদ্দেশ্য। অবশ্য, না খেয়ে মানুষ বাঁচে না। সুতরাং অন্নার্জ্জনের যোগ্যতা সঞ্চয় ত' কত্তেই হবে। কিন্তু তার সাথেও আর একটা মহৎ লক্ষ্য সম্মুখে রাখা চাই। সেইটী হচ্ছে বলদুর্দ্ধর্ষ বীর্য্য-বরীয়ান্ অমিত-শক্তিধর তেজস্বী এক মহাজাতির জন্মদান। আক্ষরিক শিক্ষা বা শৈল্পিক শিক্ষা যার যে দিক্ দিয়ে যেটুকুই হয় হোক্, সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্কল্পটীকে অনুক্ষণ সঞ্জীবিত ক'রে রাখার চেষ্টা চলা চাই যে, প্রত্যেকটী মেয়েকে এমন জীবন যাপন কত্তে হবে, এমন আদর্শের অনুধ্যান কত্তে হবে, যার ফলে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ভবিষ্যৎ জাতির ভিতরে তেজ, বল, বীর্য্য, সাহস, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও মনুষ্যত্ব বর্দ্ধিত হ'তে পারে। কুমারী হোক্, সধবা হোক্, বিধবা হোক্, স্বামি-সমাদৃতা হোক্, স্বামি-পরিত্যক্তা হোক্, ধনীর কন্যা হোক্, দরিদ্র-তনয়া হোক্, শিক্ষা-গ্রহণ-কালে প্রত্যেকের দৃষ্টি যেন একটী বলিষ্ঠ আদর্শের পানে প্রসারিত থাকে। সবাই নিজ নিজ দেহ মন-প্রাণকে যেন একটী বলিষ্ঠতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি কত্তে নিয়োজিত করে। চির-কৌমার্য্য গ্রহণ কালেও যেমন, স্বামীর ঔরস গর্ভে ধারণের কালেও তেমন, বৈধব্যের নিঃসঙ্গতা উদ্‌যাপনের কালেও তেমন, যেন স্ত্রীলোক মাত্রেই সর্ব্বক্ষণ নিজেদের ভাবদৃষ্টি সমগ্র জাতির সমগ্র দেশের ভবিষ্যতের এক অত্যুন্নত মহিমার সঙ্গে যুক্ত ক'রে রাখে।

ভগবান্ নিত্যকালের স্বামী

শালকিয়ার একটী স্বামি-পরিত্যক্তা মহিলা বড় দুঃখে জীবন কাটাইতেছেন। তিনিও এই শিল্প-শিক্ষায়তনে আয়প্রদ শিল্প শিক্ষা করিতেছেন। দরিদ্র বলিয়া অর্থব্যয় করিয়া তিনি বংশগুরুর নিকট দীক্ষা লইতে পারিতেছেন না। সুতরাং তিনি একান্ত শরণাগত হইয়া পড়িলে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ করিলেন,—তোমার পার্থিব জগতের স্বামী তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু নিখিল ভুবনের স্বামী চিরকালই তোমার রয়েছেন। তিনি তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করেন নি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তিনি তোমার সাথে সাথে ছিলেন, এখনও তোমার সাথে আছেন, ভবিষ্যতেও অনন্ত-কোটিকল্পকাল তোমার প্রাণের প্রাণ হ'য়ে তোমার সাথে সাথে থাকবেন। তিনি দু'দিনের স্বামী নন, তিনি নিত্যকালের স্বামী। হৃৎস্পন্দনে, শ্বাসে প্রশ্বাসে, অনাহদ নাদ-ধ্বনিতে অবিরাম তাঁর প্রেমদ সুখদ শান্তিদ সঙ্গ অনুভব কত্তে থাক।

স্বামিপরিত্যক্তা সধবার প্রকৃত সান্ত্বনা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংসারের যে স্বামী বিবাহের অভিনয় ক'রে অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই কর্ব্বার জন্য স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে সংসারের মায়াকাননে মজা লুঠ্‌বার লালসায় নিজের মনোমত সুখের কুঞ্জ বেছে নিয়েছে, তার প্রতি তুমি বিদ্বিষ্টা হয়ো না। তার প্রতি তুমি কৃতজ্ঞ হও। কারণ, সে তার কদর্য্য পার্থিব উন্মত্ত লীলায় জোর ক'রে তোমাকে সঙ্গিনী করেনি। সে তোমাকে সংযত, সুন্দর, ব্রহ্মচর্য্যময় জীবন যাপনের সুযোগ দিয়েছে। এই ব্রহ্মচর্য্যের সুযোগকে তুমি দুর্য্যোগ বা দুর্ভাগ্য ব'লে মনে ক'রো না। নিজেকে তুমি কুমারী বা ব্রহ্মচারিণী ব'লে জ্ঞান কর এবং স্বামীর প্রতি যে কোমল চিত্ত-ভাব নারীমাত্রেরই থাকে, সেই চিত্ত-ভাব শ্রীভগবানকে উপঢৌকন দাও।

ভগবান্ কত গভীর প্রেমিক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পার্থক্যটা একবার লক্ষ্য ক'রে দেখ যে, ভগবান্

তোমার কত প্রেমিক। সংসারের প্রেমাস্পদটী শরীরের বাইরে থাকে, প্রেমিক ভগবান্ তোমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রতি অঙ্গে, প্রতি প্রত্যঙ্গে, প্রতি অণুতে, প্রতি রেণুতে, তোমার শ্বাসে, তোমার প্রশ্বাসে, তোমার হৃদয়ে, মনে, প্রাণে সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ তাঁর পরম-লোভনীয় প্রেমসুমধুর স্পর্শ দিচ্ছেন। প্রেমিক-শিরোমণি শ্রীভগবানের সেই গভীরাৎ গভীর নিবিড়াৎ নিবিড় অতুল অপূর্ব্ব প্রেমরসে না ডুবে যাও। অতীত জীবন ভুলে যাও, বিবাহের কথা ভুলে যাও, নিজ অসহায়তা ভুলে যাও, চিত্তের গ্লানি ভুলে যাও, দীর্ঘদিন-সঞ্চিত ব্যথা, বেদনা, দীর্ঘশ্বাস সব ভুলে শুধু মনে রাখ, তুমি শ্রীভগবানের, শ্রীভগবান্ তোমার।

রঘুনাথপুর, ২৪ পরগণা
২২শে চৈত্র, ১৩৩৮

শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার মণ্ডল শ্রীশ্রীবাবার এক প্রিয় সন্তান। কর্ম্মিরূপে তিনি রহিমপুর আশ্রমে কয়েক মাস অবস্থানও করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার একান্ত আগ্রহে শ্রীশ্রীবাবা গতকল্য সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় রঘুনাথপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

কে হিন্দু কে মুসলমান ?

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা বিবিপুরের ফকীরের স্থান দেখিতে চলিলেন। ফকীর সাহেব শ্রীশ্রীবাবাকে বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। নারিকেল গাছ হইতে ডাব পাড়া হইল, শ্রীশ্রীবাবা এবং মণ্ডল বাবুদের বাড়ীর যাঁহারা যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ফকীর সাহেবের আগ্রহাতিশয্যে একটী করিয়া ডাব খাইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—কও দেখিরে মন আমারে, কে হিন্দু, কে মুসলমান ?

নির্ম্মল কর প্রাণ

অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার সময়ে রঘুনাথপুর মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীবাবা একটী সুমধুর বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বক্তৃতান্তে আবৃত্তি করিলেন,—

উন্নত হও, উজ্জ্বল হও,
নির্ম্মল কর প্রাণ,
একদিন এ'যে জগতের তরে
দিতে হবে বলিদান।

সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত মহানন্দ মণ্ডল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল ও শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎ সহ শ্রীশ্রীবাবা একখানা নৌকাযোগে বসিরহাট পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিলেন। ফিরিতে ফিরিতে রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকা হইল।

কলিকাতা
২৩শে চৈত্র, ১৩৩৮

বেলা সাড়ে বারোটায় শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতা পৌছিলেন। অদ্যই রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায় ময়মনসিংহ রওনা হইবেন। সুতরাং কলিকাতা আসিয়াই তিনি প্রথমে জিনিষ-পত্র গুছাইতে লাগিলেন।

গ্রহ-নক্ষত্রের-পূজা ছাড়িয়া ভগবানের পূজা কর

একজন সরলপ্রাণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলিলেন,—আজ একে মঙ্গলবার, তাতে অমাবস্যা, আজকের দিনে যাত্রা করবেন স্বামীজী ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পণ্ডিতজী, গ্রহনক্ষত্রের ত' ভয় কচ্ছেন ? তারা আবার না কোনো বিপদ ক'রে বসেন ! কেমন, এই না ?

পণ্ডিতজী সম্মতি জানাইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গ্রহ-নক্ষত্রেরা ত আর নিজেদের ইচ্ছায় আপনার ইচ্ছানিষ্ট কত্তে পারে না ! তারা আবার আর একজনের হুকুম নিয়ে সব করে। তারই জন্য একই যাত্রায় পৃথক্ ফল দিতে বাধ্য হয়। কেমন, তাই না ?

পণ্ডিতজী সম্মতি জানাইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাই যদি হয়, তবে চাকর-বাকরের অনুগ্রহ বিগ্রহের দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে মনিবের অনুগ্রহের দিকে তাকিয়ে চলাই ত' ভাল। কেমন, তাই নয় কি ?

পণ্ডিতজী বলিলেন,—আমরা আর ভগবানের নাগাল কোথায় পাই বলুন। এইজন্যই মনিব ছেড়ে গোলামের খোষামুদি কত্তে হয়।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—গোলামেরই বা নাগাল পাচ্ছেন কোথায়? গ্রহ-নক্ষত্রগুলি ত আপনার কাছ থেকে ঢের দূরে রয়েছে।

পণ্ডিতজী বলিলেন,—তবু চর্ম্মচক্ষে দেখতে পাই।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাই কি? সবগুলি গ্রহ-নক্ষত্রকে দেখতে পান কি?

পণ্ডিতজী বলিলেন,—তা না দেখতে পেলেও গণিতের হিসাবে ধরতে পাই।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—তাই যদি হয়, তবে আসুন না, আমাদের হিসাবের বিদ্যাকে আরো একটু শানিয়ে নিয়ে খোদ ভগবানকে ধরবার চেষ্টা করি না কেন। চিরকাল শুধু গোলামের পূজা ক'রে কি লাভ হবে, একবার মনিবের পূজা করি। আসুন, আমরা ভগবানকেই ধ্রুবতারা করি, তাঁর দিকেই লক্ষ্য দেই, আকাশের জড়-পিণ্ডগুলির দিকে নাই বা আর তাকালাম। নবগ্রহের পূজার জন্য কত মন্দিরই না হয়েছে, আর কত ভেটই না আমরা সেখানে দিয়েছি, কত প্রণামই না করেছি। আসুন না একবার তাঁদের কথা বিস্মৃত হয়ে স্বয়ং ভগবানকে একবার মানি, তাঁকে একবার ভেট দেই, তাঁকে একবার প্রণাম করি।

গ্রহ-নক্ষত্র ধ্বংসশীল ; ভগবান্ শাশ্বত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গ্রহ-নক্ষত্রগুলির স্থায়িত্ব কয়দিনের? গ্রহের রাজা সূর্য্য, তার যে দিন দিন কি দুর্দ্দশা হচ্ছে, তা কি কখনো ভেবে দেখেছেন? প্রত্যহ সে তাপ দিচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে শক্তিক্ষয়জনিত দৌর্ব্বল্যে ছোট হ'য়ে যাচ্ছে। হিসাবী পণ্ডিতেরা বল্‌ছেন যে, বছরে তার পরিধি আশী হাত ক'রে কমে যাচ্ছে। যে ভাবে তার বাৎসরিক ক্ষয় হচ্ছে, তাতে আজ সে যত বড় আছে, পঞ্চাশ লক্ষ বছর পরে সে তার আট ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে একদিন সে দীপ্তিহীন, প্রভাহীন, শক্তিহীন হবে। এ শুধু

অনুমানের কথা নয়। আকাশ খুঁজে খুঁজে এই রকম নির্ব্বাপিত সূর্য্য দুই একটা পাওয়াও গিয়েছে। এখন ভেবে দেখুন, এই সৃষ্ট জগতের যত গ্রহ আর যত নক্ষত্র, সকলের গতি ঐ এক। সকলেই পলে পলে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর ভগবান? তাঁর সৃষ্টিও নেই, লয়ও নেই। তিনি নিত্যকাল আছেন, নিত্যকাল থাকবেন। সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রসন্নতার দিকে না তাকিয়ে, সেই শাশ্বত সনাতনের প্রসন্নতার দিকে তাকানই কি উচিত নয়?

পঞ্জিকা কতটুকু মানা উচিত?

পণ্ডিতজী যুক্তিগুলি মানিয়া লইলেন কিন্তু চিরকালের সংস্কারের গায়ে একটু খোঁচা লাগিল বলিয়া যেন ব্যথিতও হইলেন। তিনি বলিলেন,—তা হ'লে আর পঞ্জিকা-প্রকাশের প্রয়োজন নেই?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— আছে বৈ কি? কোন্ দিন কোন্ তিথি, সে কথা লোকের জান্‌বার প্রয়োজন আছে। কবে যাত্রার দিন আছে, তা জানবার জন্য নয়, পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে লোকের শারীর-স্বাস্থ্যের তারতম্য ঘটে। তাই তার সঙ্গে মিল রেখে চল্‌বার জন্য তিথি জানবার প্রয়োজন। ভগবানের কাজে যেদিন মন চলে, মানুষ সেদিনই যাত্রা কর্ব্বে,, কিন্তু নিভৃত সাধনের জন্য অমাবস্যা আর সমবেত উৎসবের জন্য পূর্ণিমাকে বেছে নেবে। দীক্ষা মানুষ যে কোনো দিন নিতে পার্ব্বে. কিন্তু উৎসবটীকে মর্য্যাদা ও সুষমাসম্পন্ন কর্ব্বার জন্য বিবাহ, অন্নারম্ভ প্রভৃতি পূর্ণিমার দিনই হবে। জন্ম বা মৃত্যু মানুষের যে দিনে যে ক্ষণেই হোক, তাকেই পবিত্র ব'লে মেনে নিতে হবে, কারণ, স্বয়ং ভগবান্ নিজে বিচার ক'রে এই দিনটী বা ক্ষণটী নির্দ্ধারণ ক'রে দিয়েছেন। বীজবপন, বৃক্ষরোপণ, ধান্যচ্ছেদন প্রভৃতি আকাশের অবস্থা দেখে হবে, পঞ্জিকার তিথি দেখে নয়। নববস্ত্রপরিধান হবে প্রয়োজন দেখে, জলাশয়ারম্ভ হবে আকাশ দেখে, ক্রয়-বিক্রয় বিপণ্যারম্ভ হবে মূলধন, আত্ম-প্রস্তুতি ও বাজারের অবস্থা দেখে। স্ত্রীসম্ভোগের বেলা অবশ্য বার-তিথি মান্‌তেই হবে,— কারণ, তার দ্বারা সংযম-পালনের সহায়তা হয়। রবিবার,

বৃহস্পতিবার, জন্মবার, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী,—এই কয়টী বিশেষ দিনে স্বামি-স্ত্রীর মৈথুন-মিলন বন্ধ রাখতে হবে।

পঞ্জিকায় কি কি থাকা উচিত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শুধু তিথি-নক্ষত্র দিয়ে আর কতকগুলি বিধি দিয়ে বা নিষেধ ক'রে ছাপিয়ে দিলেই পঞ্জিকা হ'ল না। অথবা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী, মুসলমান মহাপুরুষদের আবির্ভাব-তিরোভাবের সংবাদটুকু দিলেও হ'ল না। কোন্ তিথিতে কংসারি কৃষ্ণের মত মহাপুরুষ জন্মেছিলেন, কোন্ তিথিতে মহাদেবী দুর্গা মহিষাসুরকে মর্দ্দন করেছিলেন, তা দিলেও হ'ল না। এগুলি ত' চাই-ই, পরন্তু কোন্ তিথিতে ভীষ্ম চির-কৌমার ব্রত নিয়েছিলেন, কোন্ তিথিতে অর্জ্জুন উর্ব্বশী-প্রত্যাখ্যান করে-ছিলেন, কোন্ তিথিতে সীতা ও লক্ষ্মণ বনবাসে রামের অনুগমন করেছিলেন, কোন্ তিথিতে ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা মাথায় নিয়ে অযোধ্যা-শাসন সুরু করেছিলেন, কোন্ তিথিতে দধীচি অস্থিদান করেছিলেন, কর্ণ অতিথির জন্য প্রাণপ্রিয় পুত্র বৃষকেতুকে বধ করেছিলেন, পুরু পিতার জন্য যৌবন-সুখ-ত্যাগী হয়েছিলেন, একলব্য গুরুর জন্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে দিয়েছিলেন, উতঙ্ক গুরুপত্নীর অন্যায় অনুরোধ কৌশলে এড়িয়েছিলেন, শিবি শরণাগতের জন্য নিজ অস্থিমাংস কেটে দিয়েছিলেন,—যত্ন-ক'রে খুঁজে বের ক'রে সে সবও পঞ্জিকার অন্তর্ভুক্ত কত্তে হবে। শুধু তাই নয়, ভারতের পঞ্জিকায় আরো থাকা উচিত যে, সঙ্ঘমিত্রা কোন্ তিথিতে সিংহল যাত্রা করেন কোন্ তিথিতে বাংলার জনগণ রাজা গোপালকে নির্ব্বাচিত করেন, কোন তিথিতে রাজা দাহিরের পত্নী, রাজা জয়পাল, রাণী পদ্মিনী ও সংযুক্তা হাস্তে হাস্তে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন, কোন্ তিথিতে রাণা প্রতাপ তৃণ-শয্যার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। পঞ্জিকায় থাকা উচিত, কোন্ তিথিতে শিবাজী মুল্লা আহমদের পুত্রবধূকে অমর্য্যাদা না ক'রে মাতৃবৎ সম্মানসহকারে তার শ্বশুরের কাছে পাঠিয়ে দেন, কোন্ তিথিতে মীর মদন আর মোহনলাল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন, কোন্ তিথিতে টিপু সুলতান্ মৃত্যু বরণ করেন, কোন্ তিথিতে "বন্দেমাতরম্"

প্রথম উচ্চারিত হয়। পঞ্জিকাকে যদি লাভজনক ও লোভনীয় বস্তুতে পরিণত কত্তে হয়, তবে এই ভাবে তাকে সম্পাদিত কত্তে হবে। নতুবা শুধু হাঁচি-টিকটিকির জুজুর-ভয় দেখিয়ে পঞ্জিকা প্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না, জান্‌বেন।

ময়মনসিংহ
২৪শে চৈত্র, ১৩৩৮

পল্লী-সেবা না আত্মোন্নয়ন ?

অপরাহ্নে দুই ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা ময়মনসিংহ পৌঁছিয়াছেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ব্রহ্মপুত্র-তীরে ভ্রমণ করিতেছেন।

এসময়ে পল্লী-সেবার কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কথাটাকে পল্লীসেবা না ব'লে আত্মোন্নয়ন বলা উচিত। পল্লীকে সেবা দিতে গিয়ে পল্লীকে নিজে থেকে একটা পৃথক্ সত্তা ব'লে গ্রহণ কল্লে যেন কতকটা অনুগ্রহ করার ভাব এসে যায়। তাই পল্লীকে নিজেরই একটা পৃথক প্রকাশ ব'লে জ্ঞান করা উচিত। ফলে, পল্লীউন্নয়ন আর আত্মোন্নয়ন সমার্থবাচক হবে।

প্রত্যেকটী কার্য্যকে তপস্যার পর্য্যায়ে উন্নীত কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে কাজই কর, তাকে বোধ-কৌশলের বলে তপস্যার পর্য্যায়ে উন্নীত ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। এখন ওটী আহারই হোক, বিদ্যাদানই হোক, বিদ্যার্জ্জনই হোক, বলার্জ্জনই হোক, অর্থার্জ্জনই হোক, অন্নবিতরণই হোক, বুদ্ধিদানই হোক্। শাদা চখে কাজটী দেখতে যাই হোক, শাদা কাণে তার বিবরণ শুন্‌তে যাই হোক, তাকে তপস্যার একটী রূপান্তরে পরিণত ক'রে নিতে হবে। অভ্যাসের বলে একজন গৃহস্থ পুরুষ বা নারী নিজ সন্তানোৎপাদন-চেষ্টাকে পর্য্যন্ত তপস্যার পর্য্যায়ে নিয়ে ফেল্‌তে পারে। বাইরের লোক তার আচরণকে সাধারণ জৈব-ভাব-প্রণোদিত প্রাকৃত ব্যবহার ছাড়া আর কিছু বল্‌বে না বা বল্‌তে পারে না সত্য, কিন্তু ভাব-ভঙ্গীর দ্বারা সে তার প্রত্যেকটী কার্য্যকে তপস্যায় পরিণত ক'রে নিতে পারে।

সাধারণ কার্য্য যোগাঙ্গ হওয়ার দৃষ্টান্ত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যেমন ধর, তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস। অবিরাম টান্‌ছ, আর ছাড়ছ। এটা শুধুই জীবন-রক্ষার স্বাভাবিক প্রয়াস মাত্র। এর বেশী কৌলীন্য এর নেই। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসকে নামজপের সহায়ক বা উপায়রূপে যখনি গ্রহণ কর্লে, অমনি এই নিতান্ত শারীরিক ব্যাপারটী হয়ে দাঁড়াল যোগাঙ্গ-বিশেষ। পথ দিয়ে তালে তালে পা ফেলে চলে যাচ্ছ। এই পা ফেলাটী নিতান্তই একটা যান্ত্রিক ব্যাপার মাত্র। কিন্তু যেই তুমি পা ফেল্‌বার তালে তালে ভগবানের অমৃতময় নামজপ সুরু কর্‌লে, অমনি ঐ যান্ত্রিক ব্যাপারটাই হ'য়ে দাঁড়াল একটা যোগাঙ্গ।

তপস্যার সংজ্ঞা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তপস্যা কাকে বলে? হয় চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদনার্থ নতুবা অপরের হিতার্থ কোনও শৃঙ্খলাকে, কোনও ক্লেশকে, কোনও সংযম-শাসনকে মেনে চলবার চেষ্টা করা। কিন্তু চিত্তের নির্ম্মলতাই তপস্যার প্রথম কথা ; অপরের হিত-সম্পাদন পরের কথা। কারণ, চিত্তের নির্ম্মলতা রক্ষিত না হ'লে হিত কত্তে গিয়ে অহিত করা হ'য়ে যায়। কিন্তু নির্ম্মলতা রক্ষিত হ'লে কিছু না কত্তে গেলেও আপনা-আপনি অপরের কিছু না কিছু হিত সাধিত হ'য়ে যায়।

বুদ্ধি-প্রাখর্য্য ও তপঃপ্রতিভা

এইরূপ নানাবিধ হিতকর বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যা সমাগত হইলে পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শেষ কথা এই মনে রেখো যে, বুদ্ধির প্রাখর্য্য একটা জাতিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা কর্‌বেনা, কর্‌বে তপঃ-প্রতিভা। যেখানে বুদ্ধি-প্রাখর্য্য আছে কিন্তু তপঃ-প্রতিভা নেই, সেখানে বাঁচবার আশা কম। যেখানে বুদ্ধি-প্রাখর্য্য নেই, কিন্তু তপঃ-প্রতিভা আছে, সেখানে বাঁচবার আশা যথেষ্ট। যেখানে বুদ্ধি-প্রাখর্য্যও আছে, তপঃ-প্রতিভাও আছে, সেখানে শুধু বাঁচবার আশা আছে শতকরা একশ এক ভাই

নয়, পরন্তু বাঁচার মত বাঁচা, মানুষের মত বাঁচা, সার্থক বাঁচন বাঁচা একমাত্র সেখানেই সম্ভব।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বিষয়টী পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লইবার জন্য প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যা বলা হ'ল তার মানে এই যে, বুদ্ধিবৃত্তির প্রখর দীপ্তি যদি তোমার ভিতরে থেকে থাকে, দ্রুত তাকে শৃঙ্খলিত কর, শত দিকে শত মুখে বিকীরিত হ'তে না দিয়ে একটী মুখে কেন্দ্রীকৃত কর, তাকে তপঃসাধনার অধীন কর। বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা যদি তোমার না থাকে, তবু হাল ছেড়ো না, তপঃশক্তির ওপরে নির্ভর কর এবং একনিষ্ঠার বলে আত্মবিজয় ও বিশ্ববিজয় কর। আর বুদ্ধিবৃত্তি এবং তপোমুখতা উভয়ই যদি তোমার থাকে, তবে তপস্যাকে বুদ্ধির মুখরতার অধীন না ক'রে, বুদ্ধিরূপ চপলা যুবতী নব-বধূকে 'তপস্যারূপ পাকা গিন্নীর শাসনাধীন ক'রে তপস্যার কর্তৃত্বে সংসার-চালনা কর। এতেই বৃদ্ধি, এতেই ঋদ্ধি।

ময়মনসিংহ

২৫শে চৈত্র, ১৩৩৮

এই সময়ে শ্রীশ্রীবাবার একটী বিধবা দিদি আছেন। তিনি শ্রীশ্রীবাবার বয়োজ্যেষ্ঠা। অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া বংশগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ময়মনসিংহে যে সকল মহাপুরুষেরা যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের কাছেই দীক্ষিতা হইবার ইনি চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কিছু কিছু ব্যয় সর্ব্বত্রই আবশ্যক হয় বলিয়া ইঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু বিগত ১৩৩২ সালে রুগ্নাবস্থায় যখন শ্রীশ্রীবাবা ময়মনসিংহ ছিলেন, তখন শ্রীশ্রীবাবার পরমপূজনীয়া জননী-দেবীর নিকট ইঁনি শরণাপন্ন হন। মাতার আদেশে শ্রীশ্রীবাবা তাঁর এই দিদিকে দীক্ষা প্রদান করেন। সেই দিদির সঙ্গে কথা হইতেছে।

স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য দাও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেন তোমরা প্রতিক্ষণ শুধু এই কথাটাই স্মরণ কচ্ছ যে, তোমরা স্ত্রীলোক? কথায়, চিন্তায়, হাবভাবে, ব্যবহারে অবিরাম তোমরা

কেবলই কেন স্মরণ রাখ্‌তে চেষ্টা কচ্ছ, তোমরা নারী, পুরুষদের সঙ্গে তোমাদের আকাশ-পাতাল তফাৎ, তোমাদের কার্য্য আলাদা, ভাগ্য আলাদা, দেহের গঠন আলাদা? কেন তোমরা অবিরাম ধ্যান জমাও না, যে, তোমাদের স্বরূপ আর পুরুষের স্বরূপ আলাদা নয়; একই ব্যক্তি দুইবার দুইরকমের জামা গায়ে দিলে যেমন তার স্বরূপের বদল হয় না, একই পুস্তকের দুই রকমের মলাট থাকলে যেমন বস্তুর পার্থক্য ঘটেনা। খোসাটার দিকে দৃষ্টি কমিয়ে বস্তুটার দিকে লক্ষ্য রাখ। তুমি নারী নও, তুমি পুরুষ নও, তুমি নারীত্ব ও পুরুষত্বের অতীত পরম সত্তা।

গুরু ও শিষ্যের অভিন্নত্ব

অপরাহ্নে দুইটী যুবকের সহিত শ্রীশ্রীবাবা ব্রহ্মপুত্র-তীরে ভ্রমণে বাহির হইলেন। তন্মধ্যে একটী যুবক এখানকার প্রবাসী। তিনি তরুণ বাল্যেই শ্রীবাবার কৃপা পাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে বলিলেন,—আমার সংস্পর্শের প্রভাব যদি আমৃত্যু তোর উপরে না থাকে, তবে আমার সংস্পর্শই মিথ্যা। চেষ্টা ক'রে তুই কি ক'রে দূরে পালিয়ে থাকৃবি? আমার অকপট কল্যাণ-বুদ্ধি তোকে আমাকে অবিচ্ছেদ্য ক'রে রেখেছে যে! গুরু আর শিষ্য দেখ্‌তে দুই, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে একটা অভিন্ন বস্তু!

দীক্ষার বয়স

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—দীক্ষা কোন্ বয়সে নেওয়া ভাল?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষা অল্প বয়সেই নেওয়া ভাল। আবাল্য-সম্বর্দ্ধিত অভ্যাস মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুদৃঢ় থাকে; তার প্রভাব সুদূর-প্রসারী হয়। সংসারের কাম-কলুষে ডুবে গেলে তার পরে মনকে ভগবানে বসান বড় আয়াসসাধ্য হয়। এজন্যই প্রাচীনকালে আট বছর বয়সেই যজ্ঞোপবীত-সংস্কার হ'ত এবং জগতের কঠিনতম মন্ত্র গায়ত্রীতে তপঃ-সাধনা সুরু হ'ত।

নানা কথা বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গত রহিমপুর উৎসবে একটী বাণী বড় বড় হরফে লিখে টানিয়ে দেওয়া হয়েছিল,—

"বাল্য ব'লে বয়সেরে উপেক্ষা করো না।
বাল্যেই করিতে হবে ব্রহ্মের সাধনা।"

তবে একটী কথা আছে। বুদ্ধিবৃত্তি যার একান্ত স্থূল, তার বুদ্ধিবিকাশের উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা সঙ্গত।

অল্প বয়সে দীক্ষার কুফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অল্প বয়সে দীক্ষা নেওয়ার একটী মন্দ দিক্‌ও আছে। সেইটী হচ্ছে এই যে, সম্পূর্ণরূপে না বুঝে এই সময়ে দীক্ষা নিতে হয়। ফলে, যখন বয়সের পূর্ণ বিকাশে জগতের দশদিকে দশ রকম মতামতের সংঘর্ষে এসে প্রাপ্ত সাধনে অবিশ্বাস জন্মে, তখন সেই অবিশ্বাসের জ্বালা বড়ই অসহনীয় হয়।

বাল্যে প্রাপ্ত সাধনে নিষ্ঠা-বর্দ্ধনের আবশ্যকতা

একজন প্রশ্ন করিলেন,—এর প্রতীকার কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এর প্রতীকার একেবারে মূলে, ডালে নয়, ফুলে নয়। অর্থাৎ প্রাপ্ত সাধন যে আবাল্য নিষ্ঠাপূর্ব্বক কর্ব্বার অভ্যাস ক'রে যাবে, সে ত' অল্প হোক্, বেশী হোক্, আনন্দ, তৃপ্তি ও আরাম এ'র ভিতরে পাবেই পাবে। সে আস্বাদ একেবারে প্রত্যক্ষ বস্তু, যুক্তি-নিরপেক্ষ, তর্ক-নিরপেক্ষ, বিচার-নিরপেক্ষ। সুতরাং কণামাত্রও আস্বাদন যে লাভ করেছে, তার আর কোনো ভয়ই নেই। সহস্র মতামতের সংঘর্ষও তাকে বিচ্যুত কত্তে পারে না। চঞ্চল যদি করে, তবে তাও নিতান্তই সাময়িক।

গুরুর গুরুশ্রম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এইজন্যই আমার পরিশ্রম এত বেশী। সকল আচার্য্যেরা বয়স্ক ব্যক্তিদের সাধন দেন, যারা সংসারের অনেক দুঃখ পেয়ে সাধনের আবশ্যকতা অনুভব ক'রে বিশ্বাস নিয়ে এসেছে শান্তির আশায়। আর আমার অবস্থা তার বিপরীত। জগৎ কখনো জান্‌বে না, এক একটী ছেলের পশ্চাতে আমাকে কত রক্ত জল কত্তে হয়েছে। একটী ছেলে বিপথে গেল ত্রিপুরায়, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলাম বাঁকুড়া থেকে, কতকটা রেলে, কতকটা হেঁটে,

খেয়ে আর না-খেয়ে। এ'ত গেল স্থূলতম শ্রম। তারপরে বাপ্ চিঠির চোট্। এমন ছেলে আমার একটীও নেই, যার পিছনে পাঁচ সাত টাকার ডাকটিকিট না খরচ হয়েছে। কিন্তু এটাও স্থূল শ্রম। তারপরে এল মানসিক শ্রম। যে ছেলে যখন চঞ্চল হচ্ছে, তখনি তার দিকে অবিরাম শুভ সঙ্কল্পকে তীব্র তেজে চালনা ক'রে ক'রে শরীরখানা কত ক্লান্ত কত শ্রান্ত হ'য়ে পরে, তোমরা তার খবর জান না। শ্রমের ভার এই জড় শরীর বইতে অক্ষম হয়। যৌবনের উদ্দাম উন্মাদনায় যুবকেরা যাবে ভোগের উচ্ছৃঙ্খল পথে, আর সঙ্কল্পের শাসনে তাদের অজ্ঞাতসারে আমি রাখব তাদিগকে আদর্শের সঙ্গে দৃঢ়রূপে বেঁধে, এই যে লড়াই, তা' তাঁদের কত্তে হয় না, যাঁরা পরিণতবয়স্কদের জন্য এসেছেন। কারণ, পরিণত বয়স্কেরা সদ্‌যুক্তি বোঝে। অতীত অভ্যাসই তাদের প্রধান বিঘ্ন, কিন্তু যুক্তির অঙ্কুশতাড়নে মদমত্ত মনকে বাঁধবার প্রয়োজনীয়তা-বোধ তাদের আছে। যুবকের সে বোধ নেই। বুঝাতে গেলেও বোঝেনা। কারণ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'তে সে বঞ্চিত।

ময়মনসিংহ

২৬শে চৈত্র, ১৩৩৮

ভক্তির অনলে স্বার্থপরতার ধ্বংসসাধন

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা রহিমপুরের জনৈকা ভক্তিমতী মহিলার নিকটে পত্র লিখিলেন,—

"স্নেহের মা, * * * মনুষ্য-জীবন সংগ্রামময় জীবন, সুখদুঃখের অসংখ্য সংঘাতে ইহা পূর্ণ। এই অফুরন্ত দ্বন্দ্ব-কোলাহলের মধ্যে হৃদয়ের বল অটুট অক্ষত রাখিবার একমাত্র পন্থা শ্রীভগবানের অমৃতময় নাম। সহস্র অশান্তির মধ্যেও নামই অন্তরে শান্তির মলয়-হিল্লোল প্রবাহিত করে, দগ্ধ হৃদয়ে স্নিগ্ধ চন্দন-প্রলেপ মাখিয়া দেয়। তাঁর নামকেই তাঁর সত্য রূপ জানিয়া, তাঁর নামকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ বিভূতি জানিয়া, তাঁর নামকেই তাঁর সাক্ষাৎ বিগ্রহ জানিয়া মনে প্রাণে এই নামের সেবায়ই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করিয়া দাও মা, নামের সুধা-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া অমরত্ব লাভ কর।

"সংসারের কর্ত্তব্য তোমাকে পিছন হইতে আহ্বান করিবে। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা হইতে বিরত হইতে তোমাকে বলিবনা, কিন্তু মা, নিঃস্পৃহ নিষ্কাম চিত্তে সংসারের সহস্র খুঁটিনাটি কর্ত্তব্য শরীর দিয়া সম্পাদন করিয়া যাও, মনকে নিয়ত লাগাইয়া রাখ শ্রীভগবানের পরমানন্দঘন স্নেহোজ্জ্বল মূরতির অর্চ্চনায়। ভক্তির আরতি লাগাও, নিজের প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন সকল স্বার্থ-লোলুপতাকে ধূন্‌চির আগুনে জীয়ন্তে দগ্ধিয়া মার।"

যথার্থ মহাপুরুষের অলৌকিক শক্তিলাভ

অপরাহ্নে প্রায় সাত আট জন স্কুল-কলেজের ছাত্র শ্রীশ্রীবাবার সহিত ব্রহ্মপুত্র তীরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। একজন শ্রীশ্রীবাবাকে মহাপুরুষদের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিল।

শ্রীশ্রী বাবা বলিলেন,—সত্যিকারের মহাপুরুষেরা অলৌকিক শক্তিলাভের জন্য কোনও সাধনা করেন না। তাঁরা তাঁদের প্রাণের পরমারাধ্যকে নিয়েই অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে ভগবানের ইচ্ছায় আপনা-আপনি যদি কোনও অলৌকিক শক্তি এল ত' এল, কিম্বা গেল ত' গেল।

মহাপুরুষদের অলৌকিক শক্তির অপ্রয়োগ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মহাপুরুষেরা অনেক সময়ে টেরও পান না যে, কোনও অলৌকিক শক্তির উন্মেষ তাঁদের ভিতর হয়েছে। কস্তূরী-মৃগ যেমন টের পায় না যে, তার নাভিতে অপূর্ব্বসুগন্ধময় কস্তূরীর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যদি টেরও পান, তবু যথার্থ মহাপুরুষেরা নিজেদের অলৌকিক শক্তি কোথাও প্রয়োগ করার জন্য কোনও চেষ্টা বা সঙ্কল্প করেন না। আপনি যদি শক্তির প্রয়োগ কোথাও ঘটে গেল ত' গেল, না ঘট্‌লে না ঘটল।

অলৌকিক শক্তিলাভের চেষ্টা ও মহাপুরুষত্বলাভ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অলৌকিক শক্তিলাভের জন্য যাঁরা চেষ্টা করেন, তাঁরা কখনো মহাপুরুষ হ'তে পারেন না। হ'তে হ'তে হঠাৎ তাঁদের ঊর্দ্ধমুখী গতি রুদ্ধ হ'য়ে যায়, তাঁরা সাধারণ লোকের স্তরেই বড়-জোড় একটু তেজাল ঝাঁঝাল

লোক হ'য়ে থাকেন। শক্তিলাভের চেষ্টা তাঁদের মনকে ঈশ্বর-বিমুখ করে, আর শক্তি কিছু লাভ হওয়া মাত্রই তাঁদের মনকে অহঙ্কৃত, আচরণকে উদ্ধত, বাক্যকে বেপরোয়া, দর্পকে অনর্গল করে।

অলৌকিক শক্তিলাভের বিপদ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবৎ-সাধনের ফলে আপনা-আপনিই অনেক সময়ে অলৌকিক শক্তি এসে যায়। যেমন, পেট ভ'রে খেলে আপনা-আপনিই উদ্গার আসে। এজন্য আর পৃথক পুরুষকারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু চরিত্রের ভিতরে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ সাধক ব্যক্তির পক্ষে এক বিরাট বিঘ্ন, এক বিশাল পরীক্ষা। অনেক সাধকই এই বিঘ্নের পাথরে হোঁচট্ খেয়ে মরেন বা একান্তই যদি না মরেন ত' খুব শক্ত আঘাত খেয়ে অনেক দুর্ভোগ ভোগেন।

অলৌকিক শক্তির বিলোপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু ভগবানের নামের এমনি এক অনির্ব্বচনীয় মহিমা যে, নাম করে কত্তে আপনি এসব অলৌকিক বিভূতি দূর হ'য়ে যায়; অলৌকিকত্বের হেঁয়ালী আর কুহেলিকা সহজেই সাধককে পরিত্যাগ ক'রে দূরে দাঁড়ায়। তখন ব্রহ্মবিদ্ মহামুনি সামান্য মানবের মত নিজ লৌকিক জীবনের অসামান্যত্ব দিয়েই জীবের হিত সম্পাদন করেন।

যথার্থ মহাপুরুষত্ব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাস্তবিক, লৌকিক জীবনের মধ্যে যে লোকচক্ষুর অগোচর, লোকবুদ্ধির অগোচর, লোকালোচনার অগোচর অলৌকিক প্রচ্ছন্ন শক্তির প্রভাব, যার ক্রিয়ায় পাপী পুণ্যবান্ হয়, দুঃশীল সদাচারী হয়, লম্পট চরিত্রবান্ হয়, লোভী নিষ্কাম নির্লোভ হয়, তাই মহাপুরুষের যথার্থ মহাপুরুষত্ব।

অলৌকিক শক্তির প্রতি লুব্ধতা কল্যাণকর নহে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমরা অলৌকিকের আলেয়া অনুসরণ ক'রে কেন বৃথা সময় নষ্ট কচ্ছ? কোনো ব্যক্তি এক মুষ্টি ছোলা-ভাজাকে এক খানি লুচি ক'রে দিতে পারেন, এক পেয়ালা শাদা জলকে দুগ্ধে পরিণত ক'রে

দিতে পারেন, সুপারীর কুচিকে সোণার কুচি আর চাউলের গুঁড়িকে ছানার সন্দেশ ক'রে দিতে পারেন,— এসব খুঁজে খুঁজে কেন তোমরা হয়রান্ হচ্ছ? এসব ভোজবাজি দেখে আর দেখিয়ে জীবনের কোন্ কল্যাণ হবে?

যথার্থ মানুষই অলৌকিকতম বস্তু

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যথার্থ মানুষের সংসর্গই জগতের শ্রেষ্ঠ স্পর্শমণি। যে মানুষের সংসর্গে চিত্তের কদর্য্য লালসা প্রশমিত হয়, উন্নতিমুখিনী প্রেরণা জাগে, তার সংসর্গ কর। কারণ, কাপট্য-প্রপীড়িত এই নিখিল ভুবনে যথার্থ মানুষই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ বস্তু, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা অলৌকিক দৃশ্য।

ময়মনসিংহ

২৭শে চৈত্র, ১৩৩৮

কর্ম্মপ্রবণতার মূল উৎস

অদ্য রহিমপুরের জনৈক যুবক-ভক্তের নিকটে শ্রীশ্রীবাবা একপত্রে লিখিলেন,—

"* * * চিন্তাশীল মন লইয়া যে সংসারে বিচরণ করে, অনেক কথা না কহিয়াও তাহার নিকটে একান্ততম সত্যসমূহ উপস্থাপিত করা চলে। এইজন্যই জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্য্যেরা বুদ্ধিমান ও ইঙ্গিতজ্ঞ শিষ্যলাভকে এক পরমপ্রার্থনীয় সৌভাগ্য বলিয়া গণনা করিয়াছেন।

"অবসর সময়ে তোমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ বিকাশের ইতিহাস অধ্যয়ন করিও। কোন্ রাজার পরে কোন্ রাজা সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, সেই বাহ্য ইতিহাসের কথা বলিতেছি না,—উন্নতিমুখিনী কোন্ রুচিটীর পরে কোন্ রুচিটীর সৃষ্টি এই জাতিটার অন্তরে স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিল, তার ইতিহাস। দেখিতে পাইবে, এক একটা বিরাট রকমের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের দীর্ঘকাল পূর্ব্ব হইতেই জাতিটা সহস্র দিকে নিজ কর্ম্মশীলতাকে বিস্তারিত করিয়াছে এবং সহস্র দিক্ দিয়া জাতির অঙ্গে শ্রমক্ষমতা ও শ্রমসহিষ্ণুতার সমাবেশ তিলে তিলে পলে পলে ঘটাইয়াছে। এই চিরন্তন সত্যটার উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে আমার সংসার-সুখ-বিমুখ চিত্তটার এই অবিরাম কর্ম্মপ্রবণতার মূল উৎসকে অনুসন্ধানে পাইবে।

"দিবসের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তকে তোমরা কোনও শুভপ্রদ কর্ম্মে লিপ্ত রাখিয়া সার্থক করিতে চেষ্টা কর। তোমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জ এই পথেই প্রকাশ পাইবে এবং এই ভাবেই তোমরা নিজেদের মহীয়সী সত্তাকে সাক্ষাৎ করিয়া ধন্য ও বিগতভী হইবে।"

সচ্চিন্তার একাগ্র আরাধনা

রহিমপুর-নিবাসী অপর এক যুবক-ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ব্রহ্মবীর্য্যসম্ভূত তপঃপবিত্র ইচ্ছা ব্যর্থ হইবার নহে। এই জন্যই আমি বহির্ম্মুখ সহস্র সৎকর্ম্মের অপেক্ষাও একটী মাত্র সচ্চিন্তার একাগ্র আরাধনাকে জাতির মেরুদণ্ডকে সরল ও দৃঢ় করিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করি এবং এই মহদ্‌বস্তুর সাধনাকেই তোমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। যোগ্য সুপাত্র পূর্ব্বকর্ম্মের স্বাভাবিক আনুকূল্যের সুপ্রভাবে সহজেই আমার এই হৃদয়িক প্রার্থনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে এবং সচ্চিন্তার একনিষ্ঠ অনুশীলনের দ্বারা নিজের অন্তর্নিহিত সকল নিপুণতাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবে। প্রতিকূল পূর্ব্বসংস্কার লইয়া যাহারা আসিয়াছে, তাহারা বিলম্বে এই সত্যকে স্বীকার করিবে, বিলম্বে এই সত্যের প্রতিভা-মুগ্ধ হইবে এবং বিলম্বে এই সত্যে সিদ্ধিলাভ করিবে। সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু চন্দ্রমার স্নিগ্ধকৌমুদী জাতিভেদ না মানিলেও যার আঙ্গিনা যত সুপরিচ্ছন্ন, তার আঙ্গিনায় তত মনোহর বিভা ধারণ করে।

"শ্রীভগবানের পরমমঙ্গলময় নাম তোমাদের প্রতিকূল পূর্ব্ব-সংস্কারকে ধ্বংস করিবে, অনুকূল পারিপার্শ্বিককে সৃষ্টি করিবে। নামের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দাও। বহির্ম্মুখ সহস্র কর্ম্মের তীব্র রণকোলাহলের মধ্যে দেহটাই শুধু ভীম-বিক্রমে পরিক্রমণ করুক কিন্তু অন্তরে জাগুক শুধু তাঁরই সুখস্পর্শ।"

বহু পন্থার দোষ-গুণ

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবা ব্রহ্মপুত্র-তীরে বেড়াইতে বাহির হইলেন। চারি পাঁচ জন যুবক তাঁর সঙ্গে রহিলেন। তন্মধ্যে একজন যুবক প্রশ্ন করিলেন,—অনেককে দেখা যায়, একস্থানে গুরূপদেশ গ্রহণ ক'রে তারপরে নানা স্থানে নানা মতের

নানা পথের উপদেষ্টাদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করে। এর ভাল-মন্দ কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভালর দিকটা এই যে, একটা বস্তুকেই নানা দিক্ দিয়ে নানাভাবে দেখ্‌বার রুচি, প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য জন্মে। মন্দের দিক্ এই যে, পরস্পরবিরোধী ব'লে মনে হয়, একই বিষয় নিয়ে এমন নানা যুক্তি শুনে শুনে ইষ্ট-নিষ্ঠার হানি ঘটে এবং নিষ্ঠাহানির সঙ্গে সঙ্গে সাধনে নিরুৎসাহতা, নিরুদ্যমতা, অবিশ্বাস ও এমনকি বিদ্বেষ পর্য্যন্ত এসে পড়ে। যেমন মধু-মক্ষিকা নানা ফুল থেকে মধু আহরণ কত্তে গিয়ে অনেক সময় এমন মধুও আহরণ করে, যা স্বাদে মধুর হ'লেও কাজে বিষ।

পাত্রভেদে দোষ-গুণের তারতম্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু বহু স্থানে গতায়াতের দোষ-গুণের পরিমাণ যে সকলের পক্ষেই সমান হবে, তা নয়। পাত্রভেদে তারতম্য হবে। কোনো ব্যক্তির পক্ষে বহু উপদেষ্টার সঙ্গ সঙ্কীর্ণতার সংস্কারমুক্ত অতীব তীব্র সাধন-স্পৃহার জনক হয়। কোনো ব্যক্তির পক্ষে উহাই আবার নাস্তিক্য বা অবিশ্বাসের স্রষ্টা হয়। কোনো ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বভুবন তুচ্ছ ক'রে একটী জায়গায় লেগে থাকাই পরমমঙ্গলের কারণ হয়। কোনো ব্যক্তির পক্ষে এক জায়গায় লেগে থাকা পরধর্ম্মদ্বেষী অসহিষ্ণু অবিচারী অবিবেকী সুপ্রমত্ত কূপ-মণ্ডুকতার কারণ হয়।

সাধক ও প্রচারকের পার্থক্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তবু শেষ পর্য্যন্ত একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সাধন যারা কর্ব্বে, তাদের জন্য উপদেশ—"কৌতূহলং বিবর্জ্জয়েৎ", আর প্রচার যারা কর্ব্বে, তাদের জন্য উপদেশ—"সব্‌সে লীজিয়ে নাম"। সাধকের কাজ অমৃতরস আস্বাদন করা, মাটি খুঁড়ে জল বের ক'রে আকণ্ঠ পান করা। তার পক্ষে নিষ্ঠাই প্রধানা বান্ধবী। প্রচারকের কাজ কোন্ পুকুরের জল থেকে কোন্ পুকুরের জল ভাল, তার জানানি দিয়ে যাওয়া, নিজে সে আস্বাদন করুক আর না করুক। অপরের মুখে শুনে শুনেও একটা আন্দাজ তাকে ক'রে নিতে হয় যে, কোন

পুকুরের জল লোনা, কোন্ পুকুরের জল কটা, কোন্ পুকুরের জল ভারী, কোন্ পুকুরের জল পাতলা। অপর লোকে জল খাবে, তারই জন্য সে আপ্রাণ চীৎকার কচ্ছে, নিজে হয়ত জল কেমন বস্তু জীবনেও একবার চ'খ চেখে দেখেনি। এমন ব্যক্তির পক্ষে বহু স্থানে গিয়ে বহু পথের খোঁজ-খাঁজ নেওয়া আবশ্যক বৈকি!

জীবন ও আত্মোৎসর্গ

ব্রহ্মপুত্রতীর হইতে ফিরিবার পথে অন্য এক কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, আত্মোৎসর্গ করাই জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। আত্মোৎসর্গ ক'রেই জীবন সার্থক, আত্মোৎসর্গ দিয়েই জীবন মূল্যবান্।

আত্মোৎসর্গ ও মতবাদ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,- জগতে শতাব্দীর পর শতাব্দী কত রকমের নূতন নূতন মতবাদ সৃষ্ট হচ্ছে, প্রসার পাচ্ছে। কিন্তু আত্মোৎসর্গ থেকে সে সব মতবাদকে দূরে রেখে দাও, দেখবে সব হীনপ্রভ হ'য়ে পড়্বে। দর্শকদের কৌতূহলের বস্তু হয়ে মিশরের প্রাচীন মৃতদেহগুলি জাদুঘরে প'ড়ে আছে। আত্মোসর্গ-বর্জ্জিত সব মতবাদেরও তাই হয় অবস্থা। একযুগে কথায় কথায় লোক ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিত। আজকাল কথায় কথায় লোক দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছে। ভবিষ্যতে দলে দলে লোক সাম্যবাদের জন্য প্রাণ দেবে। কিন্তু প্রাণ দিয়েছি, দিচ্ছে বা দেবে ব'লেই এসব মতবাদের মর্য্যাদা হয়েছে। নইলে আত্মোৎসর্গ-থেকে পৃথক্ ক'রে নিলে ধর্ম্ম, nationalism (স্বাদেশিকতা-বাদ), communism (সাম্যবাদ) প্রভৃতি ism (মতবাদ) এর দাম থাকে কয়টা কাণাকড়ি? দিনের পর দিন মানবের চক্ষে এক একটা "ism" এর (মতবাদের) মূল্য বদলায়, তাৎকালিক অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু ত্যাগ চিরকালই ত্যাগ থাকে, ত্যাগের মূল্য চিরদিন সমান থাকে। যীশুখ্রীষ্ট, মনসুর আর তেগবাহাদুর ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। সতী, পদ্মিনী, সংযুক্তা পাতিব্রত্যের জন্য প্রাণ দিলেন। দুর্গাবতী, টিপুসুলতান, মোহনলাল, মীর মদন দেশের জন্য প্রাণ দিলেন। ভবিষ্যতে আরো কতজন কত কারণে প্রাণ-

বলি দেবেন। তাঁদের আদর্শ বা লক্ষ্যের সার্থকতা সম্বন্ধে যুগে যুগে লোকের মত পরিবর্ত্তিত হ'তে পারে, হবে। কিন্তু তাঁদের অদ্ভুত আত্মত্যাগ জগতে চিরকাল পূজিত হবে।

দেশ ও জগতের সেবা সম্পর্কিত ধারণা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সুতরাং কোনও একটী মতবাদকে প্রচার করাই দেশ বা জগতের কল্যাণ, এ ধারণা পোষণ করার চেয়ে, ত্যাগের শক্তি, আত্মাহুতির শক্তি, আত্মবিসর্জ্জনের শক্তি বর্দ্ধন ক'রে দেওয়াই যে দেশ বা জগতের কল্যাণ, এ ধারণা পোষণ করা শ্রেয়ঃ। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ত্যাগ কে কোন্ পথে স্বীকার কর্ব্বে, তার চেয়ে, তার আত্মবলি সত্যিই নিষ্কাম কিনা, নিঃস্বার্থ কিনা, স্বার্থগন্ধ-রহিত কিনা, পরোপকার-বুদ্ধি-প্রণোদিত কিনা, সেই দিকেই পূর্ণতা বিধানের চেষ্টায় দেশের ও জগতের সেবা বেশী হয়। মোট কথা, লোকের মৃত্যুভয় কমিয়ে দেওয়াই দেশ বা জগতের প্রাথমিক সেবা বা প্রধানতম সেবা।

মৃত্যু-ভয় বিদূরণের উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মৃত্যুভয় কিভাবে দূর কত্তে হয়? মৃত্যুকে প্রথমে একটা personified reality (মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ) ব'লে ভাব্‌তে চেষ্টা কর। তারপরে তাকে তোমার প্রাণের প্রাণ বন্ধু ব'লে ভাব্‌তে থাক। বন্ধু-সমাগমের আনন্দকে চিন্তা ক'রে, মৃত্যুসমাগমের ভাবের সঙ্গে তাকে যুক্ত কর। হে মৃত্যু, তুমি ভীতির পাত্র নও, তুমি প্রেমের পাত্র, তুমি আদরের পাত্র, তুমি পরম সোহাগের পাত্র। এইভাবে মৃত্যুর প্রতি প্রাণের আবেগকে পরিচালিত কর। কিছুদিন অভ্যাসের পরেই দেখ্‌বে, মৃত্যুভয় তোমার কমে গেছে।

মৃত্যু-ভয়হীনতাকে জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠা কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এ'ত গেল ভাবাবেগে মৃত্যুভয় বিদূরণের কথা। কিন্তু এই পন্থাও একাকী সুদীর্ঘ নয়। শুধু ভাবাবেগের উপর নির্ভর কত্তে গেলে অকুতোভয়তা ক্ষণস্থায়িনী হয়। তাই এই নির্ভীকতাকে জ্ঞান-বিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে। তার পন্থা গীতায় বলা হয়েছে। "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে, ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব—" ইত্যাদি।

মৃত্যুবরণের দৃষ্টান্ত আলোচনা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অপরাপরের জীবনে নির্ভয়ে মৃত্যুবরণের যেসব দৃষ্টান্ত রয়েছে, তার প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি. তার প্রতি প্রশংসমান ভাব, তার আলোচনায় অকপট উৎসাহ মৃত্যুভীতি কমিয়ে দেয়। কিন্তু এর একটী কুফলও আছে। যে যেই আদর্শের অনুপ্রেরণায় প্রাণ দিয়েছে, তার আত্মবিসর্জ্জনের আলোচনা কত্তে গিয়ে হয়ত তার সেই আদর্শটীকেও মনে মনে একটা শ্রেষ্ঠতা বা প্রাধান্ত দিয়ে বস্‌বে। অথচ, স্থির বিবেচনায় তুমি লক্ষ্য কর্‌লেই বুঝ্‌তে পার্ব্বে যে, তার প্রাণদান যতই সাহসিক হোক্, তার আদর্শটী হয়ত ভ্রান্ত। একজনের পক্ষে যা প্রকৃত আদর্শ, আর একজনের পক্ষে তাই হয়ত ভ্রান্ত। এক যুগে যে আদর্শ প্রকৃত আদর্শ, আর একযুগে সেই আদর্শই হয়ত ভ্রান্ত। অথচ অক্লেশে মৃত্যুবরণের দৃষ্টান্তটী সত্য সত্যই পূজার যোগ্য। এসব স্থলে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে যে ভ্রান্ত আদর্শের ত আবার পূজারী হ'য়ে যাচ্ছ না!

ময়মনসিংহ

২৮শে চৈত্র, ১৩৩৮

মানবাশ্রম

এই কয়দিন ধরিয়া নিজ-পূবাইল গ্রামনিবাসী সুখদারঞ্জন দাস নামক একটী ছাত্র অনুক্ষণ শ্রীশ্রীবাবার পিছনে পিছনে রহিয়াছেন। অদ্য সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার দীক্ষা হইল।

শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে দীক্ষান্ত উপদেশ দিতে দিতে কহিলেন,—আজ আমার নূতন একটী আশ্রম হ'ল। সে আশ্রমটী হলি তুই। তোর জীবন আজ থেকে এমন হোক্ যেন সহস্র সহস্র ব্যক্তির চিত্তের মলিনতা দূর হ'তে পারে। তোর কর্ম্ম, বাক্য, ভাব এমন হোক্ যেন নির্ম্মলতার বায়ুপ্রবাহ চতুর্দ্দিকে অবাধে বইতে থাকে। পবিত্রতার সাথে শান্তি, শান্তির সাথে বীর্য্য আর বীর্য্যের সাথে সহিষ্ণুতার প্রসার হোক্। তোরা ত' জানিস্, আমি শত সহস্র আশ্রম সৃষ্টি ক'রে যেতে চাই, কিন্তু সে আশ্রম মাটির উপরে কুটীর নয়, সে আশ্রম মানবাশ্রম।

অন্তঃপুরের আশ্রম

রহিমপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নবীপুরের জনৈক বিবাহিত যুবক-ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"তোমার কিন্তু বাবা আশ্রম দুইটী, একটী রহিমপুরের গুরুধাম, যেখানে আসিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহারের প্রেরণা পাইয়াছ এবং মনুষ্যত্বকে বিকশিত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, আর একটা তোমার অন্তঃপুরে। অন্তঃপুর বলিতে যদি তোমার প্রাণের পুর বুঝাইতে চাহিতাম, তবেই ভাল হইত। কিন্তু এখন আমি অন্তঃপুর বলিতে তোমার নববিবাহিতা পত্নীর হৃদয় বুঝাইব। রহিমপুরে যেমন শক্ত হাতে কোদাল ধরিয়া তোমাকে মাটি কাটিতে হয়, শস্যের জন্য, ইটের জন্য, পুকুরের জন্য তাকে তৈরী করিতে হয়, অন্তঃপুরের আশ্রমেও তোমাকে তেমনি দৃঢ় হস্তে সহধর্ম্মিনীর অন্তঃকরণরূপ কৃষিক্ষেত্রকে স্বর্ণপ্রসূ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে। রহিমপুর আশ্রমে তোমার অস্ত্র কোদাল ও খন্তা, কিন্তু অন্তঃপুরাশ্রমে তোমার অস্ত্র শ্রীভগবানের নাম ও ভাগবতী কথা। উন্নতিমুখিনী উচ্চ-প্রেরণা দিয়া আমার স্নেহের 'মা'-টীকে তুমি ভগবৎ-সাধনের দিকে দ্রুত অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া লও,— জীবনপথে তোমার এই অপরিহার্য্য সঙ্গিনীকে তোমার ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সম্পূর্ণরূপ সহযোগিতার জন্য যোগ্য করিয়া তোল।"

অপরিণত-বয়স্কা পত্নী সম্পর্কে নব-বিবাহিত স্বামীর দায়িত্ব

রহিমপুর-নিবাসী একটী নব-বিবাহিত যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"নববিবাহিত জীবনের সুগভীর দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি তোমাকে সচেতন করিয়া তুলিতে চাহি। যে ফুল বসন্তের বাতাস পাইলে আপনি ফুটিবে, তাহাকে জোর করিয়া ফুটাইতে গিয়া সহস্র সহস্র কামান্ধ যুবক জীবনব্যাপী দুঃখ ও যন্ত্রণাই আহরণ করিয়াছে। তোমাকে এই বিষয়ে এখনই সচেতন হইতে হইবে।

"যাহার সহিত তুমি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছ, সে এখনও নিতান্তই কোমলমতি বালিকা। যদিও শারদা-আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই তোমার

বিবাহকার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছে, তথাপি চৌদ্দপনের বৎসর বয়সের একটী মেয়ে নিতান্তই কচি খুকী ব্যতীত অপর কিছুই নহে। সংসারের কোনও গুরুতর বিষয়েই ইহার কোনও প্রকৃত অভিজ্ঞতা নাই এবং সন্তানের জননী হইবার পক্ষে এই বালিকা আরও কতককাল পর্য্যন্ত দেহে, মনে ও শিক্ষায় সম্পূর্ণরূপেই অনুপ-যোগিনী থাকিবে। এই জন্যই তোমাকে এখন পূর্ণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিয়া নিজ সহধর্ম্মিণীর সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতার বিকাশে সহায়তা দিতে হইবে।

"ভগবৎ-সাধনা সংযমের সহায়তা করে, অসংযমকে দূর করে, সংযমকে প্রতিষ্ঠিত করে। জোর করিয়া ইন্দ্রিয়-তাড়না বা জিদের বলে কামনানিগ্রহ অতি কঠিন কথা এবং অধিকাংশস্থলেই ব্যর্থতাগ্রস্ত, কিন্তু ভগবৎ-সাধনা ধীরে ধীরে মনকে এমন শক্তিধর করিয়া তোলে, ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্ন কাম-লালসাকে এমন ভাবে উপসংহৃত করে যে, কামুক কিছুদিন পরে ভাবিয়া বিস্মিত হয় যে, এতবড় কামচাঞ্চল্য কোথায় গিয়া লুকাইল, কি করিয়া প্রশমিত হইল। নর-নারীর ঘনিষ্ঠতার মধ্যে সুগভীর ভালবাসার একটা স্থান রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়-লালসায় ইন্ধন-সংগ্রহ এই ভালবাসাকে পাপ-পঙ্কিল ও মাধুর্য্যহীন করিয়া ফেলে, আবার সংযম-সাধনা এই ভালবাসাকে ঐশ্বরিক বিভূতি-সম্পন্ন প্রাণপ্রদ বাস্তবে পরিণত করে। যদিও আমি দার-পরাঙ্মুখ সন্ন্যাসী তথাপি আমি জগতের একটী গৃহীকেও গার্হস্থ্যাশ্রমত্যাগী করিতে চাহি না। একটী গৃহীকেও আমি এই উপদেশ দেই না যে, স্বামিস্ত্রীর ভালবাসার মধুময়ী নাটিকার যবনিকাখানি প্রথম দৃশ্যপটের উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই পতিত হইয়া যাউক। তোমরা একে অপরের হৃদয়-নিহিত সঞ্চিত সুধার আস্বাদন করিয়া একে অন্যকে প্রেম দিয়া ও একে অন্যের প্রেম পাইয়া কৃতার্থ হও। কিন্তু বাবা, কেমন প্রেমের কথা বলিতেছি? যাহার সামান্য আস্বাদনের পরে দীর্ঘকাল সন্তাপ ভুগিতে হয়, সেই প্রেম? নিশ্চয়ই না! যে প্রেম স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে দেবতায় পরিণত করে, সেই প্রেমের কথাই বলিতেছি। এই প্রেম ভগবৎ-সাধনার ফলেই বিকশিত হয়।"

বিবাহিত জীবন ও সন্তান-সন্ততি লাভ

নবীপুর-নিবাসী অপর এক ভক্ত যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সন্তান-সন্ততি লাভ বিবাহিত জীবনের একটী আবশ্যকীয় অঙ্গ। কিন্তু এই সন্তান-লাভকে ভগবৎ-সাধনের মধ্য দিয়া বিমল সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তোলাতেই তোমাদের প্রকৃত মানবতার পরিচয়। শূকর-শূকরী যেমন মল-দুর্গন্ধে ক্লেদপঙ্কে ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসে এবং সন্তান-জননকে একটী কদর্য্য ইন্দ্রিয়-তাড়নার ফলস্বরূপেই গ্রহণ করে, তোমরা তাহা পার না। কারণ, তোমরা মানুষ, তাহারা পশু। মানুষে ও পশুতে প্রভেদ আছে, এবং মানুষকে পশুর চাইতে নিকৃষ্ট হইয়া গিয়া এই পার্থক্য বজায় রাখিতে হইবে না, মানুষকে সর্ব্বপ্রকারে পশুর চাইতে শ্রেষ্ঠ রহিয়া পৃথক্ থাকিতে হইবে। ভগবৎ-সাধনা এই শ্রেষ্ঠত্ব-রক্ষার প্রধানতম উপাদান।"

নাম-সাধনার সুফল

রহিমপুর-নিবাসী অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তপঃ-সাধনের অভাব মানবের সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে নাশ করে এবং হৃদয়ের অনুভূতি-শীলতাকে স্থূল করে। তোমরা বাবা সাধন ভুলিও না।

"ভগবানের মঙ্গলময় সুপবিত্র নামের সেবা তোমার অন্তরে মঙ্গল ও পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। সহস্র অসংযমের কলুষ-কালিমা নামের কৃপায় সংযম-সুরভিত হইবে। But required **constant** application (চাই—অবিশ্রান্ত আত্মনিয়োগ), steady service (দৃঢ়নিষ্ঠ সেবা) and unflinching faith (অটল বিশ্বাস)।

"শ্রীভগবানের কৃপা-সিন্ধুর একবিন্দু পাইলেই মানব-জীবন কৃতকৃতার্থ হইয়া যায় এবং তাঁর অমৃতমধুর নামের মধ্য দিয়াই নিত্যরসামৃতসিন্ধুর তুমি অধিকারী হইবে। নামকে প্রাণ দিয়া ভালবাস, নাম-ব্রহ্মের সেবায় নিজেকে বিলাইয়া দাও।"

আত্মোন্নতি বনাম দেশোন্নতি

নবীপুর-নিবাসী অপর একটী যুবক-ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"নিজ জীবনকে উন্নত করাই দেশোন্নতি-সাধনের প্রথম সোপান। জীবন যাহার অগঠিত, দেশোন্নতির সহস্র চেষ্টাও তার পক্ষে হাস্যাস্পদ নিষ্ফলতা আহরণ করে। অন্ধ অপরকে কি পথ দেখাইবে? কুব্জ কাহার বোঝা পৃষ্ঠে লইবে?—আত্মোৎকর্ষ সাধনের দিকেই তোমাদিগকে গভীর ভাবে প্রয়াসশীল হইতে হইবে।

"নিজেকে যে গড়িয়া তোলে, সে শুধু নিজের মঙ্গলকেই জাগায় না, দেশ, সমাজ, জাতি ও জগৎ তার উন্নতিতে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। এই জন্যই আমার দৃষ্টিতে আত্মগঠনোৎসাহী উদ্যমী সাধকই দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতকারী মহাত্মা।

"লক্ষ্য রাখ উচ্চ দিকে
নিম্নদিকে চাহিও না আর,
অগ্রসর হও বেগে
উপেক্ষিয়া দণ্ড-পুরস্কার।
মৃত্যুর গহন পথে
অমৃতের লহ আস্বাদন,
জীবনের বিনিময়ে
অর্জ্জি' লও অনন্ত জীবন।
আপনারে সঁপি দাও
আদর্শের রাতুল চরণে,
ধন্য হও, পুণ্য হও,
সত্য হও জীবনে মরণে।"

বহির্ম্মুখ কর্ম্ম, সাধনানুরাগ, উদ্দেশ্য ও উপায়ের শুদ্ধতা

রহিমপুর-নিবাসী অপর এক যুবক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"বহির্ম্মুখ সৎকর্ম্মে অনুরাগ দর্শনে আমি তৃপ্ত হইলেও পরিতৃপ্ত হই না। আমার পরিতৃপ্তি আমার সন্তানদের সাধনানুরাগে। শ্রীভগবানের নামকে যে

যত অধিক ভালবাসে, আমাকে সে তত অধিক পরিতৃপ্ত করে। তোমাদের অপরিসীম কর্ম্মঠতার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ভগবৎ-সাধনে সুগভীর নিষ্ঠাও যে আমি চাই বাবা।

"একটা বলবীর্য্যপ্রবৃদ্ধ নবজাতি সৃষ্টির সুমহৎ ব্রত লইয়া আমি অযাচকত্ব ও চিরদারিদ্র্য বরণ করিয়াছি। এই ব্রত শত শত সহস্র সহস্র একাগ্র তপস্বীর সম্মেলনে পূর্ণ সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে। তোমরা একনিষ্ঠ সাধনের মধ্য দিয়া সত্য সত্য তপোময় জীবন বিকশিত করিয়া তোল বাবা।

"একাকী নহে, সকলকে লইয়া তোমরা শুদ্ধতা অর্জ্জন কর। প্রত্যেক যুবকের প্রাণে চারিত্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হও বাবা।

"I want work, massive work (আমি চাই কাজ,—বিশাল কাজ), but not impure work. (কিন্তু অপবিত্র কাজ নহে।) I want service, whole-time service (আমি চাই সেবা, অবিশ্রাম সেবা), but not impure service, (কিন্তু অশুদ্ধ সেবা নহে।) Purity of purpose and sanctity of means are the first conditions of my demands, উদ্দেশ্যের পবিত্রতা ও উপায়ের বিশুদ্ধতা আমার দাবীর প্রধানতম সর্ত্ত।)"

আশ্রমীর লক্ষণ

রহিমপুর আশ্রমের জনৈক কর্ম্মীর নিকটে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সাধনে অনুরাগ, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষণে যত্ন, বহুভাষিতা প্রশমনে প্রয়াস, পরোপকারে প্রবৃত্তি, আত্ম-প্রশংসায় বিরতি, পরদোষ-দর্শনে অরুচি, নিয়ত কর্ম্মশীলতা ও আত্মপরীক্ষায় অনালস্য যথার্থ আশ্রমীর লক্ষণ বলিয়া জানিও। সাধনানুরাগই আশ্রমীর প্রধান গুণ হইবে, কিন্তু ইহা আবার আলস্যের প্রশ্রয়দাতা না হয়, তাহাও দেখিতে হইবে। যুগধর্ম্মের মহিমায় পরমুখাপেক্ষীর জন্য যে কোনও সমাজে বা প্রতিষ্ঠানেই স্থান হইতে পারে না, এই কথা প্রত্যেক আশ্রমীর স্মরণে রাখা উচিত। আশ্রমে আসিয়া কেহ আশ্রমের গলগ্রহ না হয়, প্রকারান্তরে প্রত্যেকেই অল্লাধিক আশ্রমের স্বাবলম্বন-শক্তিকে প্রবর্দ্ধিত করে, আশ্রমকে ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি হইতে রক্ষা করিয়া অন্ততঃ আশ্রমীয় ব্যয়-পরিচালনের ব্যাপারে

সর্ব্বতোভাবে পৌরুষ-সম্পন্ন করে, অথচ স্পর্দ্ধা, অহঙ্কার, দর্প, ঔদ্ধত্য, পরনিন্দা-প্রবৃত্তি ইহাদের চরিত্রকে কলুষিত না করে, ইহা প্রয়োজন। পারস্পরিক ঈর্ষ্যা, কর্ত্তৃত্ব লইয়া কলহ, মান-সম্মান-বোধের বাড়াবাড়ি, আনুগত্য-হীনতা এই সব যেন না আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পায়। এই কথা স্মরণে রাখিয়া আশ্রমী-দের প্রত্যেককে নিজ নিজ চরিত্র-গঠনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তোমাদের আস্থার শক্তি বর্দ্ধিত হউক, অনাস্থাবুদ্ধি দূরীভূত হউক, তোমরা তোমাদের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বে ও সাফল্যে পূর্ণ বিশ্বাস অর্পণ কর এবং সকলে একমনে এক প্রাণে কাজ করিবার শক্তি, রুচি, প্রবৃত্তি ও অভ্যাসকে আয়ত্ত কর। গভীর বিশ্বাসান্বিত ঐক্যবদ্ধ পাঁচ জন লোকও জগদ্বিস্ময়কর মহাকার্য্য সাধন করিতে পারে, ইহা জানিও। ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাস ও বিশ্বাসান্বিত ঐক্যকে বজায় রাখিতে যাঁহারা হইবেন দৃঢ়বীর্য্য, জানিও তাঁহারাই আশ্রমের গৌরব এবং অলঙ্কার।”

গৈরিক-ধারণ ও মহাপুরুষত্ব

রহিমপুর-নিবাসী আশ্রমের অন্য একটী কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

“মহৎ জীবন যদি লাভ করিতে চাও, মহৎ গুণাবলির অনুশীলন করিতে হইবে। সত্যময় বাক্য, সত্যময় ব্যবহার, সত্যময় চিন্তাকে নিত্যসাথী করিতে হইবে। কপটাচার দিয়া কেহ জগতে বড় হইতে পারে না। বড় হইবার পথ সত্যনিষ্ঠা ও সাধনা।

“গৈরিক পরিধান করিয়া অনেকে জগতে সত্যের, ত্যাগের, আত্মবিসর্জ্জনের ও ব্রহ্মোপলব্ধির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রক্ষা করিতেছেন। আবার এই গৈরিক পরিয়া অনেকে জগতের বুকে ভণ্ডামি করিয়াও বেড়াইতেছে। কেহ আত্ম-প্রচার করিবার জন্য, কেহ শিষ্য-সংগ্রহের জন্য, কেহ চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের লোভে, কেহ নিজ কদাচার ঢাকিবার জন্য, কেহবা পল্লীবাসী নর-নারীর পূজার পুষ্পাঞ্জলি আদায় করিবার জন্য এক পয়সার গেরুয়া রং দিয়া তার পাঁচসিকা দামের কাপড়ের টুক্‌রাকে একেবারে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের রাজরাজেশ্বর-বাঞ্ছিত মহাবস্ত্রে পরিণত করিতেছে। এই জুয়াচুরীর অংশী তোমাদিগকে আমি হইতে দিতে চাহি না।

উপযুক্ত অধিকারী হইবার পূর্ব্বে আমি তোমাদের একজনকেও গৈরিক পরিতে অনুমতি দিতে ইচ্ছুক নহি।

"অথবা ভাবিয়াই দেখনা, গৈরিক না পরিলেই বা ক্ষতি কি? ত্যাগ, বৈরাগ্য তোমার ভিতরে যদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তাহা হইলে গৈরিক না পরিলেও লোকে তোমাকে মানিবে, তুমি জীবের কল্যাণ সাধিতে পারিবে। কিন্তু গৈরিক যেজন পরিবে, তার অন্য কোনও গুণ থাকুক আর না থাকুক, একটা গুণ থাকা চাই,—তার নাম সত্য-নিষ্ঠা। প্রাণান্তেও যে মিথ্যা কথা বলিবে না, আমি তাহাকে গেরুয়া দিতে সম্মত আছি। কারণ, সত্যই সকল তপস্যার মূল এবং ধর্ম্মের প্রধান উপাদান। সত্যভ্রষ্টের তপস্যা অশ্বহীন অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায় নিস্ফল ও বিড়ম্বনাপূর্ণ।

"গেরুয়া-বস্ত্রের প্রতি সত্যই কি তোমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে? যদি জন্মিয়া থাকে, তার প্রমাণ আগে দিতে হইবে। পরের জন্য বুক চিরিয়া রক্ত দিতে যে প্রস্তুত, গেরুয়া তার অঙ্গে শোভা পাইতে পারে। কিন্তু তারও আগে চাই, সত্যের সাধনায়, সত্যের ব্রতে নিজেকে আবদ্ধ করা। মিথ্যা বলিব না, মিথ্যা ভাবিব না,—এই সঙ্কল্প আগে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর।

"অথবা, একটু আগে যাহা বলিয়াছি, তাহাই পুনরায় বলিতে চাহি,—গেরুয়া না পরিলেই বা ক্ষতি কি? আমি ত' গেরুয়া ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া আমাকে কি কেহ গৃহী বলিয়া মনে করে, না, সম্মান কিছু কম করিয়া দেয়? প্রত্যহ আমার সঙ্গে থাকিয়া কি লক্ষ্য করিতে পার নাই যে, আমার ঐ একটুকরা শাদা বহির্ব্বাসের প্রতি লোকের কত শ্রদ্ধা, কত ভক্তি! আমি যদি আজ কাছা দিয়া কাপড় পরা সুরু করি, তাহা হইলেও লোকে আমাকে সেই সম্মানই করিবে। আমি যদি আজ সাধারণ ভদ্রব্যক্তিদের ন্যায় সার্ট-কোট গায়ে দিয়া বাহির হই, তবু লোকে আমাকে সেই আদরই দেখাইবে। কারণ, লোকে জামা-কাপড় বা বেশভূষার পূজা করে না। পূজা করিবার জন্য মানুষটীর ভিতরে অন্য জিনিষ খোঁজে। তোমার চরিত্রের ভিতরে দেবদুর্ল্লভ সদ্‌গুণাবলির আগে সমাবেশ কর। ইহাই তোমার প্রধান লক্ষ্য

হউক। গেরুয়া দিয়া সাধুত্বের ব্যবসায় ফাঁদিবার কোনও প্রয়োজন তোমার নাই। লোকে দেখিতে চাহিবে যে, তোমার চরিত্রের মধ্যে সত্য আছে, তপস্যা আছে, সাধন-নিষ্ঠা আছে, অকপট পরোপকার-বৃত্তি আছে, আত্মসুখ-বিলোপের প্রযত্ন আছে।

"গেরুয়া অনেকের জীবন-গঠনে সহায়তা করে, অনেকের সাধন-শীলতা প্রবর্দ্ধিত করে, অনেকের আত্মোন্নতির আনুকূল্য করে,--একথা কে না স্বীকার করিবে? এইরূপ স্থলে গেরুয়া গ্রহণ বাস্তবিকই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু গেরুয়া না পরিয়াই জীবন গড়িয়া তুলিতে পার কিনা, সেই চেষ্টার চূড়ান্ত কি দেখিয়াছ বাবা? টক্ করিয়া গেরুয়া পরিয়া ফেলিলেই কেহ মহাপুরুষ হইয়া যায় না। তিল তিল করিয়া নিজেকে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়া দিবার দীর্ঘ-কালব্যাপী সাধনাই তোমাকে মহাপুরুষ করিয়া তুলিবে। সদাচার-বিহীন, সাধনা-বর্জ্জিত, হুজুগ-বিলাসী, রসনাপরায়ণ, বহু-বাগ্-বিলাসী হঠাৎ-সন্ন্যাসীরাই যে ভারতের মঙ্গলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শত্রু, এই কথাটী ভাল করিয়া স্মরণে রাখিয়া চেষ্টিত হও, যে, দেশের প্রকৃত বান্ধব হইতে পার আর না-পার, কোনও প্রকারে তাহার শত্রু না হও।"

খাঁটি সেবক

ময়মনসিংহে আসিয়া অবধি এই কয়টী দিন শ্রীশ্রীবাবা সমগ্র প্রাতঃকাল অবিশ্রান্ত পত্র লিখিতেছেন। কোনও কোনও দিন পত্র-সংখ্যা চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে যাইতেছে। ইহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক পত্র এমন, যাহার নকল রাখিলে লোকের উপকারের সম্ভাবনা। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবার পক্ষে স্বয়ং একবার পত্র লিখিয়া আবার তাহার নকল রাখা অসম্ভব ব্যাপার। স্থানীয় কলেজের একটী ছাত্র মাঝে মাঝে আসিয়া সুযোগমত কয়েকখানা পত্রের নকল রাখিতেছেন। পত্র নকল করিতে করিতে যুবকটী বলিলেন,—এত পরিশ্রম বোধ হয় যুবক-সমাজের জন্য আর কেহ করে নাই।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কখানা চিঠি লিখেছি ব'লেই এত প্রশংসা জানাচ্ছ? কত কত মহাত্মা যে নিজেদের সমগ্র হৃদয়-মনকে সর্ব্বজীবের হিতকামনায়

নিঃশব্দে লাগিয়ে রেখেছেন, তাঁদের অপার অসীম অতুল শ্রমের কথা কখনো ভেবেছ ? যাঁর সেবার কথা লোকে যত কম জানে, তিনিই তত খাঁটি সেবক। দেশ এবং জগৎ যে আজ শত শত সহস্র সহস্র খাঁটি সেবকের সেবা চাচ্ছে।

নিরভিমানত্ব ও নীরবতা-প্রিয়তা

এই প্রসঙ্গে ক্রমশঃ নানা কথার অবতারণা হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সেবকের প্রথম ও প্রধান গুণ হবে, নিরভিমানত্ব। দ্বিতীয় গুণ হবে, নীরবতা-প্রিয়তা। অর্থাৎ নিজেকে যবনিকার পিছনে রেখে পরের কাজ ক'রে যাওয়া। কিন্তু এমন সময়, এমন প্রয়োজন, এমন পরিস্থিতি আস্‌তে পারে, যখন আত্মাভিমানের ছদ্মবেশ পর্‌তে হ'তে পারে, কলকোলাহল কত্তে হ'তে পারে। কিন্তু তা-ই তার স্থায়ী অবস্থা হবে না।

চিত্ত-শুদ্ধির আবশ্যকতা

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবা রেলের ওভারব্রীজের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। কতিপয় কলেজের ছাত্র আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

এই সময়ে রেলষ্টেশনের একটা ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই ঘণ্টাটা যেমন ব'লে দিচ্ছে, যাত্রীরা হুসিয়ার, গাড়ী এসে পড়্‌ল ব'লে, যার যার টিকিট কেন্‌বার কেন, যার যার মাল গুছাবার গুছাও, ঠিক তেমনি মানুষের অন্তরাত্মার কাছেই ভগবানের ঘণ্টা বেজে ওঠে, ওহে মানুষ তৈরী হও, মহৎ কর্ম্ম মহৎ ব্রত মহতী পরিকল্পনা উদ্‌যাপন কর্ব্বার জন্য তোমার আহ্বান এসেছে, তৈরী হও, জিনিষ গুছাও, প্রয়োজন হ'লে চির-তরে যে এদেশের মায়া পরিহার কত্তে হবে, তার জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু মানুষ তা শুন্‌তে পায় না। কাণের ভিতরে আবাল্য-সঞ্চিত সংস্কারের খইল জ'মে আছে, সেই ঘণ্টা-রব তার কাণে পৌঁছে না, কাণের চারপাশে ঘুরে-ফিরে আস্তে আস্তে সে রব মহাকাশে মিশে যায়। ভগবানের ডাক যাতে আসামাত্র শুনা যায়, তারই জন্য প্রয়োজন হচ্ছে চিত্তশুদ্ধির, সাধনার। তোমরা যারা বীর, চিত্ত শুদ্ধ কর, যেন ডাক এলেই শুন্‌তে পাও, আর, শোনা মাত্র ভগবানের কাজে অবহেলে আত্মবিসর্জ্জন দিতে পার।

জামালপুর (ময়মনসিংহ)
২৯শে চৈত্র, ১৩৩৮

সমদীক্ষিত ব্যক্তির জাতি

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা ময়মনসিংহ মেডিকেল স্কুলের একটী ছাত্রের সহিত জামালপুর আসিয়াছেন। মেডিকেল স্কুলের ছাত্রটী ব্রাহ্মণ-সন্তান। যাঁহাদের বাড়ী আসা হইয়াছে, তাঁহারা জাতিতে কায়স্থ।

ব্রহ্মপুত্র-নদে স্নান করিতে নামিয়াছেন, গৃহস্বামীর পুত্র এই সময়ে শ্রীশ্রীবাবার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ডাক্তারি ছাত্রটী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইনি ত' আমার গুরুভাই হ'লেন। এখন এঁর মাতাপিতার প্রতি আমার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ঠিক নিজ মাতাপিতার মত।

ডাক্তারী ছাত্রটী।—তাঁদের প্রণাম করা যায়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেন যাবে না? শুধু যায়, বল্‌লে অসম্পূর্ণ বলা হয়, প্রণাম করাই উচিত। কারণ, দীক্ষা কি জন্মান্তর-স্বীকৃতি নয়? দীক্ষাতে কি জাত্যন্তর ঘটে না? সমদীক্ষিত ব্যক্তিরা সব এক জাত।

প্রণামের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য

ডাক্তারী ছাত্র।—তা হ'লে গুরুভ্রাতার পিতা-মাতাকে পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করা যায়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই বিষয়ে আমি নির্ব্বিচারে কিছু নির্দ্দেশ দিতে পারি না। প্রণামের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য আছে। একটী হচ্ছে, সম্মান প্রদর্শন। অপরটী হচ্ছে, আধ্যাত্মিক উন্নতি সংগ্রহ। সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে প্রণাম, তাতে ভূমিষ্ঠ হ'তে পার, কিন্তু পাদস্পর্শ ক'রো না। আধ্যাত্মিক উন্নতি সংগ্রহের জন্য যে প্রণাম, তাতেই মাত্র পাদস্পর্শ বিধেয়।

কার পাদস্পর্শে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি কার পাদস্পর্শে হ'তে পারে? যাঁর জীবন আধ্যাত্মিকতায় ওতঃপ্রোত, যাঁর জীবনে সবটাই ভগবদ্-

ভক্তি, সবটাই ভগবৎ-প্রেম, সবটাই নিষ্ঠা, নির্ভর আর আত্মসমর্পণ। অবশ্য, কারো নিজ পিতামাতার জীবন যদি এমন নাও হয়, তবু তাঁদের পাদস্পর্শ কর্ত্তব্য। কারণ, তাঁদের জীবনের ভালমন্দ বিচার সন্তানের পক্ষে ক্ষতিকর, এবং তাঁদের দুজনকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-বিগ্রহ জ্ঞান করা সন্তানের কর্ত্তব্য।

নমস্কারাদির যৌগিক তাৎপর্য্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রণাম, নমস্কার এসব শুধু সামাজিক প্রথাই নয়, এর পশ্চাতে আর একটা যৌগিক তাৎপর্য্য র'য়ে গিয়েছে। যতবার যত জনকে প্রণাম কর বা নমস্কার জানাও, ততবার ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ ক'রে তোমার মনকে ভ্রূমধ্যসেবী করবার সুযোগ তুমি পাচ্ছ। এই তাৎপর্য্য যার জানা আছে, সে উচ্চ জাতিতে জ'ন্মে বা বয়োজ্যেষ্ঠ হ'য়ে বা উচ্চপদস্থ হ'য়েও নিম্নতর জাতির লোককে বা বয়ঃ-কনিষ্ঠকে বা নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে নমস্কারাদি জানাতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

জামালপুরের অরন্ধন

জামালপুর আসিয়া একটী অলৌকিক ঘটনার বিষয় শুনা গেল। কয়েক দিন আগে ব্রহ্মপুত্র-নদে নৌপরিচালনরত এক মুসলমান মাঝির নৌকায় গভীর রজনীতে নদী-মধ্যে হঠাৎ তিনটি আরোহিণীর আবির্ভাব ঘটে। নৌকা নদীর মাঝখান দিয়া চলিয়াছে, সুতরাং হঠাৎ তিনটি লোকের আবির্ভাব অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের আবির্ভাব এই সময়ে এক অচিন্তিতব্য ব্যাপার। তাঁহারা কে জিজ্ঞাসা করিলে রমণীরা বলিলেন, তাঁহারা একজন শীতলা দেবী, অপর দুইজন তাঁহার সহচরী। রমণীরা মাঝিকে আদেশ করিলেন, তাঁহাদিগকে নদীর ওপারে নামাইয়া দিতে। যাঁহারা নদীমধ্যগত নৌকায় জলে না নামিয়া উঠিতে পারেন, তাঁহাদিগকে পার করিয়া ডাঙ্গায় তুলিয়া দিবার সার্থকতা যে কি, মাঝি তদ্বিষয়ে কৌতূহলী হইলেও সাহস করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না। মাঝি রমণীত্রয়কে পার করিয়া দিলে তাঁহারা বলিলেন, আগামী ২৯শে চৈত্র যেন জামালপুরের সব লোক অরন্ধন করে। নতুবা কলেরা আর বসন্তে তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

দুই তিন দিনের মধ্যেই এই সংবাদ দাবানলের মত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ব্যাপারটী এমন ভাবে রাষ্ট্র হইল যে, আজকার দিন জামালপুরের দোকানপাট পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। ঘরে ঘরে লোকে দধি-চিড়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা শিববাড়ী দত্তগৃহে আসিয়াছেন। গৃহস্বামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, আহারের কি করা। শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—জামালপুরের লোকের জন্যই ত' মা অরন্ধন, আমি ত' আর জামালপুরের লোক নই!

"সাধু মহতের আশীর্ব্বাদ" বলিয়া গৃহস্বামিনী শ্রীশ্রীবাবাকে প্রণাম করিয়া খিচুড়ীর ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা ত ভোজন করিলেনই, গৃহের সকলেও খিচুড়ী প্রসাদই পাইলেন।

প্রতিবেশীরা সকলেই আজ অরন্ধন করিয়াছেন। সাধু দেখিতে অনেকেই আসিলেন। দেখিলেন, এবাড়ীর অরন্ধন ঘুচিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার প্রায় সকল বাড়ীতেই উনানে আগুন জলিয়া উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,— এঁদের কারো বাড়ীই বোধ হয় জামালপুর নয়!

অরন্ধন ও সংযম

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,— আচ্ছা স্বামীজী, এই যে মাঝে মাঝে অরন্ধন, এটীকে একপ্রকারের সংযম বল্‌বেন কিনা।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— কোনো কোনো অরন্ধনকে সংযম বল্‌ব বই কি, কিন্তু আজকের অরন্ধনকে সংযম বল্‌ব না। বনচারী বৃষপাল যখন বাঘের গায়ের গন্ধ পেয়ে প্রাণের ভয়ে তৃণ-ভোজন পরিত্যাগ করে, তখন তাকে সংযম বলা চলে না।

শ্রীবরদী (ময়মনসিংহ)

৩০শে চৈত্র, ১৩৩৮

প্রাতে ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা শ্রীবরদী পৌছিয়াছেন। শেরপুর হইতে চারি-ঘণ্টার পথ পদব্রজে আসিতে হয়।

ভ্রমের উপরে প্রতিষ্ঠিত জাতি-ভেদ

রাত্রে শ্রীবরদী থানার অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা তুলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বর্ত্তমান জাতিভেদ দাঁড়িয়ে আছে একটা মস্ত ভ্রমের উপর। সেই ভ্রমটি হচ্ছে দ্বিমুখ। এক মুখে উচ্চবর্ণগুলিকে সে শুনাচ্ছে, "কদাচারী হ'লেও তোমরা শ্রেষ্ঠ", আর এক মুখে নিম্নবর্ণগুলিকে সে শুনাচ্ছে, "সদাচারী হ'লেও তোমরা নিকৃষ্ট।"

জাতিভেদ দূর করিবার চেষ্টার মধ্যে ভ্রম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জাতিভেদকে দূর করবার জন্য যে চেষ্টা হচ্ছে, তাও আবার আমরা ভ্রমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত কচ্ছি। সদাচারী, সংযমী ক'রে এক না ক'রে, সবাইকে কদাচারী আর অসংযমী ক'রে এক কত্তে চাচ্ছি। অর্থাৎ সমগ্র জাতিকে ব্রাহ্মণে পরিণত কর্ব্বার চেষ্টা না ক'রে প্রকারান্তরে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে কদাচারী শূদ্রে পরিণত কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছি।

শ্রীবরদী।

৩১শে চৈত্র, ১৩৩৮

বলা, শুনা ও করা

অদ্য অপরাহ্নে থানার মাঠে বহুজন-সমাগম হইয়াছে। তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। শ্রীশ্রীবাবা প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। সকলেই বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমরা সৎকথা বল্‌তেও ভালবাসি, শুন্‌তেও ভালবাসি, কিন্তু তদনুযায়ী কাজ কত্তে ভালবাসি না। ধর্ম্ম যে মানুষকে উদার করে, মুখে তা' স্বীকার করি, কিন্তু দলাদলি ক'রে এক পুকুরের তিন ধারে তিনটা মসজিদ গড়্‌তে দ্বিধা করি না। সকল ধর্ম্মই এক ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে, একথা মুখে স্বীকার করি, কিন্তু মসজিদের কাছে মন্দির থাক্‌লে পরস্পর লাঠালাঠির সুযোগগুলি আর পরিহার করি না। কেমন, তাই নয় কি? তাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এমন অভ্যাসের সাধন করা, যাতে যা আমরা ভাল ব'লে বলি, ভাল ব'লে শুনি, ভাল ব'লে বুঝি, তদনুযায়ী কাজও কত্তে পারি।

শ্রীবরদী

১লা বৈশাখ, ১৩৩৯

ব্রহ্মপুত্র-স্নান

শ্রীযুক্তা উমাদেবীর মাতা সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন। আজ বৎসরের প্রথম দিন বলিয়া তিনি কিয়দ্দূরবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে যাইতে উদ্যতা হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবাকে তিনি প্রশ্ন করিলেন যে, বাবাও ব্রহ্মপুত্র-স্নানে যাইবেন কিনা।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে শিরঃসঞ্চালন করিয়া জানাইলেন যে যাইবেন না।

উমাদেবীর মা বলিলেন,—হঁা, ঠিক্ কথাই ত। আপনি আবার ব্রহ্মপুত্র-স্নানে যাবেন কেন? আপনি নিজেই ত' ব্রহ্মপুত্র!

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—এ কথাটা মিছে নয়। আমি, কালীপ্রসন্ন, চম্, কম্, এঁরা সবাই ব্রহ্মেরই পুত্র। আপনি, উমা, আরতি, অঞ্জলি সবাই ব্রহ্মেরই কন্যা। কথা মিথ্যা নয়।

উমাদেবীর মা স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীবাবা শ্রীযুক্তা উমারাণী দেবীকে বলিলেন,—দেখ্ মা উমা,

তীর্থ তীর্থ বলি' সবে করিছে ভ্রমণ,
কেহ নাহি জানে তীর্থ আপনার মন।

নিজের মনে নিজে ডোবা, নিজের মনে নিজে মজা-ই হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র-স্নান।

নববর্ষের কবিতা

শ্রীযুক্তা উমা তাঁর নববর্ষের দুই লাইন একটী কবিতা আনিয়া শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণে উপহার দিলেন। শ্রীশ্রীবাবা সানন্দে তাহা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া পাটখড়ির কলম দিয়া রঙ্গীন কালী দিয়া সুদৃশ্য মোটা মোটা হরফে কাগজের উপরে লিখিয়া দিলেন,—

প্রাণ-মাঝে যদি সত্য দেবতারে চাও,
নিঃশেষিয়া আপনারে তাঁর পায়ে দাও।

২রা বৈশাখ, ১৩৩৯

যুবকদের চাকুরী

প্রাতে সোয়া সাতটায় শ্রীবরদী হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যা সাতটায় শ্রীশ্রীবাবা ময়মনসিংহে আসিয়া পৌঁছিলেন। বারো মাইল পথ হাঁটিয়া, জামালপুর পর্য্যন্ত মোটর বাসে, সিংজানী ঘোড়ার গাড়ীতে এবং তৎপর রেলে আসিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে আহার হয় নাই।

কিন্তু ময়মনসিংহ আসিয়াই দেখিলেন বহু যুবক উপদেশ-প্রার্থী হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবা সহাস্যবদনে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জ্ঞাতব্য জানিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা উপদেশ করিলেন।

চলিয়া যাইবার সময়ে যুবকদের খেয়াল হইল যে, শ্রীশ্রীবাবার এখন স্নান, বস্ত্রপরিবর্ত্তন ও আহারাদি করা দরকার।

তখন শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হাঁ, এখন আমি স্নান-ধ্যান সারব, পরে আহার কর্ব্ব। তোমরাই আমার আসল মনিব কিনা, তাই আগে তোমাদের চাক্‌রী বজায় রাখলুম, তারপরে নিজের কাজ দেখব।

যুবকেরা শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে মস্তক অবনত করিলেন।

ময়মনসিংহ

৩রা বৈশাখ, ১৩৩৯

ব্রহ্মপুত্র-তীরে প্রাতর্ভ্রমণ হইতেছে। বরিশাল নিবাসী একটী যুবক স্থানীয় কলেজে পড়েন,—তিনি শ্রীশ্রীবাবার পদানুসরণ করিলেন এবং প্রতিবেশী একটী কুমারী মেয়ের চরিত্রোন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত কতকগুলি নির্দ্দেশ চাহিলেন।

মেয়েদের চরিত্রোন্নতির জন্য যুবকদের কার্য্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মেয়েদের মধ্যে কাজ করার জন্য সুযোগ খুঁজে বের করো না। সে চেষ্টা করবে মহিলা কর্ম্মীরা। কোনো বিভ্রান্ত মেয়েকে সৎপথে চালাবার আবশ্যকতা যদি পড়ে, সাধারণ ক্ষেত্রে তার জন্য অপর একটী মেয়ের মধ্য দিয়েই কাজ চালান উচিত। তুমি নিজে কতটুকু সুগঠিত হয়েছ,

তাত' তোমার জানাই আছে। আবার, এটাও জেনো, অপরের গায়ে কাদা দিতে গেলে যেমন নিজের গায়ে কাদা লাগে, অপরের গায়ের কাদা ধু'তে গেলেও তেমন কিছু কাদা গায়ে লাগে। তবে, যাঁরা উন্নত ও মহৎ, যাঁরা উচ্চাবস্থাপন্ন, তাঁদের পক্ষে পর-চরিত্র সংশোধিত কত্তে গিয়েও নিজের চরিত্র অকলঙ্ক রাখা সম্ভব।

যৌনতাড়না-ঘটিত বিষয় ও পরচরিত্র-সংশোধন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,- মানব-চরিত্রের সকল দিকের চাইতে ইন্দ্রিয়-লালসা-মূলক দিকটা বেশী জটিল। এত জটিল যে, এই বিষয়ে কারো কোনো সমস্যা এলে অপরে যখন সে সমস্যার সমাধান কত্তে যায়, তখন অনেক সময়ে বাহ্যতঃ নিজের ভালো-মানুষত্ব বজায় রাখ্‌তে সমর্থ হলেও সমাধানকারী নিজেই হয়ত জালে জড়িয়ে যান। বিশেষতঃ একটী যুবতী মেয়ে যখন এই জাতীয় সমস্যায় পড়ে, আর একটী পুরুষ যখন যায় তাকে সমস্যা থেকে বাঁচিয়ে নেবার জন্য। মধ্য যুগে খ্রীষ্টানদের ভিতরে Confession (আত্ম-স্বীকৃতি) ব'লে একটা প্রথা ছিল। নরনারীরা পাপক্ষালনের ভরসায় পাদ্‌রীর নিকটে গিয়ে নিজেদের জীবনের সব গুপ্ত পাপকাহিনী বর্ণন কত্ত। এর ফলে, পরের গুহ্য সংবাদ শুনে শুনে ক্রমশঃ অধঃপতিত হ'তে হ'তে কত যে ধর্ম্মযাজক নরকের শেষ সীমায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তার ইয়ত্তা নেই। এই সব ঘটনা থেকে প্রত্যেক সাধারণ মানবের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। যৌন-তাড়না-ঘটিত বিষয়ে কারো চরিত্রোন্নতি কত্তে যাবার সময়ে নিজ অন্তরের প্রকৃত অভিপ্রায়কে তীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা করা উচিত। কারণ, এমনও দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে, একজন যে মনে কচ্ছে, সে অপরের মঙ্গল সাধনের জন্য ইন্দ্রিয়-সংযমের উপদেশ ও উৎসাহ দিচ্ছে, হয়ত প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাও তার প্রচ্ছন্ন কামেরই একটা মূর্ত্তিবিশেষ।

বর্ব্বরের কাম ও সভ্য-সমাজের কাম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,-- কামের প্রচ্ছন্নচারিত্বই তার এক অদ্ভুত বিশেষত্ব। পশুর কামের কথা বলছি না, মানুষের কাম। যার পদ্ধতিবদ্ধ ভাষা আছে,

সাহিত্য আছে, সভ্যতা আছে, সেই মানুষের কাম। যে মানুষ যত বর্ব্বর, তার কাম তত সহজ-প্রকাশ। যে মানুষ যত বেশী সভ্য, তার কাম তত প্রচ্ছন্ন-প্রকাশ।

প্রচ্ছন্ন কামও পর-সংশোধনের চেষ্টার প্রেরক হইতে পারে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,---এই জন্যই একটী বিপথ-গমনোদ্যতা মেয়েকে পাপপথ থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার যখন ভিতরে আকুলি-ব্যাকুলি উপস্থিত হয়, তখন তোমার খুব খর-চক্ষে পরীক্ষা ক'রে দেখা উচিত যে, এটা সত্যই কি তোমার নিখুঁত কল্যাণৈষণা, না, একটু খাদ এতে আছে। যেমন ধর, ব্রাহ্ম-সমাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন কত কত মহদন্তকরণ ব্যক্তি ঐ সমাজটীর ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁদের ছিল প্রচণ্ড স্বাধীন মত, তীব্র বিচার-বুদ্ধি, জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম, ব্যাকুল পরহিতৈষণা। আমি বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনেছি যে, তাঁদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটী দল বাজারে বেশ্যাদের চরিত্রোন্নতি সাধনে ব্রতী হলেন। দেশে ও সমাজে তখন আরো কত কাজ ছিল, কিন্তু এইটীই এই ক্ষুদ্র দলটীকে আকর্ষণ কল্ল এবং পরিণামে দুই একজন অবস্থা বেগতিক দেখে ঐ পন্থা ছাড়্‌লেন, বাকী কজন গোল্লায় গেলেন।

বলাবল বুঝিয়া কাজ কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই যে গোল্লায় যাওয়া, তার দুটী কারণ থাকতে পারে। একটী এই যে, প্রচ্ছন্ন কাম কাউকে কাউকে অপর শত শত কাজ কর্ব্বার পথ খোলা থাকতে ও ঐ পথে নিয়ে গেল এবং সংসর্গের ফলে প্রচ্ছন্নটা দ্রুত প্রকাশ্য মূর্ত্তি ধারণ ক'রে তাদের স্কন্ধবিদারণ পূর্ব্বক বক্ষরক্ত পান কর্ল্ল। অপর কারণ হ'তে পারে এই যে, নিজেদের বলাবল না বুঝে কেউ কেউ কাজ কত্তে গিয়েছিলেন, প্রচ্ছন্ন কামের তাড়নায় নয়; যতক্ষণ বলক্ষয় হয় নি, ততক্ষণ বেশ কাজ এগিয়ে গেল, কিন্তু ক্রমশঃ বলক্ষয় যখন সুরু হল, তখন আর তাঁরা সে চোট সাম্‌লে যেতে পারলেন না, মুখ থুব্‌ড়ে পতন-গুহায় প'ড়ে গেলেন। এই জন্যই নিজ বলের পরিমাণ বুঝে প্রত্যেকের উচিত কর্ম্মে অগ্রসর হওয়া। তুমি অবশ্যই বল্‌তে পার যে, চখের উপরে একটী লোককে জলে

ডুবে যেতে দেখেও জলে ঝাঁপ দিয়ে তাঁকে বাঁচাব না? আমি বলি বাঁচাবে, যদি নিজে সাঁতার জানো। যে সাঁতার জানে না, সে যদি যায় ঝাঁপ দিতে, তা হ'লে সে হয়ত তাড়াতাড়ি ডুববার সাহায্যটাই ক'রে বস্‌বে।

জলে না নামিয়া সাঁতার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একথাও তুমি তুল্‌তে পার যে, জলে না নাম্‌লে সাঁতার শিখ্‌ব কি ক'রে? আমি তাও স্বীকার করি। সাঁতার শিখতে হ'লে জলে নাম্‌তে হয়। কিন্তু সে কথা হচ্ছে নিজের দিকে তাকিয়ে, নিজেকে রক্ষার দিকে তাকিয়ে, পরের দিকে তাকিয়ে নয়, পরকে রক্ষা করার দিকে তাকিয়ে নয়। একটী লোক ঘোড়ায় চড়্‌তে চায়, তখন তাকে বলা চল্‌বে না যে, আগে চড়তে শেখ, পরে ঘোড়ায় উঠো। একটী জাতি স্বাধীন হ'তে চায়, তখন তাকে বল্লে চল্‌বে না যে, আগে যোগ্য হও, পরে স্বাধীনতা পাবে। কারণ, আছাড় প'ড়ে প'ড়েই মানুষ ঘোড়ায় চড়া শেখে, হোঁচট খেয়ে খেয়েই জাতি স্বাধীনতার যোগ্য হয়। কিন্তু একজন নিজে ঘোড়ায় চড়্‌তে না শিখেই যদি অপরকে শেখাতে যায়, তা হ'লে সে ত' ঘোড়ার লাথি খেয়ে মারা যাবে! যে জাতি নিজে স্বাধীন নয়, সে যদি অপর জাতিকে স্বাধীন কত্তে যায়, তবে ত' তাদের মুখপাত্রেরা বিদেশ থেকে চাবুক খেয়ে ঘরে ফির্‌বে। এজন্য পরকে যে সন্তরণ শেখাতে চায়, তার নিজের আগে শিখ্‌তে হবে। পরকে যে অশ্বারোহণ শিখাতে চায়, তার নিজের আগে শিখতে হবে। পরকে যে স্বাধীন কত্তে চায়, তার নিজের দাসত্বশৃঙ্খল আগে ছিন্ন কত্তে হবে। আজকালকার অনেক গানের-ওস্তাদদের দেখ্‌তে পাচ্ছ ত? নিজেরা কিচ্ছু জানেন না, অথচ গান শিখিয়ে বেড়াচ্ছেন। অর্থাৎ সঙ্গীতের নাম ক'রে লোককে কোলাহল শেখাচ্ছেন। ফলে সঙ্গীতের প্রসার না হয়ে হচ্ছে সঙ্গীতের সমাধি।

সন্তরণ শিখিবার আগেও আত্মগঠন ভাল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিজেকে রক্ষা করবার জন্য সাঁতার শেখা, তাতে ত' জলে নেমে সঙ্গে সঙ্গেই শিখবার চেষ্টা কত্তে হয়। এতে সন্দেহ

নেই। কিন্তু জলে নামবার আগেও এমন কতকগুলি শারীরিক অনুশীলন আছে, যেগুলি ক'রে নিলে সহজে শেখা যায়, ভাল ক'রে শেখা যায়। জান্‌বে, এই কথাটীও একেবারে তুচ্ছ করার মতন নয়।

বড় গাছের গুঁড়ীর সঙ্গে কোমর বাঁধ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে ক্ষেত্রে তোমার আত্মরক্ষার অতিরিক্ত সন্তরণ শিক্ষা হয় নি, অথবা বলতে কি, আত্মরক্ষার পক্ষেও তোমার শিক্ষা পর্য্যাপ্ত নয়, সেখানে তুমি মজ্জনোন্মুখকে বাঁচাবার জন্য ঝাঁপ দিতে পার না বটে, কিন্তু চীৎকার ক'রে উপযুক্ত ব্যক্তিদের সাহায্যকে আকর্ষণ কত্তে পার। অথবা ডাঙ্গায় থেকেই এক টুকরা দড়ি ছুঁড়ে দিতে পার। অথবা একটা কলাগাছের খণ্ড ভাসিয়ে দিতে পার। অথবা একটা শক্ত দড়ির এক প্রান্ত একটা বড় গাছের গোড়ায় বেঁধে আর এক প্রান্ত নিজ কোমরে বেঁধে তারপরে "জয় পরমেশ্বর" ব'লে ঝাঁপ দিতে পার।

যৌন-তাড়নায় বিশেষজ্ঞ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি নিজেই বহুবার বলেছি, পার আর না পার, চেষ্টার ত্রুটী ক'রো না, মর আর বাঁচ, তরঙ্গ দেখে ভয় পেয়ো না। সেটা দেশের অপর সর্ব্ববিধ সেবা সম্বন্ধে, বাদে যৌন-তাড়নাঘটিত বিপন্নের উদ্ধার। যৌন-তাড়না এমন ব্যাপার, যার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। সেই বিশেষজ্ঞ জানেন, কেমন ক'রে কাণের কাছে কথা না কয়েও প্রাণের মাঝে উপদেশ পৌছান যায়। সেই বিশেষজ্ঞ জানেন, কেমন ক'রে ঠোঁট দিয়ে কথা না ক'য়েও প্রাণ দিয়ে কথা কইতে হয়। যৌন-তাড়না রোগের যাঁরা চিকিৎসক, তাঁরা সংশোধন করেন, বাক্য বা ব্যবহারকে নয়, মনকে। মনের সংশোধনের সাথে সাথে বাক্য বা ব্যবহার আপনি বদলে যায়।

চিন্তার ক্ষমতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি ত' আগেই বলেছি, নিমজ্জমান ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য তোমাকে চীৎকার কত্তে হবে। সেই চীৎকার কণ্ঠে নয়। সে চীৎকার মনে মনে। "হে পরমাত্মা, এই দুর্ভাগ্য জীবের বিপথ-চারণ বন্ধ

কর, বন্ধ কর,"—ব'লে আকুল ক্রন্দন ভগবানের পায়ে তোমাকে পাঠাতে হবে। সেই ক্রন্দনের রোলে জগতের প্রত্যেক সদাত্মার হৃদয় কেঁপে উঠ্‌বে, কেঁদে উঠ্‌বে এবং যিনি এই বিপথ-গমনোদ্যতা যুবতীকে রক্ষা কর্ব্বার উপযুক্ত, তিনি ঠিক্ সময়মত এসে একে রক্ষা কর্ব্বেন। ওষ্ঠ তোমার চুপটী ক'রে থেকেও অনেক কথা বলতে পারে, মনটী যদি অবিরাম নৈতিক-বিপদাপন্ন ব্যক্তিটীর জন্য আর্ত্ত-চীৎকার কত্তে জানে।

স্বেচ্ছায় ঘনিষ্ঠতা বাড়াইও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি অবশ্য তোমাকে একটা সাধারণ নীতির কথাই মাত্র বলেছি। অসাধারণ ক্ষেত্র নেই, তা নয়। ব্যতিক্রম স্থলও হ'তে পারে। জগতে বিচিত্রতা কম নয়। সেই সব স্থলে নিজেই হয়ত ছুটে যেতে হবে, যোগ্যতর ব্যক্তির আস্‌বার জন্য প্রতীক্ষা করা হয়ত ভুল হবে। কিন্তু তুমি যে নির্দ্দিষ্ট ঘটনাটির কথা বল্‌ছ, তার সম্পর্কে সাধারণ নীতিই প্রযোজ্য। অবিরাম ভগবানকে বল,—"এ মেয়েটী ভক্ত হোক, শান্ত হোক, সুশৃঙ্খল হোক, অচপল হোক।" তাতেই এর কল্যাণের পথ খুলে যাবে। তুমি তার কাছ থেকে দূরে থাক। চেষ্টা ক'রে, যত্ন ক'রে ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধন কত্তে যেও না। আপনা থেকে যদি ঘটনাবলির এমন আবর্ত্তন আস্‌তে থাকে যে, তোমার চেষ্টা-নিরপেক্ষভাবেই ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল, তখন বরং তাকে প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহারে আন্‌বার চেষ্টা কর।

বিছানায় বসিয়া নামজপ

দ্বিপ্রহরে একটী ভদ্র মহিলা শ্রীশ্রীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেহ ঘুমাইয়া থাকিলে তার বিছানায় বসিয়া নামজপ চলে কিনা।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চলে। এ ঘরে ঘুমন্ত, জাগ্রত, মানুষ, বিড়াল, ইঁদুর, আরসোলা সকলের এতে কল্যাণ। তবে সঙ্কল্পের জপ চলে না। সে জপে সর্ব্বজনস্পর্শ-বর্জ্জিত ও সংস্রব-বিরহিত ভাবে বস্‌তে হয়।

সঙ্কল্পের জপ

মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন যে সঙ্কল্পের জপ বলিতে কি বুঝিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষা-গ্রহণ মাত্রই ত' সঙ্কল্প করা হয়েছে যে, প্রত্যহ প্রাতে, দুপুরে ও সায়ংকালে ইষ্টনাম জপ কর্ব্ব। সুতরাং এই তিনবারের জপকে সঙ্কল্পের জপ বলতে হবে। এ ছাড়া সঙ্কল্পের জপ অন্য রকমও হ'তে পারে। যেমন, আমি সঙ্কল্প করেছি যে, অমুকের চরিত্র-সংশোধনের জন্য এক লক্ষ জপ কর্ব্ব। তুমি সঙ্কল্প কর্‌লে যে, অমুকের রোগারোগ্যের জন্য দশ লক্ষ জপ কর্ব্বে। এ সব জপ শুচিতা রক্ষা ক'রে এবং অপরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্পর্শ বর্জ্জন ক'রেই করা উচিত।

দেশ-পর্য্যটন-কালে জপ

মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হয়ত এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাচ্ছি, রেল, ষ্টীমার, নৌকা বা মটরে যেতে হচ্ছে। তখন নাম-জপ সম্পর্কে কি করা?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমাদের সাধনে এই বিষয়ে কড়াকড়ি নেই। জপের সময় হয়েছে ত' জপ সুরু ক'রে দাও। রেল বা ষ্টীমারের ভিতরে যতটুকু অপরের সংশ্রব বর্জ্জন সম্ভব, তা কর, কিন্তু সময়কে বৃথা অতিক্রান্ত হ'তে দিও না। সময়মত জপ ক'রে যাও। তবে লক্ষ্যে পৌঁছে যদি সুবিধে বোধ কর, তবে স্নানাদি সেরে পুনরায় তোমাকে একবার অতিরিক্ত ক'রে জপে বস্‌তে ত' কেউ নিষেধ কচ্ছে না!

স্নানাদির আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামের গুণে ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয়, সুতরাং পবিত্র হবার জন্য তোমার স্পর্শ-বর্জ্জন বা স্নানাদি নয়। স্নানের ফলে বা অন্ততঃ ভাল ক'রে হাত-পা, মুখ-চোখ ধৌত করার ফলে মনঃসংযমের ক্ষমতা সাময়িক-ভাবে বেশ একটু আসে। তারই জন্য স্নানান্তে বা গাত্র-পাবনান্তে ধ্যান-জপাদি প্রশস্ত। আর, স্পর্শ-বর্জ্জনে নিবিষ্টভাব সহজে আসে।

রজস্বলা অবস্থায় নামজপ

মহিলাটী জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্ত্রীলোকদের মাসে মাসে শরীর খারাপ হয়। সেই সময়ে নামজপের কি করা?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পাইখানায় ব'সে মলত্যাগ কালেও নাম-জপ কর্ব্বে, এই উপদেশ যাদের ধর্ম্মে, তাদের পক্ষে রজস্বলা অবস্থায় ধ্যান-জপ নিষিদ্ধ হ'তে পারে না। রজস্বলা নারীকে রুগ্ন ব'লে মনে করা উচিত, অশুদ্ধ ব'লে জ্ঞান করা উচিত নয়। রুগ্ন ব্যক্তি কি নাম জপ করে না? করে, কিন্তু ঠাকুর ঘরে গিয়ে নয়, একটু নিরিবিলিতে, ধর—নিজের বিছানাতে ব'সেই জপ করে। রজস্বলা নারীও তাই কর্ব্বেন। খ্রীষ্টান বা মুসলমান ধর্ম্ম ত' রজস্বলা নারীকে অপবিত্র মনে করেন না, কিন্তু হিন্দুরা তা' করেন। হিন্দুদের এই আচারটীর মূলে গভীর সদুদ্দেশ্য আছে, সুতরাং এই আচারটীকে পালন করা সঙ্গত, রজস্বলা নারীর অস্পৃশ্যভাবে থাকাই ভাল। কিন্তু তাই ব'লে অপরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি পরিধান ক'রে একটা প্রেতিনী সেজে অস্বাস্থ্যকরভাবে অবস্থান কখনও মঙ্গলপ্রদ নয়। গৃহে যদি নামব্রহ্ম বা অন্য কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তবে রজোমতী অবস্থার তিন দিন তার সেবা-পূজা থেকে নিজে দূরে থাকাই সঙ্গত।

রজোমতী অবস্থায় দেশ-পর্য্যটন

মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রজোমতী অবস্থায় দেশ-পর্য্যটনকালে অপরকে স্পর্শাস্পর্শ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য।

শ্রীবাবা বলিলেন,—এ অবস্থায় দেশ-পর্য্যটন উচিতই নয়। তবে যদি কেউ তার পুত্রের কঠিন রোগের সংবাদ শুনে বিদেশে রওনা হয়, আর ঐ সময়ে তার এ অবস্থা ঘটে, তবে তখন সে নিজ বিবেচনামত যা করবার কর্ব্বে। এ বিষয়ে তাকে আমি আর কোনো পাঁতি লিখে দিতে যাচ্ছি না।

শিশু কোলে লইয়া নামজপ

মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—শিশু কোলে নিয়ে ধ্যান-জপ করা যায় কিনা।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যায়, কিন্তু শুধু শিশুটীর কল্যাণের জন্য। আত্ম-কল্যাণের জন্য যে জপ, তাতে ইচ্ছাকৃত স্পর্শ পরিহার কত্তেই হবে।

মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, জপ করিতে বসিলে যদি কোনও শিশু আসিয়া ছুঁইয়া দেয়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাতে না ছোঁয় তার ব্যবস্থা জপে বস্‌বার আগে ক'রে নেবে। তারপরেও যদি ছোঁয় ত' ছুক্ গে! তা নিয়ে আর মাথা গরম ক'রে লাভ কি ?

শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ-তত্ত্ব

টাঙ্গাইলের একটী যুবক আসিয়া শ্বাস ও প্রশ্বাসে নাম-জপের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শ্বাস আর প্রশ্বাস যেন দুটী সেতু। একটী সেতু দিয়ে তুমি পাঠাচ্ছ তোমার অন্তরাত্মাকে তোমার পরম প্রেয়ের নিকট অভিসারে, আর একটা সেতু দিয়ে তিনি পাঠাচ্ছেন তাঁর আনন্দঘন স্নেহকে তোমার সাথে মিল্‌বার জন্য। এভাবে দুজনের আত্মিক মিলন সাধিত হচ্ছে, একবার বাইরে, একবার ভিতরে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের বিরতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু এই যে মিলন, এ যেন আংশিক মিলন। নিজের অন্তরাত্মাকে পাঠাচ্ছ অভিসারে, কিন্তু তুমি যেন তোমার সবখানি যাও নাই। তিনি আস্‌ছেন তোমার কাছে, কিন্তু তিনি যেন তাঁর সবখানি নিয়ে আসেন নি। কতকটুকু 'তুমি' এখানেই পড়ে আছ, কতকটুকু 'তিনি' সেখানেই রয়ে গেছেন। এই অবস্থায় আস্তে আস্তে ব্যবধানের জলা খাল ভাবের পলিতে ভ'রে যায়, সেতু উঠে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাস আপনি থেমে যায়, তিনি আর তুমি এক হ'য়ে যাও। এখানে শ্বাস-প্রশ্বাসের পূর্ণ বিরতি, যোগীরা যাকে বলেন স্থির-কুম্ভক।

গুরুকৃপা ও পুরুষকার

অপর একজন যুবক বলিলেন,—লোকে বলে গুরুকৃপায়ই সব হয়, পুরুষকার কিছুই নয়।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমিও ত' তাই বলি, আর তার জন্যই ত' প্রাণপণে কোদাল মারি, প্রাণপণে দেশ ঘুরি, প্রাণপণে চিঠি লিখি, আর প্রাণপণে নাম জপি।

যুবক বলিলেন,—মানে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরুসঙ্গই তোমার পুরুষকারকে উৎসাহ প্রদান করে। এটাই হচ্ছে তাঁর কৃপা।

ভবিষ্যতের গুরু

অন্যান্য নানা কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা একজনকে বলিলেন,—আমার যা ধারণা, আমার পরে আমার গোষ্ঠীতে আর কেউ গুরু থাক্‌বেন না। বিধি-অনুযায়ী দীক্ষার্থীর দীক্ষার ব্যবস্থা থাক্‌বে, কিন্তু ব্যক্তিগত গুরু কেউ থাক্‌বেন না। তখন শিষ্যগুলি গুরুকৃপা অনুভব কর্ব্বে কার সঙ্গ ক'রে বল ত ?

পৃষ্ট ব্যক্তি নিরুত্তর রহিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামই হবেন তখন প্রত্যক্ষ গুরু। তাঁর সেবাই হবে গুরুসেবা। তাঁর পূজাই হবে, গুরুর পূজা। তাঁর কৃপাই হবে গুরুর কৃপা। জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতারা গুরুকে দেখিয়ে দিবেন, কিন্তু কেউ এসে স্বয়ং গুরু হবেন না বা গুরুত্বাভিমান পোষণ কর্ব্বেন না।

ময়মনসিংহ

৪ঠা বৈশাখ, ১৩৩৯

দীক্ষা ও সাধনা

ঢাকা বাংলা-বাজারের একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা এক পত্রে লিখিলেন,—

"নামে দীক্ষিত হইলেই চলিবে না, কাজেও তাহার প্রমাণ থাকা চাই। সাধন করা চাই. নামের অমৃত-রস সাধন-বলে নিষ্কাশিত করিয়া আকণ্ঠ তাহা পান করা চাই, সংসারের নিয়ত-মৃত্যু-ময় মহাবিষের জ্বালা জীর্ণ করিয়া অমর হওয়া চাই।

"কিন্তু সাধনা বলিতে আলস্য বুঝিলেও চলিবে না। তোমার সাধনা কর্ম্মময় জীবনের সাধনা, অফুরন্ত শ্রম-প্রবাহের তরঙ্গে তরঙ্গে ঐশ্বরিকী স্মৃতি উদ্দীপনার সাধনা, জীবন ও মৃত্যুকে সমজ্ঞান করিয়া শুভ ও অশুভকে সমান দৃষ্টিতে দেখিয়া নির্ভীক্ অন্তরে নিজ নিজ স্বাভাবিক কর্ত্তব্যে অটল অচল রহিবার সাধনা। তুমি যদি পরমুখাপেক্ষী হও, কাপুরুষ হও, অলস নিরুদ্যম

হও, আমি স্বীকার করিবনা যে তুমি কখনও সাধন করিয়াছ। ভাগবতী চেতনা হউক তোমার অন্তরময়, প্রতি কর্ম্মে প্রতি চেষ্টায় তুমি পরমাত্মার অননুমেয় শক্তিরই লীলা দেখিয়া নিজ জীবনকে অননুকরণীয় নিপুণতার সহিত মঙ্গলের পথে উৎসর্গের পথে নিয়ন্ত্রিত কর।"

নির্ভর করহ নামে

ত্রিপুরান্তর্গত কোনও এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"নির্ভর করহ নামে
সব ভয় দূরে যাবে,
উদ্যম, উৎসাহ, শক্তি,
শান্তি, সহিষ্ণুতা পাবে।

বাহুর পশ্চাতে রাখ
বীর্য্যময় মহানাম,
বিশ্বের কল্যাণে তব
পূর্ণ হবে মনঃকাম।

পরিহরি' দুর্ব্বলের
উচ্চরোলে হাহাকার
হও অনুক্ষণ তাঁর,
লক্ষ ত্রিভুবন যাঁর।

সম্মুখে পশ্চাতে আর
দক্ষিণে ও বাম-ভিতে,
জাগাও নামের ধ্বনি
দেহে, মনে, প্রাণে, চিতে।

নির্ভর করহ নামে,
নিত্য, সত্য, সারাৎসার
নির্ব্বাসিত হবে দুঃখ,
ক্লেশ, দ্বন্দ্ব, অন্ধকার।"

স্ত্রীকে লইয়া সুখী হইবার উপায়

ঢাকা-লালবাগ নিবাসী জনৈক নব-বিবাহিত যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সাধনানুরাগ-বৃদ্ধিই বিবাহিতা নারীর সকল শিক্ষার মূল উপাদান। এই একটী জিনিষ তরুণীর হৃদয়-মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারিলে সহজে সে সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, দাম্পত্য ভালবাসা ও সাংসারিক কর্ত্তব্যের সকল সত্য রহস্য বিনা ক্লেশে অধিগত করিতে পারিবে। সকলেই বিবাহ করে স্ত্রীকে লইয়া-সুখী হইবার জন্য কিন্তু যেভাবে তাহাকে গড়িয়া লইলে সমগ্র জীবন সুখে যাইবে, তেমন ভাবে গড়িয়া লইতে চাহে না। তুমি কিন্তু বাবা এই সব নির্ব্বোধ গৃহীদের অনুকরণ করিও না। নিজের তপস্যা-নিষ্ঠা আগে বাড়াও এবং তপস্যার এই নিষ্ঠা তোমার পত্নীর মধ্যে তোমার সংসর্গের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কর। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অপরিসীম প্রেম সৃষ্টি কর এবং এই প্রেমকে ভগবৎ-সাধনার আলোকে উজ্জ্বল, মধুর, পীযূষ-নিঃস্যন্দী করিয়া লও। প্রেমই জগতের পরমামৃত এবং সেই অমৃত সাধন-সমুদ্র মন্থন করিতে করিতেই দেব-মানবের আয়ুঃ, বল, সাহস, শৌর্য্য, উৎসাহ ও উদ্যম বৃদ্ধির জন্য আবির্ভূত হয়।"

নামের সেবায় ব্যয়িত সময় অপব্যয় নহে

ঢাকা-পাটুয়াটুলী নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"সহস্র প্রকার বিচিত্র অবস্থা এবং অপ্রত্যাশিত বৈপরীত্যের মধ্যে নিয়ত পড়িতে হইতেছে বলিয়াই নামের সেবা ছাড়িয়া দিও না। বরং বৈচিত্র্য ও বিরুদ্ধতার অসংখ্য তরঙ্গ-তাড়নের পূর্ণ সুখাস্বাদ আদায় করিয়া লইবার জন্যই প্রবলতর দৃঢ়তা, কঠোরতর অধ্যবসায়, গভীরতর নিষ্ঠা ও নিবিড়তর নিবিষ্টতা সহকারে নামের সাধনায় নিমগ্ন হওয়া আবশ্যক। তোমার চিত্ত যে একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে, এখান হইতেই তাহা টের পাইয়াছি। মনকে প্রাণপণে সাম্‌লাও, প্রেমমধুময় মঙ্গল-মহা-নামের পরম স্নেহবেষ্টনে তাহাকে বাঁধিয়া লও। ইহাতেই কর্ম্মপন্থা সহজতর, সুগমতর ও সুন্দরতর হইবে। নামের

সেবায় যে সময়টুকু যায়, তাহা খরচ নহে, বরং চক্রবৃদ্ধির হারে লাভের অঙ্ক বাড়াইবার আশ্চর্য্য এক সুযোগ। অকপট সাধন যে করিয়াছে, সেই ইহা জানে।"

সহধর্ম্মিণীর চিত্তের তথ্যানুসন্ধান

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসের জনৈক ছাত্রকে শ্রীশ্রী বাবা লিখিলেন,—

"কল্যাণীয়া মা শ্রীমতী আ—কে নিজ উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ-ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছ ত? পত্রে পত্রে তার নিকটে মহদ্ভাবের একটী করিয়া প্রেরণা পৌঁছাইতেছ ত? ইহা কিন্তু তোমার পক্ষে সকল কর্ত্তব্যের মধ্যে একটী অতি প্রধান কর্ত্তব্য। শেক্স্‌-পীয়ার, মিল্‌টন, কীট্‌স, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, বাইরন্‌, সুইন্‌বার্ণ, ব্রাউনিং প্রভৃতিকে তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন না করিলে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তরণের ভরসা কর না, নিজ সহধর্ম্মিণীর চিত্তের প্রত্যেকটী কোণের খবর না রাখিলে এবং নবচেতনার নবারুণ-সম্পাতে তাহাকে আলোকোদ্ভাসিত করিবার উপযুক্ত প্রয়াস না পাইলে, জীবনের পরীক্ষাতেও তেমনি অনুত্তীর্ণ থাকিতে হইবে। মনে রাখিও, বিবাহ একটী বন্ধন সত্য, কিন্তু ইহা জগতের সকল অসত্যের বন্ধনকে ছিন্ন করিবার জন্যই গৃহীত। পরন্তু এই ব্রতের পূর্ণ সিদ্ধি আহরণ করিবার জন্য যোগ্য সাধনা চাই।"

বিবাহান্তে স্বামীর বাধ্যকর কর্ত্তব্য

ঢাকা-এক্রামপুর নিবাসী জনৈক বিবাহিত যুবককে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"বিবাহ করিবার পরে স্ত্রীজাতিকে 'কিছু না' বলিয়া তাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা ভুল। একবার যখন সহধর্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তখন সত্য সত্য সহধর্ম্মিণীরূপে পরিণত করিয়া তুলিবার জন্য একটী প্রাণপাত চেষ্টা তোমাকে দেখিতেই হইবে। স্ত্রীর মাথাটায় গোবরই ভরা থাকুক আর উহা খালিই থাকুক, সদ্‌বুদ্ধি, সৎপ্রেরণা, সদাকাঙ্ক্ষা মস্তিষ্কটীর ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার জন্য

প্রাণপাত শ্রম তোমাকে করিতেই হইবে। বলিলে চলিবেনা,—'পারি না।' বলিলে চলিবে না,—'অসম্ভব'। সব তোমাকে পারিতে হইবে, সব তোমাকে করিতে হইবে, স্ত্রীকে গড়িয়া তুলিবার জন্য নিজেকে নিঃশেষিত করিতে যে প্রস্তুত নহে, 'স্বামী' সংজ্ঞা ধারণ তাহার অশোভন। যে যার জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে, সেই তার স্বামী। সেই জন্যই জগতের জন্য সর্ব্বস্বোৎসর্গকারী মহাপুরুষেরা 'স্বামী' উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন।"

নামে লাগিয়া থাক

ঢাকা-রহমৎগঞ্জ নিবাসী জনৈক যুবক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সহস্র বিঘ্নের মাঝে নিত্য জপে নাম,
তার চিত্তে প্রকাশিত হয় ব্রজধাম।
নামের ঝঙ্কারে বাজে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী,
মুগ্ধ করে প্রাণ প্রেম-রস-অভিলাষী।
প্রশ্বাসে বিরহ আর নিঃশ্বাসে মিলন,
দোঁহে মিলি কভু কোটি, কভু একজন।
বচনীয় নহে সেই আনন্দ অপার·
ভাগবত-তন্ত্র-বেদ-বেদান্তের সার।

"নামে লাগিয়া থাক। নাম তোমাকে নামীর সহিত অবিচ্ছেদ যোগে প্রতিষ্ঠিত করিবে। নাম তোমার প্রাণের হা-হুতাশ প্রশমিত করিবে। নাম তোমার অন্তরাত্মার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তোমার দিব্য নয়নের সমক্ষে আনিয়া ধরিবে।"

মনুষ্যত্ব-পথের প্রথম পাদক্ষেপ

শ্রীশ্রীবাবা অপরাহ্নে ব্রহ্মপুত্র-তীরে বসিয়াছেন।

জনৈক যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রতিযোগীকে বিধ্বস্ত করাই পাণ্ডিত্যের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। সত্য আবিষ্কারই তার উদ্দেশ্য হবে। পরনিন্দাই রসনা লাভের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না, সৎ-কথনই তার উদ্দেশ্য হবে। পরচ্ছিদ্রান্বেষণই চক্ষু লাভের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না, যে বস্তু

দেখ্‌লে তোমার লাভ, তোমার প্রতিবেশীর লাভ, তোমার দেশের লাভ, নিখিল জগতের লাভ, সেই বস্তু দর্শনই এর উদ্দেশ্য। ভার বইবার জন্যই শরীর নয়, মাথা খুঁড়ে মরবার জন্যই মুণ্ড নয়,—এদের কোনও বৃহত্তর, মহত্তর, উচ্চতর সার্থকতা আছে। এই কথা মনে রাখাই হচ্ছে মানুষ হবার পথের প্রথম পদক্ষেপ।

ভোগবুদ্ধিই প্রধানতম শত্রু

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভোগবুদ্ধিই বদ্ধতা। ভোগবুদ্ধিই মুক্তিপথের প্রথম বাধা। প্রাণপণে ভোগবুদ্ধি বর্জ্জন কর। ভোগের জন্যই জীবন পেয়েছ, এসব অশ্রদ্ধেয় মত অগ্রাহ্য কর। বেশভূষার ভিতর দিয়ে ত্যাগের নিশান উড়িয়ে লোক-শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রে নিয়ে তার সুযোগে আত্ম-সুখ চরিতার্থতার সকল সংগুপ্ত অভিসন্ধি মন থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দাও। ভোগবুদ্ধিই মানুষকে বহির্ম্মুখ করে। ভোগবুদ্ধিই তাকে স্বার্থপর করে। ভোগবুদ্ধিই তাকে নিজের শত্রু, জগতের শত্রু করে।

ভোগবুদ্ধি বনাম ভগবৎ-সেবা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু ভোগবুদ্ধি বিদূরণ কর্ব্বে কি ক'রে? যিনি ভগবৎ-সেবাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করেছেন, ভোগবাসনা বর্জ্জন করা ইতর সুখে নিস্পৃহ থাকা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। ত্যাগীর বেশ অনেক ক্ষেত্রে বৈরাগ্যের বাহ্য-দ্যোতক, কিন্তু সব সময়ে তা বৈরাগ্যের অভ্রান্ত লক্ষণও নয়, বৈরাগ্যের অভ্রান্ত সহায়কও নয়। কিন্তু ভগবৎ-সাধন বৈরাগ্যের অভ্রান্ত সহায়ক, নিত্য সহায়ক। এইজন্যে ভগবৎ-সাধনেই মনঃপ্রাণ সমর্পণ কর্ব্বে। সূর্য্যোদয়কালের পৃথিবী দেখেছ ত? আলো যতটা আস্‌ছে, আঁধার ততটা কাট্‌ছে। ভগবৎ-ভক্তিও তোমার যতটা আস্‌ছে, ভোগবুদ্ধিও তোমার ততটা কাট্‌ছে।

৫ই বৈশাখ, ১৩৩৯

আজ শ্রীশ্রীবাবা নান্দাইল যাইবেন। সুতরাং প্রাতঃকালে বহু যুবক উপদেশার্থী হইয়া আসিয়াছেন।

অপরকে সাধনপথে আকৃষ্ট করিবার উপায়

ঈশ্বরগঞ্জের একটী যুবক প্রশ্ন করিলেন,—অন্যকে কি করিয়া সাধন-পথে আকৃষ্ট করিব ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অন্যকে যে আকৃষ্ট করা দরকার, এই কথাটা প্রথমে ভুলে যেতে হবে। কারণ, এই কথাটা মনে রাখতে গেলে তোমার মন কতকটা ঐ দিকে খরচ হ'য়ে যাবে। প্রাণপণে নিজের সাধন নিজে কর, এর ফলে দেখ্‌বে অজ্ঞাতসারে একটী একটী ক'রে লোক তোমার পন্থার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। এজন্য ক্যান্‌ভাসিং-এর কোনও প্রয়োজন হচ্ছে না।

সাধন-নিষ্ঠার সহিত লোকাকর্ষণের সম্পর্ক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধন-নিষ্ঠার একটী আশ্চর্য্য প্রকৃতি। তোমার নিষ্ঠা যখন তরল, কিন্তু নিষ্ঠা আছেই, তখনো দেখ্‌বে দু-একটী প্রাণ আকৃষ্ট হচ্ছে। এরা খুব highly strung, মানে, অত্যন্ত ভাবাবেগী লোক। তোমার নিষ্ঠা যখন একটু গাঢ় হ'য়ে এসেছে, তখন দেখ্‌বে, এমন লোক আকৃষ্ট হচ্ছে, যারা ভাবাবেগী নয়, সহজে যারা কারো মতকে বা কারো পথকে মান্‌তে রাজি নয়, অথচ কারো পন্থার প্রতি বিদ্বেষীও নয়। তোমার সাধন-নিষ্ঠা যখন প্রগাঢ় হ'য়ে এসেছে, তখন দেখ্‌বে, যারা বিরোধী, যারা বিদ্বেষী, তারাও কেউ কেউ আকৃষ্ট হচ্ছে। তুমি যখন তন্ময়, তখন দেখ্‌বে নিখিল ভুবন তোমার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, যদিও মানব-প্রকৃতির স্বভাববশে কতকগুলি লোক অন্তরের সেই আকর্ষণ ক্ষীণভাবেই উপলব্ধি কত্তে পার্‌বে, ফলে হয়ত বাহ্য বিরোধ বর্জ্জন কর্ব্বে না।

অবিরাম নাম চালাও

নেত্রকোণার একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—Be steady in Sadhan. Slow and steady wins the race. [সাধনে দৃঢ়নিষ্ঠ হও। ধীরতা ও নিষ্ঠার সহিত যে চলে, তার সিদ্ধি অনিবার্য্য।] নিমেষের জন্যে নাম ভুলো না। অবিরাম নাম চালাও। বাইরের সহস্র মুখ শত কর্ম্মের ভিতরেও অন্তরঙ্গ নাম-সাধন চালাও।

বাইরের জয়-পরাজয়ে ক্লিষ্ট-ক্লিন্ন না হ'য়ে অন্তরের সাধন-সংগ্রাম বীর্য্য সহকারে চালাও।

নিষ্ঠা-রক্ষার উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিষ্ঠাকে রক্ষার উপায় কি জানো? সাধারণ উপায় হচ্ছে, নাম সাধনের সুফল-চিন্তা। অসাধারণ উপায় হচ্ছে, নামীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা। যাঁকে ভালবাসি, তাঁর নাম লক্ষবার কোটিবার জপতেও ত' ক্লান্তি আসতে পারে না!

ভালবাসার উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু ভালবাসার উপায় কি? সাধারণ উপায় হচ্ছে, অবিরাম তাঁর গুণ-বর্ণন, তাঁর গুণ-চিন্তন, তাঁর স্নেহ, প্রেম, দয়াকে নিজ জীবনের উপরে নিরীক্ষণ। অসাধারণ উপায় হচ্ছে, কবে তিনি প্রাণভরা প্রেমরাশি দেবেন, তার জন্য তাঁর উপরেই নির্ভর ক'রে দৃঢ় হ'য়ে অপেক্ষা করা। অর্থাৎ বিশ্বাস করা।

বিশ্বাস ও ভালবাসা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু বিশ্বাস কি ক'রে আসবে? বিশ্বাসও আসে আবার প্রেম থেকে। বিশ্বাস ও ভালবাসার ওতঃপ্রোত-সম্বন্ধ। বিশ্বাস এলেই ভালবাসা আসে, ভালবাসা এলেই বিশ্বাস আসে। কিন্তু বিশ্বাস বল্‌তে কিসে বিশ্বাস বুঝ্‌বে? তিনি নিজে প্রেমিক, এই সত্যে বিশ্বাস।

ত্রিকাললঙ্ঘী বিশ্বাস

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেমন বিশ্বাস? যে বিশ্বাস ত্রিকাললঙ্ঘী: অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান নিয়ে তাঁর প্রেম-মধুর স্নেহসিক্ত কণ্ঠ তোমাকে ডাক্‌ছে। অতীতের তাঁর প্রেম আজও রয়ে গেছে, অতীতের তাঁর প্রেমিক আজো মরে নাই। আজও ধ্রুব-প্রহ্লাদ, আজও গোপ-গোপী, আজও যীশু-চৈতন্য তাঁর প্রেমকে পাচ্ছেন, আস্বাদন কচ্ছেন। ভবিষ্যতের কোটি কোটি প্রেমিকের দল, যাঁরা এখনো প্রেমবারিধির বুকে বুদ্‌বুদ্‌ হ'য়ে ফুটে ওটেন নি, তাঁদেরও জন্য পূর্ণিমার প্রেম-শশধর প্রেম-কৌমুদী নিয়ে তৈরী হ'য়ে ব'সে আছেন, তাঁদের বুকে বুকে ফুটে উঠ্‌বেন ব'লে।

বিদ্যার্জ্জনের আবশ্যকতা

বেগুনবাড়ী নিবাসী একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জীবনের যে পথেই যাও, বিদ্যার্জ্জনকে সহকারী ক'রে নিও। বিদ্যা-চর্চ্চা ছেড়ো না। অতীতে অনেক ঈশ্বর-প্রেমিক মহাপুরুষ মূর্খদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ভবিষ্যতেও অনেক হবেন। এ কথার দ্বারা বিদ্যার্জ্জনের নিকৃষ্টতা প্রমাণিত হয় না। এ কথার দ্বারা এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে, নিষ্ঠা আর আবেগ প্রগাঢ় হ'লে, মূর্খেও তাঁকে ভালবাসতে পারে, তাঁকে পেতে পারে। কত ছুতার, কত চামার, কত হাঁড়ী, কত ডোম, কত ব্যাধ, কত নিষাদ ভগবৎ-প্রেম-ধনের অধিকারী হয়েছেন, তার সীমা-সংখ্যা নেই। ভবিষ্যতেও এরূপ শত শত হবেন। যাতে অশিক্ষিতদের মধ্যেও এঁদের দলে দলে আবির্ভাব অসম্ভব না হয়, তার মত পরিস্থিতি ও প্রতিবেশ পরিরক্ষণে তোমরা যত্নশালী হও। কিন্তু বিদ্যার্জ্জনের আবশ্যকতাকে অস্বীকার ক'রো না।

বিদ্যার্জ্জনও তপস্যা-বিশেষ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিদ্যার্জ্জনকেও একটা তপস্যা ব'লেই মনে ক'রো। অতীত কালে 'স্বাধ্যায়' তপস্যারই অঙ্গ ছিল। বিদ্যার্জ্জন কর্ত্তে যে রকম একাগ্রতা, নিবিষ্টতা, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় দরকার, তাতে একে তপস্যা না বল্‌লে ভুল করা হবে। নিজেরা বিদ্যার্জ্জন কর এবং প্রত্যেক নরনারীকে বিদ্যাধনের অধিকারী কর। বিদ্যাশিক্ষা না করাকে এক রকমের পাপ ব'লে জ্ঞান কর। অবশ্য পার্থিব বিদ্যা যখন ব্রহ্মবিদ্যার বিঘ্ন, তখনকার কথা পৃথক্। কিন্তু পার্থিব বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার বিঘ্ন অতি অল্প স্থলেই হয়। বিদ্যার চর্চ্চা যে কর্ব্বে, সে ইচ্ছা করলেই বিঘ্ন-সম্ভাবনাটুকু বর্জ্জন ক'রে বিদ্যার্জ্জন কর্ত্তে পারে।

জাতির ভবিষ্যতের কথা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখ্‌ছ কি বাছারা? ব্যক্তির কথা নয়, জাতির কথা। শত সহস্র ভদ্রবংশজাত শ্রমবিমুখ ব্যক্তির বংশধরদিগকে লাঙ্গলের মুঠি হাতে দিয়ে বন-জঙ্গলে পাঠাতে হবে। সেদিন

কি বিদ্যাহীন নিরক্ষর মূর্খরূপে তাদের পাঠাবে? আভিজাত্য-গর্ব্বীর বংশধর-দিগকে সাপ আর বাঘের সঙ্গে লড়াই কত্তে পাঠাতে হবে। সেদিন বাঘের পেটেই যদি যায়, তবে শিক্ষিত লোকই যাক্, যেন কচের মতন বাঘের পেট ফুঁড়ে বেরুতে পারে।

কর্ম্ম-পরিত্যাগ আদর্শ নয়

জঙ্গলবাড়ী-নিবাসী জনৈক যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কর্ম্ম-পরিত্যাগ কখনো তোমাদের আদর্শ হ'তে পারে না। বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্ব্বতে শুধু তপস্যার জন্যই যাবে, আর উপনিবেশ স্থাপনের জন্য যাবে না, অন্ন-সংস্থানের জন্য যাবে না, পরিবারের সম্প্রসারণের জন্য যাবে না, সভ্যতা বিস্তারের জন্য যাবে না, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যাবে না, এ হ'তে পারে না। কর্ম্ম কত্তে কেউ তোমাকে নিষেধ করে নি,—প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হ'য়ে কর্ম্ম না কর, এই বিষয়েই নিষেধ। নিজেকে ঈশ্বরেচ্ছার অনুবর্ত্তী কর, ঈশ্বরেচ্ছাকে অনুভব কর্ব্বার জন্য তীব্র সাধন কর, তাঁর হ'য়ে তাঁর মতে তাঁর জন্যে কর্ম্ম কর, শ্রম কর।

সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম কর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য, কর্ম্মের প্রকারভেদ আছে। স্থূল কর্ম্ম, আর সূক্ষ্ম কর্ম্ম। যে যেরূপ কর্ম্মের যোগ্য, সে সেই রকম কর্ম্ম করবে। তাই ভিন্ন ভিন্ন জনের কর্ম্মে পার্থক্য হবে। নিজেকে ঈশ্বরের দাস জেনে স্থূল কর্ম্ম কত্তে কত্তেই ক্রমশঃ সূক্ষ্ম কর্ম্মের অধিকারী হওয়া যায়। সূক্ষ্ম ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম হয়। কর্ম্মের এমন অবস্থা আছে, যে অবস্থায় বাইরের কেউ তার অস্তিত্ব উপলব্ধিও কত্তে পারে না, অনুমানও কত্তে পারে না। নৈষ্কর্ম্ম-সাধন যদি বলতে চাও, তবে এই অবস্থার কর্ম্ম-সাধনকে বলতে পার।

ভগবদ্-ভক্তির বিঘ্ন

ঈশ্বরগঞ্জনিবাসী অপর একজন যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবদ্-ভক্তি-লাভের বহু বিঘ্ন আছে। তন্মধ্যে প্রধান তিনটী। একটী হচ্ছে, ভক্তিহীন নাস্তিকদের সঙ্গ করা। আর একটী হচ্ছে, ভগবদ্বিদ্বেষীর দান গ্রহণ করা। তৃতীয়টী হচ্ছে লোকের সঙ্গে বিতণ্ডা করা।

ভগবদ্ভক্তির পরীক্ষা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবদ্ভক্তির পরীক্ষাও ত্রিবিধ। ভীতি, উত্তেজনা ও প্রলোভন। ভগবদ্ভক্তির অপরাধে তোমাকে যদি ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলান হয়, তখনো তুমি নির্ভীক্ থাক্‌তে পার কি না। এর চেয়েও কঠিনতর পরীক্ষা হ'ল, ভগবদ্বিদ্বেষীরা যখন তোমার ধর্ম্মকার্য্যে অনিষ্ট সম্পাদনে ব্রতী হবে, তখন তুমি আবশ্যকীয় আত্মরক্ষা কার্য্যেও চিত্তকে সর্ব্বপ্রকার উত্তেজনা, বিদ্বেষ ও পরানিষ্ট-বুদ্ধি থেকে মুক্ত রাখতে পার কি না। সর্ব্বশেষে হ'ল, চতুর্দ্দিকে যখন ধর্ম্মানু-শীলনের সম্পূর্ণ অনুকূল অবস্থা, তখন অজ্ঞাতসারে যে সকল নিরর্থক আড়ম্বর ও বিলাসিতা ক্রমে ক্রমে নিজের আসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ কত্তে চেষ্টা করে, তাদের তুমি বর্জ্জন কত্তে পার কি না।

সারাপথ নাম-জপ

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবা ষ্টেশনে আসিয়াছেন। নান্দাইল রোডের একখানা টিকিট কাটা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুখদা আসিয়াছেন, একখানা প্লাটফর্ম্ম টিকিট কাটিয়া শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে ট্রেণে দেখা করিতে। কিন্তু প্লাটফর্ম্ম টিকিট কিনিতে গিয়া তিনি যেন কাহা-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ঈশ্বরগঞ্জের এক টিকিট কাটিয়া বসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কি রে, তোর ত' সঙ্গে যাবার কথা ছিল না!

সুখদা বলিলেন,—ঈশ্বরগঞ্জ পর্য্যন্ত যাব।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,- আচ্ছা বেশ! কিন্তু এক চুক্তি। সারা পথ ট্রেণ চলার সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম ইষ্টনাম জপ কত্তে হবে।

সুখদা মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—আচ্ছা।

ঈশ্বরের গঞ্জ

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক মধ্যে ট্রেণ ঈশ্বরগঞ্জ আসিল। স্থানীয় বহু যুবকেরা শ্রীশ্রীবাবার চরণ দর্শনে আসিয়াছেন। এই ফাঁকে সুখদা সকলের অগোচরে নামিয়া গেলেন।

ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইলে দেখা গেল, সুখদা আসিয়া বসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিরে, তুই না ঈশ্বরগঞ্জে নাম্‌বি?

সুখদা বলিলেন,—নান্দাইল রোডের টিকিট নিয়ে এলাম।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—কিন্তু চুক্তির কথা স্মরণে আছে ত?

সুখদা বলিলেন,—আছে। তৎপর তিনি নাম-জপে ডুবিয়া গেলেন।

ট্রেণ চলিতে লাগিল। একটু পরে শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তোর ঈশ্বরগঞ্জেই থাকা হ'ল।

সুখদা কৌতূহলী নেত্রে চাহিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গঞ্জ মানে আশ্রয়। ঈশ্বরগঞ্জ মানে ঈশ্বরের আশ্রয়। নাম ঈশ্বরেরই শব্দময় বিভূতি। তাই নামই ঈশ্বর। নামের আশ্রয়ে থাকাই ঈশ্বরের আশ্রয়ে থাকা, মানে ঈশ্বরগঞ্জে থাকা।

ট্রেণ আঠারবাড়ী ষ্টেশনে থামিল। স্থানীয় হাই স্কুলের বহু ছাত্র শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম-দর্শনে আসিয়া ভিড় করিয়াছেন। কিন্তু সুখদা অপলক নেত্রে নিঃস্পন্দ শরীরে গাড়ীর এক পার্শ্বে বসিয়া নাম জপিতেছেন।

কিছুকাল পরে গাড়ী নান্দাইল-রোড ষ্টেশনে থামিল। গাড়ী যে নান্দাইল আসিয়াছে, সুখদার সেই অনুভূতিই নাই। শ্রীশ্রীবাবা তাহাকে ডাকিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন।

দেহের ট্রেণ

প্রায় ছয় মাইল পথ পদব্রজে যাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিরে সুখদা, চুক্তির কথা মনে আছে ত?

সুখদা হাসিয়া বলিলেন,—আপনি আমাকে ট্রেণ চলার সাথে নাম জপতে বলেছেন। এখন ত' আর ট্রেণ নেই!

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শুধু রেলের ট্রেণ নয় রে, দেহের ট্রেণ। যতক্ষণ দেহের ট্রেণ চল্‌বে, ততক্ষণ নাম জপতে হবে। তবে আমার সঙ্গে থাকতে পাবে।

সুখদা মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—আচ্ছা।

প্রতি পদবিক্ষেপে নাম-জপ

মিনিট দুই তিনের পথ অতিক্রম করিয়াই সুখদা বলিলেন,—আপনি আমাকে শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম জপার উপদেশ দিয়েছেন। পথ চলার কালে ত' তা সহজ হয় না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পথ চল্‌বার কালে শ্বাসে জপো না, জপ্‌বে পদধ্বনির তালে তালে। আর মনে মনে অনুভব কত্তে চেষ্টা কর্ব্বে যেন ধ্বনিটী ধরণীর গভীরতম প্রদেশ থেকে উত্থিত হচ্ছে এবং তোমার সমগ্র দেহ-মন-প্রাণকে আপ্লুত ক'রে ভ্রূমধ্যে গিয়ে বিলীন হচ্ছে।

সমবেত পাদক্ষেপে নাম-জপ

কয়েক মিনিট পথ চলিবার পরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেমন, প্রত্যেক পদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে নাম জপ করা ব্যাপারটা কি রকম, তা বেশ ধারণায় এসেছে ত? এখন তালে তালে পা ফেল। আমি যেমন ফেলি। সৈনিকেরা যেমন বহু লোকে পা ফেলে, কিন্তু একই সঙ্গে পড়ে, সেই রকম ক'রে পথ চল, আর পদধ্বনির সাথে সাথে নাম জপ। মার্চ্চ ক'রে যাবার সময়ে বহু লোকে যদি একত্রে নাম জপে, তবে তাতে পরস্পরের প্রতি একত্ববোধ জন্মে। আয়, তুই আর আমি আজ এক হই।

নাদ-সাধন

প্রখর রৌদ্র। প্রায় চারি মাইল পথ পর্য্যটনের পরে একটী বৃক্ষের ছায়ায় বসা হইল।

শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরে, চুক্তির কথা মনে আছে?

সুখদা বলিলেন,—হাঁ। কিছুক্ষণ পরেই পুনরায় বলিলেন,—কৈ, শ্বাসে জপ্‌তে ত' এখন স্বাদও পাচ্ছি না, যুত্‌ও বোধ হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিখিল অধোদেশ থেকে সমুত্থিত হ'য়ে নামের ধ্বনি তোমার দেহের ভিতর দিয়ে নিখিল ঊর্দ্ধ দেশে বিলীন হচ্ছে,, এইরকম ভাব নিয়ে জপ্‌তে থাক। কোনও শারীর ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ রাখতে হবে না।

সুখদা সেই ভাবেই জপ করিতে লাগিলেন।

সকল শব্দের মাঝে ইষ্টনাম স্মরণ

অপরাহ্ন চারি ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা ও শ্রীযুক্ত সুখদা নান্দাইল থানায় পৌছিলেন। থানার সহকারী সাব্‌-ইন্‌স্‌পেক্টার শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ মুখোটি শ্রীশ্রীবাবার কৃপাপ্রাপ্ত। বিশ্রামাদির পরে স্থানীয় লোকদের সহিত শ্রীশ্রীবাবা কথাবার্ত্তা

কহিতে লাগিলেন। ইহারই এক ফাঁকে সুখদাকে ডাকিয়া বলিলেন,—কিরে, চুক্তির কথা মনে আছে ত ?

সুখদা বলিলেন,—আছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শুধু আছে বল্‌লেই হবে না। এই যে কত কথা চলেছে, এর একটী বর্ণেও একমাত্র ইষ্টনাম ছাড়া আর কোনো বস্তু দেখো না। তোমার দাদা যখন সুট প'রে কোর্টে যান ডেপুটিগিরি কত্তে, তখন যেমন তাঁর সুটের দিকে না তাকিয়ে তার দাদাত্বটীকেই চিনে নাও, তিনি যখন ছিপ্ নিয়ে যান পুকুরে মাছ ধত্তে, তখন যেমন তার ছিপের দিকে না তাকিয়ে তার দাদাত্বটীকেই আগে চিনে নাও, ঠিক্ তেমনি জগতের যত স্থানে যত ধ্বনি শুন্‌ছ, তার প্রত্যেকটার বাহ্য বৈচিত্র্য যতই থাকুক, তার দিকে না তাকিয়ে তার ভিতরে তার প্রাণ, তার সত্তা, তার সাররূপে তোমার ইষ্টনামকে খুঁজে বেড়াও।

সুখদা 'আচ্ছা' বলিয়া সেই কয়েক ঘণ্টাব্যাপী নানা-আলোচনা-মুখর গৃহেই অবিরাম নাম জপিয়া যাইতে লাগিলেন।

নান্দাইল, ময়মনসিংহ
৬ই বৈশাখ, ১৩৩৯

রহিমপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠার তারিখ

প্রাতে স্নান-ধ্যানাদির পরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আজ ছয়ই বৈশাখ, এই তারিখ আমার রহিমপুর থাকা উচিত ছিল।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ মুখুটী বলিলেন,—আজ বুঝি রহিমপুরের প্রতিষ্ঠা-দিবস ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—না। আজকে ওদের উৎসব। এই তারিখে আমি বৎসরান্তে মৌনভঙ্গ করি ব'লে এই তারিখে ওঁরা উৎসব কর্ব্বেন। রহিমপুরে কাজ সুরু হয় ৭ই মাঘ ১৩৩৭। তখন আমি মৌনী।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সকলকে আশীর্ব্বাদ ক'রে পত্র লেখাও অন্ততঃপক্ষে সঙ্গত। আগে খেয়াল থাক্‌লে এমন ভাবে চিঠি দিতুম, যাতে ওরা গতকালই বিকেলে চিঠি পেত।

সমবেত কর্ম্মে কলহের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠের কর্ত্তব্য

রহিমপুর গ্রামের একজন বর্ষীয়ান্ নেতার নিকটে শ্রীশ্রীবাবা একপত্রে লিখিলেন,—

"উৎসব ইতিমধ্যে নিরাপদেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া আশা করি। যেখানে আদর্শের প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধা জন্মে নাই, সেইখানে সামান্ত জেদ বা কর্ত্তৃত্ব লইয়াই অনেক সময়ে ঘোরতর কলহ বাঁধে। কনিষ্ঠেরা যখন জ্যেষ্ঠদের সম্মানে আঘাত করিতে উদ্যত হয়, তখন জ্যেষ্ঠত্বের সকল দাবী পরিহার করিয়া নিরভিমান চিত্তে সকলের সমকক্ষভাবে সহকর্ম্মীর মত কাজ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।"

মতভেদের ক্ষেত্রে কনিষ্ঠদের কর্ত্তব্য

রহিমপুর গ্রামের একটী নেতৃস্থানীয় যুবকের নিকটে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"আশা করি তোমাদের উৎসব নিরাপদেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল উৎসবানুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের দিক্ ত' একটা আছেই, কিন্তু ইহার বৈষয়িক মঙ্গলের দিকও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। ইহা তোমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধতা, সহযোগিতা, পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা শিক্ষা দেয়, তোমাদের ব্যক্তিগত জিদ্‌কে সুস্থমনা ব্যক্তির বা বহুজনের মতের নিকটে সংযত করিয়া কর্তৃত্ব-বোধ প্রশমনের শিক্ষা দেয়। যুবকদিগকে ইহা অভ্যাস করিবার সুযোগ দেয় যে, মতভেদের ক্ষেত্রে কি করিয়া মাননীয় ব্যক্তিদের মান-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়।"

অনাসক্ত কর্ম্মযোগ

উৎসবের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করিয়া এক পত্রে শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমের একটী নেতৃস্থানীয় ব্রহ্মচারীকে পত্র দিলেন,—

"উৎসবের এই আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে কিন্তু বাবা তোমরা ভুলিয়া যাইতে পার না যে, বুকের রক্ত দিয়া যে আশ্রম গড়িতেছ, সেই আশ্রমের প্রতি এক কণা মায়াও তোমরা পোষণ করিতে পার না। এই রকম কত আশ্রম হইবে ও বিলয় পাইবে। যার যতটুকু প্রয়োজন, তার ততটুকু নিঃশেষ হইলেই

তোমাদের অনাসক্ত চিত্ত সম্পূর্ণরূপে তাহার সংশ্রব ছাড়িবে। সম্পত্তির পর সম্পত্তি পুঞ্জিত করিয়া তীর্থের মোহন্তগিরি করিবার জন্যই তোমাদের জন্ম নহে। যে মনোবৃত্তি ও আসক্তিহীনতা লইয়া একদিন পুপুন্‌কীর আশ্রম-কুটীর নিজ হস্তে দগ্ধ করিয়া চিত্তমধ্যে এক কণা বেদনার সন্ধান না পাইয়া কাপড়-কৌপীন খুলিয়া ফেলিয়া লেংটা হইয়া নাচিতে নাচিতে চীৎকার করিয়াছিলাম,— "মুক্তোঽহং", সেই চিত্তভাবের উপরে দাঁড়াইয়াই তোমাদিগকে জগতে সহস্র সহস্র আশ্রম স্বহস্তে গড়িয়া আবার প্রয়োজনস্থলে হেলায় খেলায় ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।"

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বলিলেন,—এ'ত উৎসবের আশীর্ব্বাদ নয়, এযে দক্ষযজ্ঞের নিমন্ত্রণ!

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—কলমের ডগায় এসে পড়্‌ল, আমি কর্‌ব কি?

জপ নিরন্তর

এখান হইতে কয়েক মাইল দূরে সিংরৈল গ্রামে একটী ভক্ত আছেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে নিজ আগমন-সংবাদ জানাইবার ছলে পত্র লিখিলেন,—

"সহস্র কর্ম্মের ফাঁকে করি' অবসর
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপ নিরন্তর।
দুঃখ, দৈন্য, বিঘ্ন, বাধা সব উপেক্ষিয়া,
অনুক্ষণ রহ প্রেমময় নাম নিয়া।"

জীবনের লক্ষ্য

শ্রীযুক্ত সুখদাকে উপদেশ-দান প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জীবনের লক্ষ্যকে জান্‌লেই জীবন অর্দ্ধেক সফল হ'য়ে গেল। তাই জীবনের অর্দ্ধেক সাধনা লক্ষ্য-নির্ণয়ের জন্যই দিতে হয়। অবিরাম সাধন কর, অবিশ্রাম সাধন কর। তার ফলে তোমার লক্ষ্য তোমার চখের সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে ধরা দিবে। জীবনের লক্ষ্য নির্ণয়ের জন্য যুক্তিপরিচালনা না ক'রে, অবিরাম সাধন কর। সাধন কত্তে কত্তে লক্ষ্যের প্রতিচ্ছবি নিজ চক্ষে দেখতে পাবে।

সাধনের ফলে সত্যোপলব্ধি

দুইটী যুবকের দীক্ষা হইল। দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন,—নামকে জান্‌বে শ্রীভগবানের ধ্বনিময় মূর্ত্তি। তাই নাম আর তিনি অভেদ। অবিরাম নাম কত্তে কত্তে নাম আর নামীর ভেদ-বোধ দূর হয়ে যায়, তখন নামকে ব্রহ্মময় ব'লে এবং ব্রহ্মকে নামময় ব'লে উপলব্ধি আসে। অনুক্ষণ সাধন কর, আর, সাধনের ফলে সত্যকে উপলব্ধি ক'রে কৃতার্থ হও।

উচ্চারিত নাম নিগূঢ় নামের দূর প্রতিধ্বনি মাত্র

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানের নিগূঢ় নাম এক অতি আশ্চর্য্য বস্তু। ভাষা এর প্রতিনিধিত্ব কত্তে পারে না। কিন্তু বস্তুর সূক্ষ্ম গুণাংশকে (intelligent part) যেমন স্থূলভাবে ধ'রে রোগীতে প্রয়োগ অসম্ভব ব'লে স্থূলগ্রাহ্য স্পিরিট দিয়ে অতিসূক্ষ্ম গুণাংশকে ধরা হয়, ঠিক্ তেমনি নামের নিগূঢ় সূক্ষ্ম নাদকে বীজমন্ত্রের স্পিরিট দিয়ে মানব-রসনায় উচ্চার্য্য করা হয়। কিন্তু উচ্চারিত নাম সে আসল নামের ঠিক্ ঠিক্ প্রত্যক্ষ প্রতিধ্বনিও নয়। পরোক্ষ ও দূর প্রতিধ্বনি বল্‌লে বলা যেতে পারে। তাই সেই আসল নামটি শুন্‌বার জন্য এই উচ্চারিত নামটীই নিবিড় নিবিষ্টতা নিয়ে অবিরাম জপ কত্তে হয়। কত্তে কত্তে সেই অনাহত নাদ আপনি শুন্‌তে পাওয়া যায়।

স্বতঃ-উচ্চারিত সুনিগূঢ় নাম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সেই সুনিগূঢ় নাম জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অবিরাম-ধ্বনিত হচ্ছে। জড় কর্ণে তা শোনা যায় না। তাই প্রয়োজন, অন্তরের শ্রবণ-শক্তিকে প্রস্ফুটিত ক'রে তোলা। মুখোচ্চারিত নাম ভক্তিভরে শ্রদ্ধাভরে প্রেমভরে জ'পে যাও। ভিতরের কাণ খুলে যাবে। সাধন কর, তার-পরে কাণ পেতে শোন, প্রত্যেক অণুপরমাণুতে কেমন ক'রে ঐক্যতানে অমৃত-ময় নামের সুমধুর ঝঙ্কার উঠ্‌ছে। কোটি কোটি গ্রহতারা অনন্ত গগনে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে, প্রাণের আনন্দে নামের মূর্চ্ছনা তুলে। পুত্র মোর, সেই নামে ডোব, সেই নামে মজ, জীবন সার্থক কর, আমাকে কৃতার্থ-কর।

আত্মসুখলোভে কর্ম্ম

রাত্রি আট ঘটিকার সময়ে থানার বড় দারোগা শ্রীযুক্ত নারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীশ্রীবাবার সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্থূল হোক, সূক্ষ্ম হোক, কর্ম্ম মানুষকে কত্তেই হবে। কর্ম্ম না ক'রে কেউ জীবনধারণও কত্তে পারে না। সুতরাং কর্ম্মে জনসাধারণের রুচি সৃষ্টি করা দোষের নয়। আসক্তিই বন্ধন, কর্ম্মকে বন্ধন বলা ভুল। আসক্তি-প্রেরিত কর্ম্মই বন্ধনের বর্দ্ধক, অনাসক্ত কর্ম্ম বন্ধনের বর্দ্ধক নয়। আত্ম-সুখলোভে যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মই ক্ষতিকর, পরহিতব্রত কর্ম্ম ক্ষতিকর নয়। কিন্তু মানুষ "কর্ম্মত্যাগ" "কর্ম্মত্যাগ" ব'লে উচ্চধ্বনি তুলেও যখন নিজ-সুখলোভেই কর্ম্ম ক'রে থাকে, তখন তা অতিরিক্ত কপটতাও হয়। এই জন্যই আমি কর্ম্মত্যাগের সমর্থক নই, কর্ম্মযোগের সমর্থক।

কর্ম্মযোগ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কর্ম্মকে যোগের শ্রেণীতে উন্নীত কত্তে হবে, যোগকে কর্ম্মের ভিতরে এনে প্রবিষ্ট কত্তে হবে। প্রতি কর্ম্মে ঈশ্বরাভিপ্রায় দর্শন বা ঈশ্বরাভিপ্রায় পূরণের চেষ্টা আর ঈশ্বরাভিপ্রায়ের অধীন ক'রে প্রত্যেক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে পালিয়ে ধর্ম্মরক্ষা করা নয়, পরন্তু গায়ে প'ড়ে লড়াই না করা, আর, লড়াই এসে পড়লে পিছনে না ফেরা। একেই বলি কর্ম্ম-যোগ।

হাসি মুখে কাজ কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কর্ম্ম সবাই কচ্ছে, কিন্তু সন্তুষ্টচিত্তে কচ্ছে কি? কেঁদে-কুঁদে কচ্ছে, আফশোষ ক'রে কচ্ছে, অনিচ্ছায় কচ্ছে, দায়ে ঠেকে কচ্ছে। এই ঢংটাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এমন বিশ্রী কাজ নেই, মানুষ যা তার জীবন্ত প্রাণের সৌন্দর্য্য দিয়ে সুশ্রী ক'রে না নিতে পারে। এমন অরুচিপ্রদ কাজ নেই, মানুষ যার ভিতরে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি না কত্তে পারে। এমন একঘেয়ে কাজ নেই, মানুষ যার ভিতরে বৈচিত্র্যের তরঙ্গ না তুলতে পারে। তাই মানুষকে শিখতে হবে। পরিশ্রম যখন অবধারিত; হাসি মুখে কাজ কত্তে

হবে। মৃত্যু যখন অবধারিত, হাসিমুখে মরতে হবে।— কর্ম্ম যখন যোগে পরিণত হয়, তখন সবই হাসিমুখে করা যায়।

কর্ম্মযোগের ক্রমাভিব্যক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে কি মানুষ কাজ কর্ব্বে না? একেবারে কাজ না করার চাইতে, স্বার্থের জন্যও কাজ করা ভাল। নিজের স্বার্থে অপরের ক্ষতিকর কাজ করার চাইতে, নিজের স্বার্থে অপরের পক্ষে ক্ষতিহীন কাজ করা ভাল। নিজের স্বার্থে অপরের ক্ষতিহীন কাজ করার চাইতে, নিজের স্বার্থে অপরের পক্ষে লাভজনক কাজ করা ভাল। তার চাইতে নিজের স্বার্থবর্জ্জিত অপরের লাভজনক কাজ করা ভাল। তার চাইতে নিজের স্বার্থ ও অপরের স্বার্থ এতদুভয়ের ঊর্দ্ধে উঠে, ঈশ্বরাভিপ্রায়কে লক্ষ্য ক'রে কাজ করা ভাল। এইভাবেই কর্ম্মযোগের ক্রমাভিব্যক্তি ঘটে।

বলপূর্ব্বক আলস্য-বিদূরণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— অলস, নিরুদ্যম, পশুবৎ আহার-নিদ্রা-সম্বল পঙ্গপালকে প্রথমে স্বার্থের লোভে উত্তেজিত ক'রেই ত' কাজে লাগাতে হয়! কিন্তু তাও কি কাজে লাগ্‌তে চায়? ঘোর তামসিকতা দেশটাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। তাই না দেখি, ভিক্ষুকের পালের সংখ্যা বৃদ্ধি দিন দিন হচ্ছে! লক্ষ লক্ষ লোক বেকার। এর মধ্যে যারা সামাজিক সম্মানকে গ্রাহ্যে আনে না, তারা দিব্যি তিলক কেটে বৈরাগী হ'য়ে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, অপরের কষ্টার্জ্জিত অন্নের উপরে বিনা ক্লেশে ভাগ বসাবার জন্য। বাকী লোকগুলি বাবার, কাকার, দাদার গলগ্রহ হয়েই জীবন কাটাবে, কিন্তু কাজ কর্ব্বে না। কাজের জায়গায় পাঠান হোক, তারা অনিচ্ছায় যাবে, মনে মনে মানত কর্ব্বে যেন কাজটা না পায়, এবং কর্ম্মস্থলে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে যখন বাড়ী ফিরে আসবে, তখন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে যে, বাঁচা গেল। স্বার্থের লোভেও ওদের উত্তেজিত করা যায় না। এমন সব কদর্য্য অভ্যাস দিয়ে জীবনকে এরা ঘিরে ফেলেছে যে, কোনো কাজের যোগ্যতা এদের নাই, কোনো কাজ দিলে এরা সে কাজ কত্তে ইচ্ছুক হবে না, কাজটীর শত দোষ শত ত্রুটী দেখিয়ে করার

অযোগ্য ব'লে উপেক্ষা কর্ব্বে, কোনো কাজ এরা কত্তে চায় না, শুধু চায় পরান্ন-গলাধঃকরণ আর অর্দ্ধ-নিমলিত-নেত্রে পরনিন্দার রোমন্থন। এদের জন্য উত্তেজক হবে চাবুক। আইন ক'রে এদের পরিশ্রম কত্তে বাধ্য করা উচিত।

শ্রমবাদ ও জাতীয় অভ্যুদয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একটা জাতির ভবিষ্যৎ অভ্যুদয় সম্পূর্ণ নির্ভর করে এই জাতিটার শ্রমপ্রিয়তা আর শ্রমশীলতার উপরে। আলস্য ত' জাতির সমাধি খনন কর্বে। এই কথা জেনে দুরন্ত শ্রমবাদ সমগ্র দেশে ছড়ান প্রয়োজন। একটী মানুষও যেন অলস হ'য়ে ব'সে না থাকে। স্ত্রী হোক্, পুরুষ হোক্, প্রত্যেককেই কঠোর শ্রমে জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ম্মাণ কত্তে হবে,—এই বাণী সর্ব্বত্র শুনাতে হবে। বালক হোক, বৃদ্ধ হোক, ব'সে থাক্‌বার অধিকার কারো নেই, এই কথা প্রত্যেকের হৃদয়-ফলকে গেঁথে দিতে হবে। কাজ ক'রে অসফল হওয়ায় দোষ নেই, কাজ না ক'রে বসে থাকাই পাপ,—এই ধারণা দৃঢ়রূপে সকলের মনের মাঝে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

শ্রমবাদের আদর্শ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু শ্রমের একটা আদর্শ থাক্‌বে। শ্রম কর্ব্ব, নিজেকে সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে ব্যবহার কর্ব্বার জন্য, কিন্তু শ্রমলব্ধ সৌভাগ্যের সুযোগে আচরণের উচ্ছৃঙ্খলতাকে এনে জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্ব না। কাজ কর্ব্ব এমন উৎসাহ নিয়ে যেন লক্ষ বছরেও আমার মৃত্যু নেই কিন্তু জীবনের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত কর্ব্ব এমন সতর্কতার সঙ্গে যেন আজই সূর্য্যাস্তের সাথে সাথে মরণ-পথের যাত্রী হব। শ্রম কর্ব্ব জগৎকে চিরস্থায়ী ভেবে কিন্তু জীবনের আচরণ-গুলিকে রাখ্‌ব জগতের ক্ষণস্থায়িত্ব-বোধের সঙ্গে শক্ত ক'রে বেঁধে।

নান্দাইল

৭ই বৈশাখ, ১৩৩৯

সিংরৈল হইতে কতিপয় যুবক আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

নিষ্ঠা ও অহিংসা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,---সাধনে নিষ্ঠা একান্তই প্রয়োজনীয়। কিন্তু নিষ্ঠার মানে কলহ নয়। অপরের মনে আঘাত না দিয়েও তুমি তোমার নিজের সাধন নিজে ক'রে যেতে পার। অবশ্য, কেউ যদি অন্যায় ভাবে বলেন যে, তুমি তোমার সাধন কর্ল্লে তার প্রাণে ব্যথা লাগ্‌বে, তুমি তাঁর দলভুক্ত না হ'লে তিনি মানসিক বড়ই আহত হবেন, তাহ'লে নাচার। অন্যথা, গায়ে প'ড়ে অপর সম্প্রদায়ের লোকের মনে আঘাত কিছুতেই দিওনা। নিষ্ঠা জিনিষটার ভিতরে যে একটা প্রবল অহিংসা রয়েছে, একথা কখনো ভুলে যেও না।

দলাদলির বুদ্ধি বিনাশ কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,---দলাদলির স্বভাব পরিহার কর্ব্বে। যাদের দলাদলির স্বভাব থাকে, তারা সাধন-জীবনে উন্নতিলাভ কত্তে পারে না। প্রথমে দলাদলি চলে নিজেদের সম্প্রদায় আর অপরের সম্প্রদায় নিয়ে। পরে তা নিজেদের নিজেদের মধ্যেই খাওয়া-খাওয়িতে পরিণত হয়। তখন একটা গ্রামে তিনটা হরিসভা হয়, এক পুকুরের তিন পাড়ে তিনটা মসজিদ নির্ম্মিত হয়, ধর্ম্মস্থানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি সুরু হয়। সুতরাং খুব অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌বে যে, তোমাদের ভিতরে দলাদলির বীজাণু আছে কিনা। থাক্‌লে তাকে দ্রুত বিনাশ কর্ব্বে।

সমসাধকদের সঙ্ঘবোধ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু দলাদলির বুদ্ধি আর সঙ্ঘবোধ এক জিনিষ নয়। একটা নিতান্তই ক্ষতিকর, অপরটা পরমলাভজনক। সমসাধকদের ভিতরে সঙ্ঘবোধ আবশ্যক। কারণ, তাতে পরস্পর পরস্পরকে সাধন-বিষয়ে উৎসাহিত উদ্দীপিত কত্তে পারে। এই জন্যই বৈষ্ণবেরা ব'লে থাকেন যে, সম্প্রদায়ী না হ'লে সাধন হয় না। তার মানে এই যে, সমসাধকদের পরস্পর দর্শনে ও ভাব-বিনিময়ে সাধনে উৎসাহ জন্মে, নামে রুচি আসে, শুষ্কতাবোধ কমে, সাহস বাড়ে।

অসাধকের মিলন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষা নিয়ে ঘরে গিয়ে ইষ্টমন্ত্র সিন্দুকে ভ'রে রেখে দিলাম, একে বলব না সমসাধক হওয়া। সবাই নিজ নিজ ঠাঁই গিয়ে প্রাণপণে সাধন কর্ব্বে, কে কতটা উন্নতি কত্তে পার, তার চেষ্টা কর্ব্বে, তবে ত' তোমাদের মিলন কল্যাণপ্রদ হবে! অসাধকদের মিলন পরিণামে তামসিক কুক্রিয়ার জন্ম দেয়। প্রত্যেকে চেষ্টা কর, সমসাধকদের মধ্যে তপস্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'তে এবং প্রত্যেকে চেষ্টা কর, সমসাধকদের ভিতরে গুণকে খুঁজে বের কত্তে। নিজের সাধনোন্নতি-চেষ্টা আর অপরের দোষানুসন্ধান-বর্জ্জন, এই দুইটীকে বিশেষ বন্ধু ব'লে জান্‌বে। আমি চাই যে, তোমাদের ভিতরে ভ্রাতৃ-বোধ জাগুক, কিন্তু আমি এও চাই যে, তোমরা প্রত্যেকে সাধক হও।

রহিমপুর (ত্রিপুরা)
১০ই বৈশাখ, ১৩৩৯

চরিত্র-গঠনই আশ্রমের আসল কাজ

অদ্য বেলা দশটার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা রহিমপুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আশ্রমে শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দের ১০৫ ডিগ্রী জ্বর। আশ্রমের কাজকর্ম্ম সব প্রায় বন্ধ। আশ্রমের অপর তিন ব্রহ্মচারীর মধ্যে একজন রন্ধন-শালায়, একজন রোগীর শুশ্রূষায়, একজন মাত্র মাঠে নামিয়া কিছু কাজ করিতেছেন। চতুর্দ্দিক তাকাইয়া বিশৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া গেল। কারণ জিজ্ঞাসা করিতে শ্রীশ্রীবাবা জানিলেন, কি একটী সামান্য কারণ লইয়া উৎসবের দিন যুবকদের সহিত বৃদ্ধদের মনোমালিন্য হইয়াছে, ফলে সকল যুবকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সঙ্কল্প করিয়াছে যে, প্রতীকার না হওয়া পর্য্যন্ত আশ্রমের কাজে কেহ আসিবে না।

শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই ব্যাপার নিয়ে আশ্রমীয় কোনও ব্রহ্মচারীর উপর ত' গ্রামের যুবক বা কোনও বৃদ্ধদের কারো কোনো অভিযোগ নেই?

গ্রামের জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি বলিলেন,—না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তা হ'লেই নিশ্চিন্ত। যুবক আর বৃদ্ধেরা নিজেরাই এই কলহ মিটাবেন। আমি এর ভিতরে নেই।

প্রবীণ ব্যক্তি বলিলেন,—কলহ দ্রুত না মিটালে যে যুবকরা আশ্রমের কাজে আস্‌বে না। তাতে আশ্রমের কাজের ক্ষতি হবে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ইটগড়া আর গাঁথ্‌নি দেওয়াই আশ্রমের কাজ নয়, চরিত্রগঠন করাই আশ্রমের আসল কাজ। সেই আসল কাজের দিকে দৃষ্টি দিয়েই আমি যা কবা প্রয়োজন কর্‌ব।

নিজ দোষকে খোঁজ

গ্রামের দুইজন প্রবীণ ব্যক্তি বৃদ্ধদের পক্ষ হইতে যাহা বলিবার বলিলেন। গ্রামের দুইজন যুবকের মুখেও পৃথক্‌ভাবে শ্রীশ্রীবাবা যুবকদের বক্তব্য শুনি-লেন। তৎপরে বলিলেন—কে দোষী, আর কে নির্দ্দোষ সে কথা আমার মুখ দিয়ে বের হওয়ায় আর লাভ কি? তোমরাও পরস্পর পরস্পরের দোষ দর্শন কর্ল্লে কি লভ্য হবে? তার চেয়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দোষকে খোঁজ এবং যত দ্রুত পার, তার সংশোধন কর।

রহিমপুর

১১ই বৈশাখ ১৩৩৯

আজও প্রেমানন্দের প্রবল জর। প্রাতে ধ্যানরত্নকে সহ শ্রীশ্রীবাবা আশ্র-মের কৃষিক্ষেত্রে বীজ বপন করিলেন। জীবন রন্ধনে ও অপর এক কর্ম্মী-প্রেমানন্দের শুশ্রূষায় রহিল। গ্রামের যুবকদের কাজে পাওয়া গেল না। অথচ আজ রবিবার।

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা ইটের কাজে লাগিলেন। সঙ্গী ধ্যানরত্ন। সন্ধ্যার কিছু আগে নরীপুর হইতে একটী যুরক আসিয়া কাজে লাগিলেন।

রহিমপুর

১৩ই বৈশাখ, ১৩৩৯

গৃহ-নির্ম্মাণের কাজ এখন কাঁচা-পাকা ইট মিশাইয়া করা হইতেছে। এক কারণ, বৃষ্টির দরুণ শুকাইবার পরে পাঁজা দেওয়ার ব্যাপার অনিশ্চিত, দ্বিতীয় কারণ ইট পুড়িবার কয়লার টাকা নাই। আশ্রমে এখন দারুণ দুর্ভিক্ষ।

অপরাহ্নে কাজ চলিতেছে। নবীপুর হইতে দুইটী মাত্র যুবক কাজ করিতে আসিয়াছেন। আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আকাশে ঘনঘটা। ঝড়ের সম্ভাবনা দেখিয়াও তিনজনে মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীবাবাকে গাথ্‌নির কাজে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ভয়ঙ্কর বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। নিকটে একটী ভাঙ্গা ঘর ছিল, সকলে তাহার ভিতরে গিয়া বসিলেন।

মহাপুরুষদের লোকোদ্ধার

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাপুরুষেরা কি যাকে তাকে উদ্ধার কত্তে পারেন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পারেন।

প্রশ্ন।—তবে করেন না কেন ?

শ্রীশ্রীবাবা—করেন, কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়। তাঁদের মঙ্গল-প্রভাব তাঁদের অজ্ঞাতসারে যাকে তাকে উদ্ধারের যোগ্য আবহাওয়া সৃষ্টি করে। তার সুযোগ নিয়ে পতিত জীবের প্রারব্ধ ক্ষয় হ'তে থাকে এবং ক্রমে তারা ভগবানের দিকে অগ্রসর হবার আকাঙ্ক্ষা পায়।

ভগবান কি মানুষকে পরীক্ষা করেন ?

ব্রহ্মচারী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—ভগবান্ কি মানুষকে পরীক্ষা করেন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—করেন। কিন্তু তিনি নিজে অজ্ঞ ব'লে নয়, মানুষ অজ্ঞ ব'লে। পাঠশালার শিক্ষক জানেন না যে ছাত্র কেমন ভাবে তৈরী হয়েছে। তাই তার পরীক্ষা নিয়ে তবে উপরের ক্লাসে তোলেন। কিন্তু ভগবান তোমাকে ভালরূপেই জানেন, তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত তাঁর চখে স্পষ্ট ভাস্‌ছে, তবু যে তিনি পরীক্ষা করেন, সেটী হচ্ছে তোমার নিকটে তোমার প্রকৃত মূল্য ধরিয়ে দেওয়া মাত্র।

আজিকার পরিশ্রমে শ্রীশ্রীবাবার শরীর এতই ক্লান্ত হইয়াছে যে তিনি অর্দ্ধেক আহার করিতেই প্রবল নিদ্রাভিভূত হইলেন। এইরূপ কঠোর শ্রমের জীবন তাঁহাকে রহিমপুরে কাটাইতে হইতেছে।

রহিমপুর
১৪ই বৈশাখ, ১৩৩৯

শেষ রাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবা কয়েকখানা পত্র লিখিলেন। তৎপরে স্নান-ধ্যান সমাপন করিয়া এক গ্ল্যাস জল দিয়া এক মুষ্টি চাউল খাইয়া ইট গাঁথিবার কাজে গিয়া লাগিলেন। আজ আর রন্ধন-শালায় কোনও কর্ম্মী নাই। কারণ, আজ তণ্ডুল নাই, সুতরাং রন্ধন হইবে না।

সকলে মিলিয়া বেলা বারোটা পর্য্যন্ত গাঁথুনির কাজ করা হইল। কাজ সারিয়া কুটীরে ফিরিবার পথে জনৈক ব্রহ্মচারী বাজারের দিকে চলিলেন। কারণ, নবীপুরের একটী যুবক (সুরেশ পোদ্দার) এতক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিতেছিলেন। কার্য্য-সমাপ্তি-কালে গোপনে তিনি ব্রহ্মচারীর হাতে একটী টাকা দিয়া অনুরোধ করিয়াছেন, যেন শ্রীশ্রীবাবার সেবায় লাগান হয়। তাই ব্রহ্মচারী চাউল-ডাইল কিনিবার জন্য বাজারে চলিয়াছেন।

রহিমপুর
১৫ই বৈশাখ, ১৩৩৯

বার্দ্ধক্যে ঈশ্বর-চিন্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহার পুত্রের উপরে বিরক্ত হইয়া শ্রীশ্রীবাবার নিকটে প্রাণের দুঃখের কথা বিবৃত করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাবা মন দিয়া প্রত্যেকটী কথা শ্রবণ করিলেন। তৎপরে বলিলেন,—পুত্রের প্রতি নিজের যা কর্ত্তব্য, তা ত' করেছেন। সে আপনার প্রতি তার কর্ত্তব্য কচ্ছে কি না কচ্ছে, সে বিষয় আর ভাববেন না। আপনি অবিরাম ভগবানের নাম করুন। পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য যথেষ্ট করেছেন, এখন ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য করুন। আগেকার দিনে তাই লোকে বাণপ্রস্থী হত। আজকাল তার সুযোগ কম। কিন্তু গৃহকে বন জ্ঞান ক'রে এখানে ব'সে অবিরাম ঈশ্বর-চিন্তন, তাঁর গুণানুধ্যান, তাঁর গুণকীর্ত্তন, তাঁর নামজপ এই সব করুন। সংসারের চতুর্দ্দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তার দিকে চোখ দেবেন না। বার্দ্ধক্যে যে ঈশ্বর-চিন্তন ছেড়ে অন্য চিন্তা করে, সে ত' শেষ সুযোগ হেলায় হারায়। সংসারকে

ভুলে যান্, পুত্রকন্যা ভুলে যান, আয়ব্যয় ভুলে যান, অবিরাম শুধু তাঁর নাম করুন।

অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ বনাম আত্মপ্রীতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আর একটী কথা ভেবেও আপনার সান্ত্বনা পাওয়া উচিত। আমরা যে লোককে অকৃতজ্ঞ বলি, তার কারণ অনেক সময়ে আমাদের আত্মপ্রীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। যাকে অকৃতজ্ঞ বল্‌ছি, হয়ত সে মোটেই অকৃতজ্ঞ নয়। সে যা কচ্ছে, হয়ত আমরা তার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তার মত অবস্থায় পড়্‌লে আমরাও হয়ত ঐ রকমই ব্যবস্থা কত্তাম। তাকে হয়ত দশ দিকে দশ জনের মনস্তুষ্টি কত্তে হয়। তাকে হয়ত জীবনের কোনো এক মহান্ আদর্শের পানে ফিরে ফিরে তাকাতে হয়। সকলের কুশলের জন্য যা আবশ্যক, তা কত্তে গিয়েই সে হয়ত তার বুদ্ধির ত্রুটীতে বা অসতর্কতায় আমাদের অপ্রীতিকর কিছু ক'রে ফেলেছে। এই সব ভেবে, তাকে অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত। অকৃতজ্ঞতার চেয়ে বড় অপরাধের কল্পনা মনুষ্য-চিন্তায় আসে না। তাই এত বড় অপরাধের অপবাদ কারো নামে দেওয়া উচিত নয়।

সংসারে থাকিয়া তরুণদের সমক্ষে ঈশ্বরানুরাগের দৃষ্টান্ত-স্থাপন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আগে ত' বাণপ্রস্থ-আশ্রম ছিল। পঞ্চাশ বছর পার হলেই বনে গিয়ে তপস্যা কত্তে হত। তপস্যা পূর্ণ হ'লে সন্ন্যাসী হ'য়ে জীব-শিক্ষায় রত হ'তে হ'ত। কিন্তু বাণপ্রস্থাশ্রম উঠে গেল কেন জানেন? এক কারণ, গৃহস্থের ঘোরতর সংসারাসক্তি। আর এক কারণ, সমাজ ও পরিবার থেকে দূরে না গিয়ে সমাজ এবং পরিবারের মাঝে থেকেই নিজেদের ভগবৎ-প্রীতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ক'রে তরুণদের মনে ঈশ্বরানুরাগ সৃষ্টির আবশ্যকতা। বাণপ্রস্থ যখন অবলম্বন করেন নি, তখন সকল সংসার-সংশ্রব বর্জ্জন ক'রে সংসারের মধ্যে থেকেই আপনাকে অবিরাম নাম-কীর্ত্তন, নাম-শ্রবণ, নাম-জপন প্রভৃতির দ্বারা সকল বালক-বালিকাদের মনে সকল কিশোর-কিশোরীদের মনে

ঈশ্বরানুরাগ সৃষ্টি কত্তে হবে। অপর সকল কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'য়ে এই কাজটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে করুন।

রহিমপুর
১৬ই বৈশাখ, ১৩৩৯

প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বীজবপন চলিতেছে। অপরাহ্নই বীজ-বপনের পক্ষে প্রকৃষ্ট কাল। কিন্তু অপরাহ্নে গ্রামের যুবকদের কিছু কিছু পাওয়া যায় বলিয়া ইটের কাজ হয়। ফলে কাদা প্রস্তুত করা ও বীজবপন প্রভৃতি কার্য্য প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

নামের বীজ বপন

বীজবপন করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এক একবার ক'রে নাম জপা যেন এক একটা ক'রে বীজ অনন্ত কালের বুকে বপন করা। একটী বীজও যদি অঙ্কুরিত হয়, তাহ'লে সহস্র সহস্র প্রেম-ফল পাবে, যার একটী খেলে জীব অমর হয়। এই যে কুমড়ো বীজ আর শশা বীজ বপন কচ্ছি, এইখানেই কি সব চেষ্টার শেষ? নামের বীজ বপন কত্তে হবে। নিরবধি কাল হচ্ছে তোমার কৃষিক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রে অবিরাম অনুক্ষণ নামের বীজ বপন কর।

ভগবান্‌কে সমক্ষে জানিয়া নাম জপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামজপ কর্ব্বার সময়ে মনে রাখ্‌বে, তুমি যাঁর নাম কচ্ছ, তিনি তোমার সমক্ষে উপস্থিত। তাঁর স্নেহদৃষ্টির মাঝে ব'সে ব'সে তুমি নাম জপ্‌ছ। তুমি যে মনে মনে নাম কচ্ছ, তা তিনি তাঁর চিরসজাগ কর্ণে শুন্‌তে পাচ্ছেন। একটী ডাকও তোমার বৃথা যাচ্ছে না, সব তাঁর হিসাবে আস্‌ছে। তিনি স্বচক্ষে সব দেখ্‌ছেন, স্বকর্ণে সব শুন্‌ছেন। জপকে প্রগাঢ় কর্ব্বার জন্য এই ভাবকে আগে অন্তরে প্রগাঢ় কর।

মহাপুরুষ ও সম্প্রদায়কে কোন্ দৃষ্টিতে দেখিবে ?

অপরাহ্নে ছানা কাদা হইতে কাঁচা ইট তৈরী হইতেছে। প্রাতে আশ্রমের দুই ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে কাজ করিয়াছেন। অপরাহ্নে গ্রাম হইতে মাত্র একটী যুবক আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—মহাপুরুষেরা এক একটী জীবন্ত নমুনা। একটী মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ কর্লে কি হয়, তার এক একটী নমুনা। মনুষ্যত্বের যতগুলি জীবন্ত নমুনা আছে, সবগুলি কখনো এক রকম হ'তে পারে না। এক এক্‌টী নমুনা এক এক রকম হবেই। কারণ, যিনি স্রষ্টা, তিনি বিচিত্র-কৌশলী শিল্পী। তাই তাঁর নমুনাগুলি বিচিত্র হবেই। বুদ্ধ যীশুর মতন নন, যীশু নানকের মতন নন, নানক গৌরাঙ্গের মতন নন, গৌরাঙ্গ কবীরের মতন নন, অথচ প্রত্যেকেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের জীবন্ত বিগ্রহ। অবশ্য নমুনা শব্দটী ইচ্ছা ক'রেই ব্যবহার করেছি। কেন করেছি জানো? দৃষ্টান্ত বল্‌তে এমন কিছু বুঝায় না যে, ঠিক্ এই রকম জিনিষ আরো শত শত আছে। দৃষ্টান্ত বল্‌তে বুঝায়, এ রকম আরো অনেক থাক্‌তেও পারে, আবার এই একটী মাত্রও থাক্‌তে পারে। যেমন, এক নারীর পঞ্চ স্বামীর দৃষ্টান্ত দেখাতে বল্‌লে, তুমি দ্রৌপদীর কথা উল্লেখ কর্‌বে। কিন্তু সমগ্র ভূভারতে আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটী পাবে না। এক একটী নমুনাকে সাম্‌নে রেখে অনুরূপ সহস্র সহস্র মহাপুরুষ জগতের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেছেন, সকলেই এক ঢং-এ গড়া, তাই আমরা বলি তারা এক সম্প্রদায়ের। 'মহাপুরুষ' কথাটী আর 'সম্প্রদায়' কথাটী তোমরা এই ভাবেতে বুঝো, তা হ'লেই কারো প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের আস্‌বে না।

স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম

রাত্রে শ্রীশ্রীবাবা দ্বারভাঙ্গার একটী স্কুলের ছেলেকে পত্র লিখিলেন,—

"ব্যায়াম-সাধনাকে চরিত্র-সাধনারই একটী অঙ্গ বলিয়া মনে করিও। দুর্ব্বলেরই দুশ্চরিত্রতা চিরস্থায়ী হইয়া বিরাজ করে। বাহুবল মনে বল বাড়ায়, অন্তরের সাহস বৃদ্ধি করে, এই জন্যই শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্যকে আমি ধার্ম্মিকতার এক প্রধান উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। যে দুর্ব্বল, সে সহজে প্রলোভনে টলে, ভয়ে দমে, বাধায় থামে। আজ যাঁহারা নিজেরা ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া দেশের সমক্ষে সবল স্বাস্থ্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং যাঁহারা পশুভাবের অনু-

ত্তেজকভাবে ব্যায়ামান্দোলনকে সৃষ্ট, পুষ্ট ও প্রসারিত করিবেন, তাঁহারা ধর্ম্ম-সংস্থাপনেরই সাহায্য করিবেন বলিয়া জানিও।"

রহিমপুর

১৭ই বৈশাখ, ১৩৩৯

মন্ত্র লইয়া সাধন না-করা

প্রাতে কোনও কার্য্য-ব্যপদেশে শ্রীশ্রীবাবা গ্রামের পশ্চিমাংশে কোনও গৃহে আসিয়াছেন। এই গৃহের একটী যুবক অনেকদিন হয় সাধন নিয়াছেন কিন্তু সাধন করেন না। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার সহিত কথা-প্রসঙ্গে স্বরচিত কয়েকটী পয়ার বলিলেন,—

"মন্ত্র লয় কিন্তু তার না করে সাধন,
ব্রত লয় কিন্তু তাহা না করে পালন,
বীজ কিনে কিন্তু তারে না করে বপন,
গ্রন্থ কিনে কিন্তু নাহি করে অধ্যয়ন,
মন্দির গড়িয়া তাহে না করে অর্চ্চনা,
গাভী কিনি' তারে নাহি দেয় তৃণ-কণা,
বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে না করে রক্ষণ,
বৃক্ষ রুপি নাহি করে সলিল সিঞ্চন,
মূলধন লভি' নাহি করে ব্যবসায়,
অলক্ষিতে সেই জন অধঃপথে ধায়।"

ভবানীপুর গ্রামে বহুব্যাপকভাবে টাইফয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অপরাহ্নে ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা ভবানীপুর আসিলেন এবং একটী একটী করিয়া রুগ্নের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বধৈর

১৮ই বৈশাখ, ১৩৩৯

প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা পূর্ব্বধৈর শ্রীযুক্ত দীনদয়াল ঘোষের বাড়ীতে আসিয়াছেন। সর্ব্বত্র যেমন, এখানেও তেমন, গ্রামের ভিতর একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

বহু লোক সৎকথা শুনিতে আসিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্গ রায় সকলের মুখপাত্র রূপে প্রশ্নাদি করিতেছেন।

ঈশ্বর-সাধনের ফল

প্রশ্ন হইল—ঈশ্বর-সাধনের ফল কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চিত্তপ্রশান্তি, নিশ্চিন্ততা, গভীর তৃপ্তি, অনাবিল শান্তি,—এই হ'ল ঈশ্বর-সাধনের প্রধান ফল। এই ফলের জন্য লোকে ভগবানকে ডাকে এবং ডাকার ফলে এই জিনিষ পায় ব'লেই ভগবান যাদের প্রত্যক্ষ হন্ নি, তারাও তাকে ডাকে।

সবচেয়ে বড় অলৌকিক শক্তি

প্রশ্ন।- ঈশ্বর-সাধনে কি অলৌকিক শক্তি লাভ হয় ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কারো হয়, কারো হয় না। কিন্তু যাদের হয়, তাদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বড় অলৌকিক শক্তিটী লাভ করেন, তিনি লাভ করেন ভগবানকে ভালবাসবার শক্তি। জগতের সকল শক্তির চেয়ে এই শক্তিই বড। সমুদ্রশোষণের শক্তি, মেঘাকর্ষণের শক্তি, লোকচিত্তমোহনের শক্তি, সব শক্তি প্রেম কর্‌বার শক্তির কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

অলৌকিক শক্তি ও ঈশ্বর-বিস্মৃতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু অনেক মানুষ ক্ষুদ্র লোভেই ঈশ্বর-সাধন করে। আবার অনেক সময়ে ক্ষুদ্র লোভ পরিহার ক'রে ঈশ্বর-সাধন কর্‌লেও তার ফলে সাধারণ অলৌকিক শক্তি লাভ হয়। যেমন, লোকের রোগ নিরাময় করা, মনের কথা জানা, ভবিষ্যৎ ব'লে দেওয়া, অপরের অজ্ঞাতসারে তাকে গন্তব্য পথ থেকে টেনে নিজের কাছে নিয়ে আসা বা তাকে দিয়ে তার অজ্ঞাতসারে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিয়ে নেওয়া, ইচ্ছানুসারে হিংস্র পশুদের উপরেও নিজ প্রভাব বিস্তার ক'রে তাদের বশীভূত করা, প্রভৃতি। কিন্তু এদের প্রত্যক্ষ ফল লোক-প্রতিষ্ঠা। এরা সাধককে অহঙ্কৃত, দর্পিত ও বৃথা কাজে রত ক'রে শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বর-চিন্তন ভুলিয়ে দেয়।

খাঁটী সাধকের প্রার্থনা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই জন্যই খাঁটি লোকেরা ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিকে বিপদ জ্ঞান ক'রে বর্জ্জন করেন। তাঁরা কেঁদে কেঁদে বলেন,—"হে প্রভো দয়াময়, আমার সকল শক্তি, সকল প্রতিষ্ঠা তুমি কেড়ে নাও দয়াল, কেড়ে নাও। আমার মুখের শোভা কেড়ে নাও, আমার কণ্ঠের মধু কেড়ে নাও, আমার তপঃপ্রভাব কেড়ে নাও, আমার সব বৈশিষ্ট্য কেড়ে নাও, আমার সাধনবিঘ্ন ভজনবিঘ্ন লোকপ্রিয়তা কেড়ে নাও।"

আকুবপুর

১৯শে বৈশাখ, ১৩৩৯

স্বর্গ অনিত্য বস্তু

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা পূর্ব্বধৈর হইতে আকুবপুর আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে 'স্বর্গ' সম্বন্ধে কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—স্বর্গে অনেক ভাল জিনিষ আছে রে! অপ্সরারা আছে চিরযৌবনা, পারিজাত আছে চিরসুগন্ধি, নৃত্য আছে, গীত আছে, নেশা করার জন্য মদ-ভাংএর চেয়ে সহস্রগুণ মোলায়েম সুধা আছে, —এত সত্ত্বেও কি স্বর্গ তোদের চিত্তকে আকৃষ্ট না ক'রে পারে? জিহ্বা, উপস্থ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি তাদের ভোগ্য বিষয় প্রচুর পাবে, স্বচ্ছন্দে পাবে, অতি দীর্ঘ-কাল ধ'রে পাবে, স্বর্গের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপের এইটাই না কারণ? কিন্তু হায়রে হায়, সেইখান থেকে আবার পতনও আছে। তোরা ত' সামান্য মানব, সাত বছরে একবার হরি-নাম জপ্‌লে হরি-ঠাকুর কৃতার্থ হবেন, কিন্তু যাঁরা হাজার হাজার বছর ধ'রে তপস্যা ক'রে ইন্দ্রত্ব পেলেন, সেই ভদ্রলোকেরা পর্য্যন্ত এক একজন অসুরদের গুঁতোর চোটে বারংবার স্বর্গভ্রষ্ট হচ্ছেন। তার কারণ কি জানিস্? স্বর্গ অনিত্য বস্তু। ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসার উপরে এর অস্তিত্ব।

নিত্য স্বর্গ চাই

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রার্থনা যদি কত্তে হয়, তবে নিত্য-স্বর্গে যাবার প্রার্থনা করবি। সেখানে মদ্য, নারী, নৃত্য, গীত, পুষ্প, শয্যা, খাদ্য আর

পানীয়ই লোভনীয় নয়,—চাইবি সেই স্বর্গ। যেই স্বর্গে গেলে আর "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" হয় না, যেখান থেকে পতন হয় না, যেখান থেকে কস্মিন্‌-কালে কারো দ্বারা বিতাড়িত হবার সম্ভাবনা নেই। সেই স্বর্গ, ভগবদ্দর্শনজাত পরম সুখের স্বর্গ। চক্ষু, কর্ণ, রসনা ও কামেন্দ্রিয়ের পরিতর্পণের স্বর্গ নয়, চক্ষুরও যে চক্ষু, কর্ণেরও যে কর্ণ, রসনারও যে রসনা, কামের যে কাম তার পরিতৃপ্তির স্বর্গ।

প্রেমিকের হৃদয়ই স্বর্গ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মর্ত্ত্যের সুখও যেমন অনিত্য, স্বর্গের সুখও তেমন অনিত্য, নিত্যসুখ একমাত্র ভগবদ্দর্শনে। তাঁকে লাভ ক'রেই নিত্য শান্তি, নিত্য তৃপ্তি, নিত্যানন্দ। তাঁকে এককণা ভালবাস্‌লে যে সুখ, কোটি-কল্পকাল স্বর্গবাসের সুখও তার তুলনায় নগণ্যাদপি নগণ্য। তোমরা তাঁকে ভালবাস, তাঁর প্রেমিক হও। প্রেমিকের হৃদয়ই প্রকৃত স্বর্গ, প্রেমিকের হাসিমুখই প্রকৃত দেবজ্যোতি, প্রেমিকের নয়নাশ্রুই প্রকৃত সুরধুনীপ্রবাহ, প্রেমিকের অকৃত্রিম ভাব-বিগলিত তনুর পুলক-চপল রোমাবলিই নন্দনোদ্যানের পারিজাত-পাদপ।

স্বর্গ আত্মপ্রসাদের স্তর মাত্র

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই ভৌম পৃথিবীর ন্যায় একটা ভৌম স্বর্গ তোমরা খুঁজে বেড়িও না। সেরূপ কোনও স্বর্গ নেই। স্বর্গ তোমার আত্মপ্রসাদের একটী স্তর মাত্র। সুখলোভী সকাম আত্মপ্রসাদই অনিত্য স্বর্গ। ভগবন্মুখী নিষ্কাম আত্মপ্রসাদই নিত্য স্বর্গ।

বাঙ্গরা

২০শে বৈশাখ, ১৩৩৯

ইহকাল ও পরকাল

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা আকুবপুর হইতে আসিয়াছেন। বাঙ্গরা হাইস্কুলের ছাত্রেরা দলে দলে শ্রীশ্রীবাবার চরণ দর্শন করিতে আসিতেছেন। কেহ কেহ সাধনোপদেশ গ্রহণ করিলেন।

একজন পরলোক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ইহলোক

যখন একটী আছে, তখন পরলোকও একটী আছেই। কিন্তু সেই লোক এম্‌নি এক অনির্ব্বচনীয় লোক যে, ইহলোকের ভাষায় তার বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি। তাই শিশুকে প্রবোধ দেওয়ার মতন ক'রে ইহলোকের সব উপমা দিয়ে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন রকম পরলোকের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু তোমরা সেসব কথার আলোচনায় শক্তির অপব্যয় ক'রো না। ইহলোকে যে যতটুকু ভালভাবে চল্‌তে পার, চল,—তারপরে পরলোক তার নিজের গতি নিজে দেখে নেবে। পরলোকের সুখলোভের বা দুঃখভীতির চিন্তাকে মনের কোনেও ঠাঁই না দিয়ে ইহকালের প্রত্যেকটী কর্ত্তব্য সযত্নে কর, প্রাণপণে কর, এবং কর্ত্তব্য উদ্‌যাপন ক'রে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে দেহত্যাগ কর। এর পরে যা হওয়া সঙ্গত, তাই হবে

রহিমপুর

২১শে বৈশাখ, ১৩৩৯

অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা বাঙ্গরা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গ্রামের চারিজন যুবক আসিয়া কাজে লাগিয়াছে। বয়কট * ভাঙ্গিবার জন্য কোনও চেষ্টা না করিলেও চারিজনকে পাওয়া সম্ভব হইয়াছে।

বঙ্গরার একটী যুবক শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া শ্রীশ্রীবাবা ইট কাটার কাজে লাগিয়া গেলেন।

কর্ম্মীকে কিভাবে প্রশংসা করিতে হয়

বাঙ্গরা হইতে রহিমপুর আসিতে আড়াই ঘণ্টা লাগিয়াছে। রৌদ্রও অত্যন্ত প্রখর। শ্রীশ্রীবাবা পথশ্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু আসিয়াই বিশ্রাম গ্রহণ না করিয়া ইটের কাজে লাগিয়া যাওয়ায় একজন এত ব্যস্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এতদিন পরে লক্ষ্মী ছেলেরা ত্রিশটীর জায়গায় চারিটীও

---

* 'এগারই আষাঢ় পর্য্যন্ত যে এই বয়কট পূরাদমে চলিয়াছিল—তাহা আমরা পরবর্ত্তী দিবস সমূহের বিবৃতিতে দেখিতে পাইব।

যে মান-অভিমান ভুলে গিয়ে কাজে এসে লেগেছে, তাদের প্রশংসা কত্তে হবে ত! মুখের বাক্যে প্রশংসা কল্লে তা শূন্যগর্ভ হ'ত। চিত্রকরকে প্রশংসাজ্ঞাপন কত্তে হয়, ছবি এঁকে। কবিকে প্রশংসাজ্ঞাপন কত্তে হয়, কবিতা লিখে। গায়ককে প্রশংসাজ্ঞাপন কত্তে হয়, গান ক'রে। তেমনি কর্ম্মীকে প্রশংসা জ্ঞাপন কত্তে হয় কর্ম্ম ক'রে। ত্যাগীকে প্রশংসাজ্ঞাপন কত্তে হয় ত্যাগ স্বীকার ক'রে। ধার্ম্মিককে প্রশংসাজ্ঞাপন কত্তে হয় ধর্ম্মাচরণ ক'রে।

রহিমপুর

২৩শে বৈশাখ, ১৩৩৯

ঊর্দ্ধবাহু সাধনা

কাঁচা-পাকা ইট দিয়া কুটীরের গাঁথুনি চলিতেছে। বেলা সাড়ে এগারটার সময়ে মালিসাইর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সাহা আসিয়া নিকটে বসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,- সাধুদের মধ্যে অনেককে দেখা যায় ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে থাক্‌তে। এর সুফল কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ্‌তে গেলে, এর ভালোর দিক্ দু' রকম। শরীরের যে কোনও একটী অঙ্গকে ঊর্দ্ধমুখ কর্ল্লে মন ঊর্দ্ধমুখ হয়। এই হচ্ছে এক রকম। আবার, যতদিন ভগবদ্দর্শন না ঘটে, ততদিন হাত নামাব না, এই পণের ফলে ভগবৎ-সাধনের তীব্রতা বাড়তে পারে। কিন্তু ঊর্দ্ধবাহুত্বই সাধুত্ব বা সাধকত্ব নয়! ভগবৎ-প্রেমই সাধুত্ব, ভগবৎ-সাধনায় অবিরাম লেগে থাকাই সাধকত্ব। ঊর্দ্ধবাহু না হ'য়েও সাধু বা সাধক হওয়া সম্ভবপর।

ঊর্দ্ধবাহুর কুফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ঊর্দ্ধবাহু হওয়ার শারীরিক মন্দফল যাই হোক্, লোক-মানহেতু মানসিক মন্দফল হ'তে পারে। ঈশ্বর-সাধন না ক'রেও শুধু ঊর্দ্ধবাহুত্বের জন্য চিত্তে দর্প বা দম্ভের উদ্ভব হ'তে পারে। যেমন ধর, সাধন করি না, কিন্তু মালা-তিলক প্রভৃতির যদি বাহুল্য রক্ষা করি, তবে এর ফলে সাধুত্বের অভিমান আসা বিচিত্র কিছু নয়।

নকল ঊর্দ্ধবাহু

সুরেনবাবু বলিলেন,—বাংলা দেশ সুভিক্ষ ব'লে, আর বাঙ্গালীরা অতিথি-পরায়ণ ব'লে হিন্দুস্থানী সাধকেরা দলে দলে এখানে আসেন। হিন্দীভাষী প্রদেশগুলির মত এখানে ধর্ম্মশালা নেই, তার কারণ এই যে, প্রায় গৃহস্থমাত্রেই নিজ উদরান্নের অংশবিশেষ এবং গৃহের অংশবিশেষ সাধু সজ্জনের সেবার ও অবস্থানের জন্য ছেড়ে দিতে প্রস্তুত বা সমর্থ। এজন্য অনেক সাধু বাংলায় আসেন। তাদের মধ্যে কোনো কোনো ঊর্দ্ধবাহু সাধুকে দেখা গিয়েছে, নিজ মোকামে পৌছে দুহাত ধ'রেই কুড়াল দিয়ে কাঠ কাভ্‌ছেন। অর্থাৎ, তাঁর ঊর্দ্ধবাহুত্ব লোক-প্রবঞ্চনার জন্য।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু এরূপ একটী দুটী দৃষ্টান্ত দেখেই সকল ঊর্দ্ধ-বাহুদের উপরে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। নকল টাকা যেমন আছে, আসল টাকাও কম নয়।

মন্ত্রবাণী লেখা

দ্বিপ্রহর হইলে কর্ণি রাখিয়া শ্রীশ্রীবাবা গোমতীতে স্নান করিলেন এবং "প্রভাত-ভবনে" আসিয়া দেখিলেন, যিনি জ্বররোগীদের নিয়া ব্যস্ত ছিলেন, তিনি এখন পর্য্যন্ত রান্না চাপাইতে পারেন নাই। কারণানুসন্ধানে জানিলেন, চাউল ছিল না।

উপাসনান্তে শ্রীশ্রীবাবা পাটখড়ির কলম লইয়া "মন্ত্রবাণী" লিখিতে বসিলেন। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত লিখিবার পরে অর্দ্ধ ঘণ্টা উপাসনা করিলেন। তৎপরে পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং রাত্রি সাড়ে নয়টায় কলম থুইলেন। ইতিমধ্যে শ্রীমান উমাকান্ত স্কুলে 'মটো' বিক্রয় করিয়া কয়েক আনা পয়সা আনিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা তণ্ডুলাদি ক্রয় করিয়া রাত্রি দশ ঘটিকায় আহার হইল।

রহিমপুর

২৪শে বৈশাখ, ১৩৩৯

চাষা ও মজুরের কাজে নামজপ

অদ্য শুধু কাদাই তৈরী হইতেছে। একজন জল আনিতেছে, একজন মাটি

কাটিতেছে, একজন পা দিয়া মাড়াইয়া কাদা ছানিতেছে। শ্রীশ্রীবাবাও সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শরীর বাইরের কাজে লগ্ন থাকুক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মন উচ্চতর চিন্তার অনুশীলন করুক। চাষা আর দিনমজুরের কাজ এমন কিছু নয়, যাতে সর্ব্বক্ষণ মন তাতেই লাগিয়ে রাখা দরকার। এসব হচ্ছে সূক্ষ্ম-শিল্প-বুদ্ধি-হীন কাজ। তাই এতে অন্তর চিন্তার অবসর বেশী। শরীর করুক কাজ, আর, মন জপুক নাম।

সূক্ষ্ম শিল্পে নামজপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যারা সূক্ষ্ম শিল্পের কাজ করে, যাতে মনোনিবেশের ত্রুটী ঘটলে জিনিষ নষ্ট হবে, তাদের পক্ষে চারবেলা চার অবসরে ক'ষে ভগবানের নাম কর্ল্লেই হবে। তারপরে ঘড়ির কাঁটার মত সূক্ষ্মস্রোতে সকল কাজের মাঝে আপনি মন নিজের সুবিধামত নামের সেবা করবে। কোনও সূক্ষ্ম-শিল্পী যদি রমণীর প্রেমে মজে, তা'হলে তার শিল্পকাজের ফাঁকে ফাঁকেও যেমন সেই সুন্দরীর মুখখানা মনে পড়ে, ঠিক্ তেমনি সে যদি নামের রসে মজে, তা'হলে অতি সূক্ষ্ম শিল্পকাজের মধ্যেও বারংবার নাম তার কাছে আপনি থেকে সেবা আদায় ক'রে নেন।

রহিমপুর

২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৯

আশ্রমে জলযোগ করিবার কিছু ছিল না। সুতরাং শূন্যোদরেই শ্রীশ্রীবাবা মাথায় গামছা বাঁধিয়া কুটীর গাঁথিবার কাজে একটী ব্রহ্মচারী সহ লাগিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অদ্য অত্যন্ত অসুস্থতা বোধ করিয়া সাড়ে দশটায়ই কাজ সারিয়া "প্রভাত-ভবনে" ফিরিলেন। আসিয়া দেখিলেন, রান্না চাপে নাই, কারণ, কল্যকার তণ্ডুলাদি কল্যই শেষ হইয়াছে। দুগ্ধ বর্ত্তমানে এখানে দুই পয়সা করিয়া সের। অতএব দুগ্ধ কিছু আছে মনে করিয়া শ্রীশ্রীবাবা পান করিবার জন্য সামান্য দুগ্ধ চাহিলেন। দুগ্ধ লইয়া আসা হইলে আজ কতটা দুগ্ধ কেনা হইয়াছে, শ্রীশ্রীবাবা তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মচারী জানাইলেন যে,

আজ এক সের দুগ্ধ কেনা হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা দুগ্ধ পান করিলেন না। দুধের বাটি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—রুগ্ন ছেলেদের দুধ দরকার, আমি সুস্থ আছি।

শ্রীশ্রীবাবা চাহিয়া লইয়া দুগ্ধ ফিরাইয়া দিলেন দেখিয়া আশ্রমের ব্রহ্মচারীরা সকলেই মনে বড় বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—তোমাদের যখন মনে বেদনা লাগিয়াছে, তখন সে বেদনা শীঘ্রই দূর হইবে। ইহা বলিয়া শ্রীশ্রীবাবা পাটখড়ির কলম লইয়া "মন্ত্রবাণী" লিখিতে বসিলেন।

প্রায় মিনিট বিশেক পরে পূর্ব্বধৈর গ্রাম হইতে দুইটী যুবক দুগ্ধ এবং অপরাপর খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে লইয়া আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীশ্রীবাবা কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিলেন ও রান্না চাপিল। ব্রহ্মচারীদের বেদনাক্লিষ্ট মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিল।

অপরাহ্নে প্রবল বৃষ্টি হইতে লাগিল। ফলে, মাঠের বা কুটীর-নির্ম্মাণের কাজ বন্ধ রহিল।

রহিমপুর
২৬শে বৈশাখ, ১৩৩৯

গত রাত্রিতে প্রবল বর্ষণ গিয়াছে। ফলে নির্ম্মায়মাণ আশ্রম-কুটীরখানার বিশেষভাবে ক্ষতি হইয়াছে। কারণ, উহা কাঁচা-পাকা ইট দিয়া গাথা হইতেছিল। যে সব ইট কাটিয়া থাক্ সাজান হইয়াছে, তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আকাশ ও মাটির যাহা অবস্থা, তাহাতে বাহিরের কাজ সম্ভব নহে বলিয়া আশ্রমীরা সকলেই আজ পূর্ণ বিশ্রাম নিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিতে বলিলেন।

জীবন-গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায়

ময়মনসিংহের জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"মনে রাখিও, তপস্যাই জীবন-গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায়। বহু তর্ক, আলোচনা বা আন্দোলনে নহে, প্রয়োজনাতিরিক্ত ঝুড়ি ঝুড়ি গ্রন্থ অধ্যয়নে নহে, তীর্থের পর তীর্থ বৃথা পর্য্যটনে নহে, গাঁজা টিপিবার জন্য সাধুনামধারী পুরুষদের সঙ্গ-

লাভে নহে, ভগবানের অমৃতময় নাম অনুক্ষণ নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে স্মরণেই জীবন গঠিত হয়, চরিত্র গঠিত হয়, চিত্তবৃত্তির অযথা কোলাহল নিবৃত্ত হয়, প্রাণ সংযত হয়, হৃদয় জুড়িয়া পবিত্র প্রেমের বিমল বন্যা প্রবাহিত হয়।"

প্রেম ও লালসা

ময়মনসিংহেরই অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,--

"যে প্রেম নীচকে টানিয়া উচ্চে তুলিতে পারে না, ছোটকে বড করিতে পারে না, ক্ষুদ্রকে ত্রিভুবন-বিস্তারী বিশাল প্রসার প্রদান করে না, তাহা প্রেম নহে, তাহা অন্ধ লালসা মাত্র। মনে রাখিও, লালসা তোমার অসতর্কতার সুযোগ লইয়া ভূমিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হয়, আর এই অপার্থিব প্রেম তপস্যার কল্প লতিকাতেই ফলিয়া থাকে।"

চরিত্রকে সবল কর

ময়মনসিংহের অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—"চরিত্রকে সবল করিয়া গড়িয়া তোল। চরিত্রের দুর্ব্বলতা লইয়া জগতে কেহ কোনও মহৎ কার্য্য করিতে পারে নাই, বরং সামান্য আঘাতে টলিয়া গিয়াছে। কঠিন কঠোর করিয়া চরিত্রকে গঠন কর। জগতে তোমার করিবার কাজ অনেক আছে, সে কথা স্বীকার কর এবং স্বীকার যে করিয়াছ, তাহার প্রমাণ প্রদর্শন কর চরিত্র গঠনের অত্যুগ্র সাধনায় আত্মবিনিয়োগ করিয়া। তোমাদের জন্য আমার বাণী, শত নয়, সহস্র নয়। বাণী আমার একটী,—বলিষ্ঠ হও, দ্রঢ়িষ্ঠ হও।"

তাহাকেই বলি মা

ময়মনসিংহ-প্রবাসিনী বরিশালের একটী কুমারী মেয়েকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তাহাকেই বলি মা, সহস্র বাধার মধ্যেও যে পুরুষ-জাতির প্রতি প্রেম সিক্ত বাৎসল্যস্নিগ্ধ পবিত্র সন্তান-ভাব পোষণ করিয়া চলিতে পারে। আর, তাকেই বলি বাপের বেটী, বাধার গর্জ্জন, বিঘ্নের আক্রোশ, প্রতিবাদের হুঙ্কার সব অগ্রাহ্য করিয়া নিয়ত যে নিজের চিত্তকে পরমেশ্বরের পরমপ্রাণারাম মধুময় নামের সঙ্গে যুক্ত করিয়া রাখে। তুমি ভগবানের নাম ভালবাস মা? তুমি

তাঁর নাম স্মরণে আনন্দ পাও না? তুমি কি ভগবানের মাধুর্য্যময় মোহন-মূরতি ধ্যান করিতে তৃপ্তি পাও না? উত্তরে যদি 'হাঁ' বলিতে পার, তবে বলিব, তুমি আমার সত্যিকারের মা। উত্তরে যদি 'না' বল, জানিব তোমাকে আরও অপেক্ষা করিতে হইবে।"

নামের সেবা ও সূক্ষ্ম সচ্চিন্তার শক্তি

ময়মনসিংহের অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"কুসংসর্গের সহস্র প্রভাব হিতকামীর সূক্ষ্ম সচ্চিন্তার শক্তিতে দূর হইয়া যাইবে। এখানে বসিয়া তুমি যে চিন্তা কর, তাহা ঘরের দেয়াল ভেদিয়া গৃহ-ছাদ ফুঁড়িয়া দূরদরান্তরে যাইবার ক্ষমতা রাখে এবং অজ্ঞাতসারে মানবচিত্ত পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। যাহাকে সৎপথে রাখিতে চাও, তাহাকে মুখ ফুটিয়া সদুপদেশ দেওয়ার তত বড় আবশ্যকতা নাই, যত বড় আবশ্যকতা আছে তার সম্পর্কে তোমার চিত্ত ও চিন্তাকে অকপটভাবে নিঃস্বার্থ-হিতৈষণা-পূর্ণ করা। যার সঙ্গে যার স্বার্থভাবের যোগ আছে, তার সম্বন্ধে তার চিন্তাশক্তির ক্রিয়া তত স্থূল ও নিষ্প্রভ হইতে চাহে। নিঃস্বার্থতাই পর-সংশোধনের শক্তিকে সঞ্জীবিত রাখে।

"অন্তর খুঁজিয়া যদি স্বার্থগন্ধ পাও, তবে ভগবানের মঙ্গলময় মহানামের শক্তিতে তাহা আপনি পরাহত হইবে, নামের সাধনায় একনিষ্ঠ হইলে সূক্ষ্ম স্বার্থকে বিধ্বস্ত করিতে পৃথক সাধনার প্রয়োজন পড়িবে না। আর, সহজ চক্ষে যদি চিত্তের প্রচ্ছন্ন স্বার্থ-পঙ্কিলতা ধরা না পড়ে, তাহা হইলে নামের সেবাই তোমার দুর্ব্বলতার স্বরূপ অচিরে ফুটাইয়া তুলিয়া স্বহস্তে তাহার নিধন সাধন করিবে। নামকেই সর্ব্বাবস্থায় প্রাণের প্রাণ বলিয়া আলিঙ্গিয়া ধর।"

রহিমপুর

১৭।২৮ বৈশাখ, ১৩৩৯

হাড়ভাঙ্গা শ্রম

এই দুইদিন হাড়ভাঙ্গা শ্রম চলিয়াছে। কারণ শ্রীশ্রীবাবাকে দুইদিন বাহিরে থাকিতে হইবে এবং প্রবল বৃষ্টিতে যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, তাহার

সংশোধন দ্রুত আবশ্যক। গ্রামের যুবকেরাও অসম্ভব উৎসাহসহকারে শ্রম করিতেছেন। ক্রমশঃ দুই একজন করিয়া গ্রাম্য কর্ম্মীর সংখ্যা বাড়িতেছে। ২৭ তারিখ দুপুরে দুইটার সময়ে এবং ২৮ তারিখ রাত্রি আট ঘটিকায় কাজ ছাড়া হইয়াছে।

লিপ্তা কাহাকে বলে

বাহির হইতে একটী যুবক আসিয়া আশ্রমে আছেন। তিনি কোনও শ্রমজনক কার্য্যে যোগ দিতে ইচ্ছুক নহেন, অথচ ইচ্ছা পোষণ করেন যে আশ্রমবাসী হইয়া থাকিবেন। তিনি নিতান্ত বাধ্য হইলে কখনও কখনও পরিশ্রম করেন। প্রায়শই দর্শক ও গ্রামের লোকদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া কাল কাটান। শ্রীশ্রীবাবার এই সুকঠোর শ্রম দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন,—এই যে এত অসম্ভব শ্রম করা একখানা কুটীরের জন্য, এটা লিপ্ততা কিনা।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—না। যা আমি গড়্‌ছি, তার অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস আমি জানি। অনিত্য বস্তুকে নিত্য ব'লে জ্ঞান ক'রে তার সংসর্গ করাই লিপ্ততা।

নীরব উপবাস

২৯শে বৈশাখও আশ্রমে জলযোগ করিবার কিছু ছিলনা। শূন্যোদরেই শ্রীশ্রীবাবা দুইটী ব্রহ্মচারী সহ কাজে লাগিয়াছেন। কিন্তু অন্য কোনও প্রয়োজনে কুমিল্লা যাইতে হইবে বলিয়া সাড়ে দশটায়ই কাজ সারিয়া "প্রভাত ভবনে" ফিরিয়াছেন। মটর-ভাড়ার পয়সাটা পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহা খরচ করিয়া রন্ধনাদি করিলে কুমিল্লা যাওয়া আর হয় না। সুতরাং বেলা একটা পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকিয়া স্কুলে বিক্রয়ের জন্য কতকগুলি মন্ত্রবাণী" লিখিয়া দিয়া শ্রীশ্রীবাবা কুমিল্লা রওনা হইলেন। আশ্রমের ব্রহ্মচারিত্রয়ও অভুক্ত রহিলেন। মাত্র রুগ্ন ব্রহ্মচারীটির পথ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইল। সূর্য্যাস্তের সময়ে শ্রীশ্রীবাবা কুমিল্লা পৌছিলেন। রাত্রে আহারান্তে শ্রীশ্রীবাবা প্রকাশ করিলেন যে, আজ তিনি সমগ্র দিন উপবাসী ছিলেন।

৩০শে এবং ৩১শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীবাবা নিজ কার্য্যে কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী কয়েক

স্থানে গমনাগমন করিলেন এবং ১লা জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ন তিনটায় রহিমপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, রুগ্ন ব্রহ্মচারীর জ্বর সারিয়াছে, কিন্তু অপর তিনজন কাষ্ঠমূর্ত্তি। শ্রীশ্রীবাবা কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, এই কয়দিনের জন্য "মন্ত্রবাণী' একখানাও বিক্রয় হয় নাই, ফলে দুই পয়সার মুড়ি মাত্র ক্রয় করা সম্ভব হইয়াছে। দুই পয়সার মুড়িকে প্রচুর জলে ভিজাইয়া সেই জলে লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইয়া ইহারা ২৯।৩০।৩১ বৈশাখ এই তিন দিন প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। অন্য তিনজনেই ভাত খাইয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রয়োজনের তুলনায় সিকি অংশ মাত্র।

"রহিমপুরের আর পুপুন্‌কীর উপবাসে তফাৎ আছে। পুপুন্‌কীতে কেহ আসিয়া আশ্রমের হাঁড়ী খুঁজিয়া দেখিত না যে, আশ্রম নিস্তণ্ডূল কি না। রহিমপুরে তেমন লোক আছেন। তৎসত্ত্বেও যে মাঝে মাঝে আশ্রমে উপবাস-ক্লেশ হয়, তাহার কারণ গ্রামবাসীদের অমনোযোগ নয়। তাহার কারণ এই যে, রহিমপুরে আশ্রমীরা এমন ভাবে চলিতে পারিতেছেন যে, তাঁহাদের অন্নাভাবের কথা কেহ ঘৃণাক্ষরেও জানিতে পায় না।"—এইরূপ মতামত প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীবাবা বারংবার আশ্রমের ব্রহ্মচারীদের প্রতি নিজ সন্তোষ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

অনুতাপ ও মনের মলিনতা

গ্রামান্তরের একটী যুবক সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা তাহাকে বহুবিধ হিতকর উপদেশ দিবার পরে বলিলেন,—ময়লা কাপড়কে যেমন সোডার জলে সিদ্ধ ক'রে পরিষ্কার কত্তে হয়, পাপমলিন মনকে তেমন অনুতাপের উষ্ণ জলে টগবগ ক'রে ফুটিয়ে শুদ্ধ কত্তে হয়। তুই আগে খুঁজে দেখ্, তোর অন্তরে অনুতাপ এসেছে কি না। যে অন্যায় কাজ করেছিস্, তার জন্য প্রাণে ধিক্কার এসেছে কি না। লোকে জেনে গেছে ব'লে যে লজ্জাজনিত অনুতাপ, ওর কোনো দামই নেই। অন্যায় করেছিস ব'লে যে অনুতাপ, তা এসেছে কি না।

মেকী অনুতাপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একবার অনুতাপ ক'রে পরে আবার যে ব্যক্তি সেই কাজই করে, বুঝ্‌তে হবে, তার অনুতাপ নিতান্তই বাজে জিনিষ। মেকী অনুতাপে কারো চিত্তশুদ্ধি হয় না। মেকী অনুতাপে কারো আত্মোন্নতির সাহায্য হয় না। অন্তর অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌, একবার যা ক'রে এখন অশ্রু-বিসর্জ্জন কচ্ছিস্‌, আবার তা কর্ব্বি কি না। সুযোগ পেলেই আবার এরূপ জঘন্য অন্যায়ে অগ্রসর হবি কি না। বারংবার অনুসন্ধান কর্‌, শতবার সহস্রবার আত্মপরীক্ষা কর্‌।

দুর্ব্বলতাকে চেনা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যদি দেখ্‌তে পাস্‌, একবার এত অশ্রু বিসর্জ্জনের পরেও মনের ভিতরে পূর্ণ চেতনা জাগে নি, এখনো তুই অনুরূপ সুযোগ পেলে হয়ত লোকে যদি না জান্‌তে পারে তাহলেই পুনরায় এইরকম অসৎ কাজ ক'রে বস্‌বি, তাতেও লজ্জার কোনো কারণ নেই। তুই যে নিজের দুর্ব্বলতাকে চিন্‌তে পেরেছিস, এটাই এক মস্ত বড় লাভ। নিজের দুর্ব্বলতাকে চিন্‌তে পারাই সবল হওয়ার প্রথম সোপান।

প্রতিজ্ঞা কর, পবিত্র হইবে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কত পাপের সংস্কার তোর ভিতরে লুক্কায়িত হ'য়ে রয়েছে। নিরন্তর আত্মপরীক্ষা দ্বারা তুই তাদের পরিচয় নেবার চেষ্টা করিস্‌ না ব'লেই তারা হঠাৎ এক একজন এক এক সুযোগে প্রবল হ'য়ে উঠে তোকে দিয়ে পাপানুষ্ঠান করিয়ে নেয়। আত্মপরীক্ষার শক্তি বাড়াবার জন্য দৃঢ়ব্রত হ। বৃথা বাক্যব্যয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুযোগগুলিকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছিস্‌ কিন্তু নিমেষের জন্যও ভবিষ্যৎ ভাবিস্‌ নি। তারই না ফল এইসব অন্তর্দ্দাহ! আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর্‌, পবিত্র হবার চেষ্টা কর্ব্বি। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর্‌, হেলায় খেলায় জীবনটাকে নষ্ট হতে দিবি না।

পবিত্র জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাঁরা পবিত্র জীবন যাপন ক'রে গিয়েছেন, তাঁদের

প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করার শিক্ষার অভাবই যে তোর বর্ত্তমান দুর্গতির অন্যতম কারণ, সেই কথা বিশ্বাস কর্। চিন্তার ধারা আজ ফিরিয়ে নে। অপবিত্র জীবন যাপনকারীদের জীবনের প্রতি যে অতিমাত্রায় লক্ষ্যশীল হ'য়ে উঠেছিলি, তারই পরিণাম আজকের এই মনস্তাপ, এই লোকলজ্জা, এই মর্ম্মদাহ। চক্ষুকে জগতের পবিত্র জীবনগুলির উপরে এনে ফেল্। কর্ণকে তাঁদের জীবনের পবিত্র কাহিনীগুলিতে রমণ কত্তে অভ্যাস করা। রসনাকে তাঁদের চরিতকথনে রত কর। চক্ষু, কর্ণ, রসনার সহযোগে এইভাবে জীবন-গঠনের উপাদানগুলি আহরণ কর।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

বেলা সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত গাঁথুনির কাজ চলিয়াছে। তৎপর 'প্রভাত ভবনে' আসিয়া শ্রীশ্রীবাবা আহারাদি করিলেন। আহারান্তে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

চরিত্রগঠনে আত্মাপরাধ-স্বীকৃতির স্থান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চরিত্র যদি গঠন কত্তে চাও, তাহ'লে অপরাধ ক'রে অপরাধ স্বীকার করাই অধিকাংশ স্থলে ভাল। ভালো এই জন্যে যে, প্রত্যেকটী অপরাধ মনের উপরে দুঃসহ বোঝা চাপায়। অপরাধ-স্বীকৃতির ফলে সেই বোঝাটা নেমে যায়, মনটী হাল্কা হয়ে পড়ে। এমন যদি কোনও জটিল স্থল হয়, যেখানে অপরাধ-স্বীকৃতি আত্মসংশোধনের বিঘ্ন এবং অপরাধের কথা গোপন রাখ্লেই আত্মসংশোধন সহজতর, তবে তার ক্ষেত্রে আলাদা কথা। কিন্তু মানুষের জীবনে এমন স্থল খুব কমই হয়।

পাপ কি সর্ব্বসাধারণ্যে প্রকাশযোগ্য ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু অপরাধ স্বীকৃতির মানে এই নয় যে, তুমি হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে দু-হাজার লোককে জানিয়ে দিলে যে. তুমি তোমার প্রতিবেশী-কন্যার সতীত্ব-নাশ করেছ। কারণ, এতে তোমার চরিত্রোন্নতির সম্ভাবনা যদি থাকেও, তবু তোমার পাপ-দৃষ্টান্ত দেখে অপর বহু লোকের পাপ কার্য্যের প্রতি ঘৃণা ক'মে যেতে পারে এবং এর ফলে এরা অনেকে সেই

কার্য্যের অনুষ্ঠান কত্তে পারে। তুমি একখানা বই ছাপিয়ে তোমার জীবনের কুকীর্ত্তিসমূহ প্রচার ক'রে দিলে তোমার যদি চরিত্রোন্নতির সম্ভাবনা কিছু থাকেও বা, তবু তোমার জীবনের অনেক গূঢ় সংবাদ জেনে সাধারণ বহুলোক এমন সব পাপের অনুষ্ঠানে কৌতূহলী হ'তে পারে, যে সব পাপানুষ্ঠান সম্বন্ধে তাদের কোনো কৌতূহল বা ধারণা মাত্রও ছিল না। সুতরাং তোমার নিজের এতে উপকার কিছু হোক বা না হোক, এমনভাবে তুমি তোমার পাপকার্য্যের কথা প্রচার ক'রে বেড়াতে পার না, যাতে পরোক্ষভাবেও সমাজের লোকের অনিষ্ট সাধিত হ'তে পারে। যেমন, একজন গণিকা তার দৈনিক জীবন কাহিনী সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার কত্তে অধিকারিণী নয়,—সাহিত্যের দোহাই দিয়েও নয়, সরলতার দোহাই দিয়েও নয়।

আত্মাপরাধ-বর্ণন কাহার নিকটে সঙ্গত?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু যার কাছে গিয়ে জীবনের পাপ-কাহিনী প্রকাশ ক'রে ধর্‌লে তার কোনো নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতি হ'তে পারে না অথচ তোমার জীবনের গুরুভার দূর হ'য়ে যেতে পারে, এমন লোকের কাছে তুমি জীবনের সকল অপরাধ স্বীকার কত্তে পার। এবং তাই করা উচিত। মাঠে চ'ড়ে বেড়াচ্ছে একটা খোদাই ষাঁড়, তার কাছে গিয়ে আত্মাপরাধ-বর্ণনে কোনও লাভ নেই। যার কাছে বল্লে লাভ আছে, ক্ষতি নেই—শ্রোতারও নেই, বক্তারও নেই, যার কাছে বল্লে মনটা হাল্‌কা হ'য়ে যাবে, সদুপদেশ ও সদুপায় মিল্‌বে, কালিমাচ্ছন্ন জীবন-পথের ডাইনে বায়ে দুটি একটি ক'রে পবিত্রতার মালতী-স্তবক ফুটে উঠ্‌বে, আত্মাপরাধ বর্ণন তাঁর কাছেই গিয়ে করা উচিত।

আত্মাপরাধ-বর্ণনকারীর মনোভাব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শুধু অপরাধগুলি নিখুঁত ভাবে বর্ণনা কল্লেই হ'ল না। তদুচিত মনোভাব সঙ্গে থাকা চাই। গড়গড় ক'রে জীবনের সব কথা ব'লে ফেল্‌ছি দেখ দেখি আমি কত সরল,—এরকম ভাব যেন অন্তরে না

থাকে। কেমন আমি সব ঘটনার নিখুঁত বর্ণনা ক'রে যাচ্ছি, আমার সত্যবাদিত্ব, আমার বর্ণনার পারম্পর্য্যজ্ঞান, আমার বর্ণনা-ভঙ্গীর কবিত্ব, এসব লক্ষ্য কর্‌লে কে আমাকে না প্রশংসা কত্ত,—এই ভাব নিয়ে নয়। আমি যে জেগে উঠেছি এবং ঘুমের ভিতরের স্বপ্নকে স্বপ্ন ব'লেই বুঝেছি, সেই অনুচিত স্বপ্নের জন্য যে আমি দুঃখিত, এর পুনরাবৃত্তি প্রতিরুদ্ধ কত্তে যে আমি চাই, প্রতিরোধের জন্য যে-কোনও সঙ্গত উপায়ের নির্দ্দেশ পেলে আমি যে সেই উপায়কে প্রাণপণ বলে অবলম্বন কর্ব্ব,—এই সঙ্কল্প নিয়ে আত্মাপরাধ বর্ণন সঙ্গত। অন্যায়ের জন্য যথার্থ অনুতাপ, অন্যায়কে বর্জ্জনের জন্য গভীরতম আবেগ এবং অন্যায়-বর্জ্জনের আবশ্যকীয় কর্ম্মপ্রণালীর উপর সুদৃঢ় শ্রদ্ধা নিয়ে কেউ যদি আত্মাপরাধ-বর্ণন করে, তবে সুফল হয়। অপরাধের জন্য অন্তরে লজ্জা থাকা চাই, কিন্তু বর্ণনে লজ্জা বর্জ্জন করা চাই। কারণ, অপরাধের কথা স্বীকার করার প্রকৃত মানে এই যে, কাল্‌কে আমি মূর্খ ছিলাম ব'লে বিনা দ্বিধায় যার অনুষ্ঠান করেছি, আজ আমি কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করেছি ব'লেই তাকে অন্যায় ব'লে বুঝ্‌তে পেরেছি।

অপরের অপরাধ-কাহিনী শুনিবার যোগ্য ব্যক্তি কে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে-কোনও আত্ম-সংশোধনেচ্ছু ব্যক্তি একজন নিরাপদ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নিকটে মনের ভার লঘু ক'রে দিয়ে আস্‌তে পারে, কিন্তু যে-কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিই অপরের অপরাধ-কাহিনী শ্রবণ কত্তে পারেন না। কারণ, শ্রদ্ধেয় তিনি যতই হউন, মানসিক উন্নতির এমন একটা উচ্চ স্তরে তাঁর যাওয়া চাই, যেখানে গেলে অপরের কুক্রিয়া-কলাপ শ্রবণের দ্বারা পরোক্ষভাবেও নিজের ভিতরের কোনও সুপ্ত পাপ-সংস্কারকে উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌বার সুযোগ দেওয়া হয় না, অথবা নূতন কোন পাপসংস্কারের ছবি চিত্ত-পটে অঙ্কিত হবার আনুকূল্য ঘটে না। এমন স্থিতধী ব্যক্তিই এসব শুন্‌বার যোগ্য অধিকারী। অস্ত্রচিকিৎসক রবারের দস্তানা প'রে নিয়ে নিজ শরীরকে সম্পূর্ণ সংস্পর্শবর্জ্জিত রেখে নির্ভয়ে পৃষ্ঠাঘাত-রোগীর ক্ষত মধ্যে হাত দিয়ে সব পূঁযরক্ত বের ক'রে দিয়ে রোগীকে নিরাময় করেন। ঠিক সেই রকম

যিনি নিজ মনকে সম্পূর্ণ সংস্পর্শ-রহিত রেখে অপরের মনের ঘা পরিষ্কৃত ক'রে দিতে পারেন, তার পক্ষেই এসব শোনা সাজে।

অপরের অপরাধ-কাহিনী শ্রবণে দুর্ব্বল ব্যক্তির ক্ষতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু এই বিষয়ে যোগ্য না হ'য়েও যাঁরা যোগ্যতার ভাণ করেন, আর নানা জনের মুখ থেকে তাদের জীবনের কদর্য্য-কাহিনী সমূহ শ্রবণ করেন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের পতন ঘটে। অপরের পাপ-কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে অজ্ঞাতসারে পাপের প্রতি চিত্তের লিপ্সা জন্মে এবং দুদিন পরে বা দশদিন পরে আচম্বিতে পাদস্খলন হয়। এজন্যই পারতপক্ষে তোমরা কেউ অপরের পাপ-কাহিনী শুন্‌তে যেও না।

চান্দলা গ্রামে শ্রীযুক্ত মোহিনী চক্রবর্ত্তী, ত্রিবেণী চক্রবর্ত্তী, ধীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দীনেশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ যুবকেরা একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। সমিতির উদ্দেশ্য নৈতিক ও ধার্ম্মিক। তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাদের সমিতির উৎসবে যোগদান করুন। শ্রীশ্রীবাবা রসুলপুর হইয়া সেখানে যাইবেন। অদ্য রসুলপুর থাকিবেন। চান্দলা হইতে ফিরিয়া আসিতে শ্রীশ্রীবাবার দিন তিন চারি দেরী হইতে পারে, সুতরাং তিনি স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য ফুলস্কেপ কাগজে কুড়িখানা সুদৃশ্য "মন্ত্রবাণী" লিখিয়া শ্রীমান্ উমাকান্তের হাতে দিয়া শ্রীমান্ জীবনকে নিয়া রওনা হইলেন।

ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাষ

পথ চলিতে চলিতে জীবনকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জীবন, আর বোধ হয় আমি বেশীদিন রহিমপুরে কর্ণি ধর্‌ব না।

জীবন জিজ্ঞাসা করিল,—কাজ কি ক'রে চল্‌বে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কাজ ত' প্রায় হ'য়ে এসেছে। মাত্র চালাখানা বাকী। কিন্তু আমার মনে হয়, রহিমপুর থেকে আমাকে অন্য দিকে যেতে হবে। কারণ, এখানকার mission (লক্ষ্য) আমার উদ্‌যাপিত হ'য়ে গেছে। ধনীর ছেলেরা কাজ কত্তে শিখেছে, অভিমান ত্যাগ করেছে, দুই একটী ছেলে কঠোর কর্ম্মীতে পরিণত হয়েছে, আশে পাশের গ্রামগুলিতে

গৃহে গৃহে অল্পাধিক নবভাবের সঞ্চারণা ঘটেছে, আর তোরাও আমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছিস্ যে ক্ষুধার্ত্ত জঠর নিয়ে মানুষ কত কঠোর শ্রম কত্তে পারে। স্বাবলম্বনেরর আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেছে। সুতরাং আমি মনে করি, আমার যাবার সময় হ'ল।

জীবন জিজ্ঞাসা করিল,—কবে যাবেন বাবা ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চেষ্টা ক'রে যাব না, সঙ্কল্প করেও যাব না, ঘটনার স্রোতে আমাকে টেনে নিয়ে যায় ত' যাবে।

শুধু শাসনে পাপ-প্রবৃত্তি দূরীভূত হয় না

এই সময়ে শ্রীশ্রীবাবা গুঞ্জরের পূর্ব্বদিকের মাঠগুলি পার হইতেছিলেন। দরিকান্দীর একটী লোক রসুলপুর বাজারের দিক হইতে ফিরিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাবাকে দেখিয়া তিনি থামিলেন ও প্রণামকরতঃ শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে সঙ্গে রসুলপুরের দিকেই কতকটা পথ ফিরিয়া চলিলেন।

তাঁহার কতকগুলি জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পাপ গুপ্ত-পথচারী। প্রকাশ্যভাবে জগতে আর কয়টী পাপ অনুষ্ঠিত হয় ? পাপে গর্ব্ব করে, এমন দুরাত্মাও জগতে আছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা কম। নৈশপাদসঞ্চারী অন্ধকার-বিহারী লোকলোচনে ধূলি-নিক্ষেপকারী সমাজ-বিধি-ভঙ্গকারীদের সংখ্যাই খুব বেশী। যদি কখনো ধরা প'ড়ে গেল, দশ টাকা জরিমাণা হ'ল বা দু'ঘা' জুতো খেল বা এক মাস ঘানী টেনে এল। এতে এদের প্রকৃত শাসন হয় না, কারণ এতে চরিত্র-সংশোধন হয় না। পাপের মূল ভিতরেই থেকে যায়, শাস্তি দিয়ে গাছের কাণ্ড কেটে ফেল্‌লেও গোড়া থেকে আবার নূতন নূতন ফেঁকড়ী বেরুতে সুরু করে।

লোভ ও যৌন-তাড়না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলের পক্ষেই এ কথা সত্য। স্ত্রীলোকেরা ভালো আর পুরুষেরা মন্দ, কি পুরুষেরা ভালো আর স্ত্রীলোকেরা মন্দ, এমন কোনো কথা হ'তে পারে না। সকলেই সমান ভাল আর সমান মন্দ। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে সমাজ-বিধির পার্থক্যহেতু কোথাও

স্ত্রীলোকের পাপ-প্রবৃত্তি একটু বেশী প্রশ্রয় পায়, কোথাও পুরুষের পাপ-প্রবৃত্তি একটু বেশী প্রবল হয়। কিন্তু মূলতঃ কথা একই। লোভ আর যৌন-তাড়না সকল সমাজে প্রত্যেক নর-নারীর ভিতরে অপরাধ-প্রবণতা সৃষ্টি কচ্ছে। সকল সমাজ-বিধি এই দুটীকেই শাসিত বা সংযমিত কর্ব্বার জন্য হয়েছে। কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট নয়। শাসনে গুপ্ত প্রবৃত্তি সুপ্ত হ'য়ে থাকৃতে পারে, কিন্তু লুপ্তও হয় না, দেবভাবে রূপান্তরিতও হয় না।

পাপের আভ্যন্তর চিকিৎসা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই জন্যই আমি গুপ্ত, সুপ্ত ও অজাত কিন্তু সম্ভাব্য সব পাপ-প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করার পক্ষপাতী,—আভ্যন্তর চিকিৎসা দিয়ে। যীশু,বুদ্ধ, শঙ্কর তাই কত্তে চেয়েছেন। ভগবৎ-সাধনার অমৃত-লহরী প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিয়ে পাপবুদ্ধির, পাপোন্মুখতার, পাপ-প্রবণতার মুখ ফিরিয়ে দিতে হবে। সমাজ-শাসন থাকুক, বাহ্য মুষ্টিযোগ আবশ্যকমত চলুক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের গ্লানি দূর ক'রে দেওয়ার সুব্যবস্থাও হোক্। লোভকে আত্মোৎসর্গে, কামকে প্রেমে, ইন্দ্রিয়তাড়নাকে উদ্দাম কর্ম্মোৎসাহে, আসক্তিকে পরহিত-বুদ্ধিতে আর লোলুপতাকে অটল বৈরাগ্যে রূপান্তরিত ক'রে দেওয়ার পন্থাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এতে একটী পাপীর সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভুবনের হিতসাধন হয়।

রসুলপুর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র সিংহের ভবনে উপনীত হইতেই বহু ভক্তসজ্জন চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া সমাগত হইলেন। আঙ্গিনার মধ্যে সাত আটখানা শীতলপাটি বিছাইয়া দেওয়া হইল। কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দে একজন ভগবদ্‌ভক্ত ব্যক্তি। তিনি নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীবাবা হাস্য-মুখে সকল প্রশ্নের সুবিস্তারিত জবাব দিতে থাকিলেন।

সম্প্রদায়-সৃষ্টির রহস্য

সম্প্রদায়ের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এক একজন মহাপুরুষ যেন এক একটী নমুনা। এই নমুনার ছোট-বড় আরো শত শত ব্যক্তি ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হ'য়ে আছেন। একজন সাধন-বলে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ালে

চতুর্দ্দিক হ'তে এক নমুনার সব সাধক এসে একত্র জড় হলেন, কে বড়, কে ছোট এ সবের চুলচেরা বিচার পদদলিত ক'রে আপনা আপনি যাঁদের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠা হ'য়ে গেল, নির্ব্বিবাদে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব মান্য ক'রে, প্রেমিক মন নিয়ে নিজ নিজ সাধনোৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণে সবাই ব্রতী হলেন। জগতে সম্প্রদায় সৃষ্টির এইটুকুই রহস্য।

সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিমুখিনী পারস্পরিক সহযোগিতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু এক নমুনার সব লোক এক সাথে এসে জড় হলেন কেন? কারণ, গাঁজাখোর যেমন একাকী কল্কীতে টান-দিতে পারে না, সঙ্গী দু'একজন চাই, ভগবৎ-প্রেমরসের যিনি মাদকী, তাঁরও সঙ্গীছাড়া যেন আনন্দ জমে না। আনন্দ জমাবার জন্যই তিনি সঙ্গী খোঁজেন। আবার, আমি যখন নিরুৎসাহ, তুমি তখন তোমার সাধনানুরাগ আর প্রেম দিয়ে পথ চল্‌তে আমাকে উৎসাহ দেবে। তুমি যখন নিরুৎসাহ, তখন আমি আমার বিশ্বাস ও নিষ্ঠার দৃষ্টান্তে তোমাকে উৎসাহিত কর্ব্ব। তোমার অভিজ্ঞতা আমাকে, আমার অভিজ্ঞতা তোমাকে উন্নত ও উপকৃত কর্ব্বে। এটাও কম কথা নয়। এটাই প্রকৃত প্রস্তাবে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার সার্থকতার দিক্।

সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপক ভাব-প্রচার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আরো একটা দিক আছে। জগতের সব লোক তোমার নমুনার নয়। তোমার রুচি, তোমার প্রকৃতি সকলের হ'তে পারে না। কিন্তু শতকরা তেত্রিশ জন লোকেরই মাত্র রুচি-প্রকৃতি বদ্ধমূল থাকে। শতকরা তেত্রিশ জনের রুচি-প্রকৃতির কোনও একটা দৃঢ়তা না থাকলেও মোটামুটি ধাত থাকে। কিন্তু শতকরা তেত্রিশ জন থাকে এমন, যাদের নিজস্ব কোনও রুচি-প্রকৃতিই নেই, যে যেদিকে টানে তারা সেই দিকেই চলে, ভাল দিকে টান্‌লে ভাল পথেই চলে, মন্দ দিকে টান্‌লে মন্দ পথেই চলে। মাত্র শতকরা একজন লোক থাকে, যার রুচি-প্রকৃতি দুর্ব্বোধ্য। সমভাবের ভাবুক কতকগুলি লোক এসে দৃঢ়-সংবদ্ধভাবে মিলিত হ'লে সামান্য চেষ্টায় নিজস্বতাহীন লোকগুলিকে অতি

সহজে সৎপথে টেনে আন্‌তে পারে। একটু প্রবল চেষ্টা করলে এক রকমের নিজস্বতা যাদের জন্মে গেছে, তাদেরও মন্দ সংস্কার গুলি দূর ক'রে সৎসংস্কারের প্রাবল্য ঘটিয়ে দিতে পারে। একটী সুসংবদ্ধ সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়ে এইভাবে শতকরা ছেষট্টি জন লোকের অল্পাধিক হিতসাধন করা যেতে পারে,—যা একা কারো চেষ্টায় বহুব্যাপকভাবে করা সুদূর-পরাহত। এটাও সম্প্রদায়াদি প্রতিষ্ঠার সার্থকতার আর একটী দিক্।

কিরূপ সম্প্রদায়ের বাঁচিবার অধিকার নাই

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু ভ্রান্ত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বা ভ্রান্ত নেতৃত্বে পরিচালিত বা ভ্রান্ত ধারণায় প্ররোচিত সম্প্রদায় জগতের হিত না ক'রে অহিতই করে। আজকালকার যুগ এবং এই যুগের দাবী এই দুইটী জিনিষের দিকে তাকিয়ে যদি বিচার কর, তাহ'লে নিশ্চিতই তোমাকে এই মত পোষণ কত্তে হবে যে, যে সম্প্রদায় কতকগুলি ভীরু, দুর্ব্বল, কাপুরুষকে সৃষ্টি করে, তার বেঁচে থাক্‌বার অধিকার নেই। যে সম্প্রদায় কতকগুলি অলস, পরান্নজীবী, ভিক্ষালোলুপ পরগাছার সৃষ্টি করে, তার বেঁচে থাক্‌বার অধিকার নেই। যে সম্প্রদায় কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানহীন ধর্ম্মান্ধ মূর্খের সৃষ্টি করে, তার বেঁচে থাকবার অধিকার নেই। যে সম্প্রদায় অসহিষ্ণু, পরধর্ম্মদ্বেষী, পরপীড়ক বর্ব্বরের জন্মদান করে, তার বেঁচে থাকবার অধিকার নেই। যে সম্প্রদায় পরদারলোলুপ, পরস্বাপহারী, পরানিষ্টকারী নরপশুদের জন্মদান করে, তার বেঁচে থাকবার অধিকার নেই।

সম্প্রদায়-বুদ্ধি থাকা উচিত নয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সম্প্রদায়ের সুফলের কথা ত' একটু আগেই বলেছি। কিন্তু সম্প্রদায়-বোধের কুফল আছে। আমি সাধন-রুচি বাড়াবার জন্য সম্প্রদায়ী হ'তে পারি, কিন্তু সম্প্রদায়-বোধের প্রশ্রয় দিয়ে আমি জগদ্বিদ্বেষী হব যে! শাক্তকে বিদ্বেষ কর্ব্ব, ব্রাহ্মকে নিন্দা কর্ব্ব, খ্রীষ্টানকে গাল দিব, মুসলমানকে ঘৃণা কর্ব্ব। এজন্যই সম্প্রদায়-বোধ অতীব মন্দ জিনিষ। সম্প্রদায় গঠনের আবশ্যকতা জগৎ থেকে কখনই লুপ্ত হবে না,

কিন্তু সম্প্রদায়-বোধকে নির্ব্বাসিত কত্তে হবে। একই দালানে একটী সমগ্র পরিবার বাস করে। বেড়াতে এসেছে মেয়ে আর জামাই, তাদের জন্য একটী কক্ষ থাকে। বাড়ীতে আছে ছেলেরা আর বউরা, তাদের প্রত্যেক দম্পতীর জন্য এক একটী পৃথক্ পথক্ কক্ষ থাকে। বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নীর আবার আর একটা কক্ষ থাকে। সবগুলি কক্ষেরই পরস্পরের মধ্যে দেয়ালের ব্যবধান, যেন, একটী কক্ষের বিশ্রব্ধ প্রেমালাপ, অন্য কক্ষের লোক টের না পায়। কিন্তু প্রত্যেক কক্ষের অধিবাসীদেরই সকলের সঙ্গে সকলের একটা যোগসূত্র রয়েছে। সাধারণের প্রয়োজনের বেলায় সকলেই এক আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ায়, সেই পথ অবরুদ্ধ হ'য়ে থাকেনি। প্রত্যেকটী সাধারণ (common) প্রয়োজনে তারা এক। মাত্র বিশ্রব্ধ বিশ্রামের কালে যার যার নিজ কক্ষের অভ্যন্তরে অবস্থান। প্রকোষ্ঠ থাকবে, কিন্তু প্রকোষ্ঠবোধ থাক্‌বে না, সম্প্রদায থাক্‌বে, কিন্তু সম্প্রদায়বোধ থাক্‌বে না।

পতিতোদ্ধার-ব্রত গ্রহণের প্রাক্কালে চিন্তনীয়

প্রসন্ন কবিরাজ মহাশয়ের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নীচ, নিকৃষ্ট, অপাংক্তেয় ব'লে যে সব জাতির লোকদের আমরা ঘৃণা করি, সত্যি কি তারা নীচ? যদি তারা নীচই হ'য়ে থাকে, তবে কেন তারা নীচ? যে সকল কারণে তারা নীচ, সেই সকল কারণ কি দূর করা যায় না? যদি যায়, তাহ'লে তার উপায় কি কি? সেই সব উপায়ের মধ্যে কোন্‌গুলি অবলম্বন করা তথাকথিত অ-নীচদের পক্ষে সম্ভব? যেগুলি অবলম্বন করা সম্ভব, তা এতদিন অবলম্বন করা হয়নি কেন এবং কিভাবে অবিলম্বে অবলম্বন করা যায়? অবলম্বন করার বাধা কি কি এবং সেই সব বাধা বিদূরণের জন্য কোন্ শ্রেষ্ঠ কর্ম্মকৌশল অবলম্বনীয়? পতিতোদ্ধার-ব্রত গ্রহণের প্রাক্কালে এই কথাগুলি ভাল ক'রে চিন্তা ক'রে নেওয়া উচিত।

পতিতোদ্ধার-ব্রত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তনীয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যারা তথাকথিত নীচ, তারা চিরকালই কি এই রকম নীচ ছিল? যদি তা না হ'য়ে থাকে, তবে কেমন ক'রে ধাপে ধাপে

নীচের দিকে এসেছে, কেমন ক'রেই বা ধাপে ধাপে উপরের দিকে এগুতে পারে? যদি চিরকালই তারা নীচ অন্ত্যজ থেকে থাকে, তবে কেমন ক'রেই বা উপরের দিকে উঠ্‌বে? এদের ভিতরে নীচত্ব পরিহারের কোনও দ্বিধা-হীন সঙ্কল্প জেগেছে কি? না জেগে থাক্‌লে কেমন ক'রে তা এ সব তথা-কথিত নীচ শ্রেণীগুলির ভিতরে সর্ব্বব্যাপকভাবে জাগান যায়? সেই জাগ্রত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে দেশের সর্ব্ব-সমাজের লোকের এবং সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকের স্বল্পতম ক্ষতির ভিতর দিয়ে কি ক'রে সার্থক করা যায়? পতিতোদ্ধার-ব্রত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলি ভাল ক'রে ভেবে দেখা কর্ত্তব্য।

পতিতোদ্ধারের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক্

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নীচ, পতিত জাতিগুলির অভ্যুদয় সাধনের জন্য বহু কর্ম্মপন্থা হ'তে পারে। অনেক দিক দিয়ে তাদের উপকার সাধন করা যেতে পারে। কিন্তু যাতে অন্য দিক্ দিয়ে উন্নত হবার পূর্ব্বেই তারা আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়ে ব্রাহ্মণাদির সমকক্ষ হ'তে পারে, তার জন্য সর্ব্বাগ্রে নির্ব্বিচারে গায়ত্রী ও ওঙ্কারে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিতে হবে। আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও শিক্ষানীতিক অভ্যুদয় সাধনের চেষ্টার সাথে সাথে বা আগে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অভ্যুদয় সাধনের চেষ্টা কত্তে হবে। গায়ত্র্যাদির সাথে সাথে নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা কত্তে হবে।

আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা পাশাপাশি চলে। একটীর উন্নতি অপরটীর উন্নতিতে সহায়তা কর্ব্বেই। একটীর অবনতিও অপরটীর অবনতিকে সহায়তা কর্ব্বে।

নাস্তিকের প্রতি আস্তিকের ব্যবহার

অতঃপর নাস্তিকতার কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনেকে নাস্তিক হয়, অনেকে নিজেরা নাস্তিক না হ'য়েও নাস্তিকতার সমর্থন করে। এজন্য এদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়। বিচার ক'রে দেখা উচিত যে, এরা কেন নাস্তিক হ'ল,

অথবা কেন নাস্তিকতার সমর্থন কচ্ছে। সেই কারণটীকে খুঁজে পেলেই বিদ্বেষের সম্ভাবনা ক'মে যায়। আর, বিদ্বেষ ক'রেও লাভ নেই। যে যাকে বিদ্বেষ করে, সে প্রকারান্তরে তাকে ধ্যান করে,—অনুকূল মনে না ক'রে প্রতিকূল মনে ধ্যান করে। ধ্যান যার কর্ম্মে কতকটা হ'লেও তুমি তার মত হবেই। ভগবৎ-সাধনেচ্ছু ব্যক্তি যারা, তাদের পক্ষে নাস্তিকের সঙ্গত্যাগ সঙ্গত। নইলে, সাধনের রুচি ক'মে যাবে, শুষ্কতা ও অবিশ্বাস বাড়বে এবং দ্বিধাপীড়িত আধ্যাত্মিক শ্রমের বেশীর ভাগটাই পণ্ডশ্রম হবে। কিন্তু বাইরের সঙ্গ ত্যাগ করাই কি যথেষ্ট? মনে মনে তাকে বিদ্বেষ ক'রে যে সঙ্গ করা হয়, তাও কি বর্জ্জনীয় নয়? প্রকৃত আস্তিক যারা, নাস্তিকদের প্রতি তাদের ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকা অস্বাভাবিক। নাস্তিকদের প্রতিও তাদের প্রেমই থাকবে। কারণ, বৈচিত্র্যময় ভগবানের সৃষ্টির ভিতরে যদি নাস্তিকেরা না থাকতেন, তাহ'লে ত' ভগবানের সৃষ্টির বৈচিত্র্য ক'মে যেত। তাঁর সৃষ্টির মাঝে যেখানে যে বস্তু আছে, উজ্জ্বলই হোক আর তমসাবৃতই হোক, সবই যে তাঁর।

নাস্তিক্যের প্রকার-ভেদ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একদল লোক আছেন, যাঁরা যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে দিয়ে কোনও প্রকারেই ভগবানের অস্তিত্বকে সিদ্ধ কত্তে পারেন নি। এঁরা প্রমাণ-নিষ্ঠ নাস্তিক। আর এক দল লোক আছেন, যাঁরা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন ক'রেও তাঁকে প্রত্যক্ষ কত্তে পারেন নি। এঁরা প্রত্যক্ষ-নিষ্ঠ নাস্তিক। আর একদল লোক আছেন, যাঁরা পৃথিবীতে একজন সাধককে দেখেও ভগবদ্দর্শী পুরুষ ব'লে জ্ঞান কত্তে পারেন নি। এঁরা অনুমান-নিষ্ঠ নাস্তিক। একদল লোক আছেন, যাঁরা প্রভাব-সম্পন্ন কোনও যুক্তিবাদী ব্যক্তির মুখ থেকে নানা যুক্তি শ্রবণ ক'রে মেনে নিয়েছেন যে, ভগবান নেই। এঁরা আপ্ত-নিষ্ঠ নাস্তিক। একদল লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন যে, ভগবানকে মানা থেকেই জগতের যত ধর্ম্মমতের উদ্ভব হয়েছে এবং ধর্ম্মমতকে প্রচার ক'রে একদল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অপরদল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি-

দের উপরে প্রভুত্ব সৃষ্টি ক'রে তার সুযোগ নিয়ে জগতের যত দরিদ্রকে শোষণ কচ্ছে, সুতরাং ভগবান মানা উচিত নয়। এঁরা দরিদ্র-নিষ্ঠ নাস্তিক। একদল লোক আছেন, যাঁরা কোনো আস্তিক্য-খ্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তিগত কারণে অসন্তুষ্ট, সুতরাং তাঁর উপরে ঝাল মিটাতে না পে'রে তাঁর উপাস্য ভগবানের উপর ঝাল ঝাড়্লেন। যেমন ঝগড়াটে পত্নীরা স্বামীর উপরে রাগ ক'রে ঘরের বিড়ালকে মারে। এঁরা অভিমানী নাস্তিক। একদল লোক আছেন, যাঁরা ভগবানের কাছে বারংবার নানা অনুগ্রহ চেয়ে চেয়ে পান নি, তাই এসে নাস্তিকের দল পূর্ণ কর্লেন। যেমন শুনা যায়, কেউ কেউ সরকারী চাকুরী না পেয়ে রাজদ্রোহী দলে ঢোকেন। এঁরাও ঐ অভিমানী নাস্তিকেরই দলে পড়েন। আর একদল লোক আছেন, যাঁদের পক্ষে ঈশ্বর মান্তে গেলে স্বেচ্ছাচারে বাধা জন্মে, বেপরোয়া ব্যভিচারের পথে কাঁটা পড়ে, তাই তাঁরা নাস্তিক। এঁরা সুবিধাবাদী নাস্তিক। এই রকম ক'রে জগতের কত জন কত কারণে নাস্তিক হয়, তার কি কোনো কূল-কিনারা আছে?

ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু মজা এই, ঈশ্বর নেই, এই কথাটাই প্রমাণ করা আবশ্যক হয়; ঈশ্বর আছেন, একথা কোনও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ঈশ্বর আছেন, এটা যেন স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। মানবের সৃষ্টি যেই দিন, তাঁর ঈশ্বর-মানার সৃষ্টিও সেই দিন। বন্য বর্ব্বরের সমাজে যাও, যারা ঋগ্‌বেদের ছায়াও দেখে নি, কোরাণ দেখে নি, বাইবেল দেখে নি, জেন্দাবেস্তা দেখে নি, সপ্তর্ষি বা ঈশা-মূসার নামও শোনে নি, তারাও তাদের অসংস্কৃত ভঙ্গীতে পরম-দেবতার উদ্দেশ্যে একটী ক'রে নতি জানাচ্ছে। সভ্যতার যেখানে বিকাশ ঘটে নি, সেখানেও ঈশ্বর-বোধের বিকাশ ঘটেছে। জগতের সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থ কুড়িয়ে কাঁচিয়ে এনে সমুদ্রে ফেলে দাও, সকল ধর্ম্মমন্দির অগ্নিতে দগ্ধ কর, সকল আস্তিকদিগকে জ্যান্ত কবর দাও, তারপরে দু-হাজার বছর ধারাবাহিক ভাবে বাধ্যকর শিক্ষা-প্রণালীর ভিতর দিয়ে বালক-বালিকাদিগকে নাস্তিক্যবাদ শিক্ষা দাও, তারপরেও দেখ্‌বে, আবার ধর্ম্মমতের অভ্যুদয় হচ্ছে, ধর্ম্মপ্রচারকের

আবির্ভাব হচ্ছে, ধর্ম্মগ্রন্থ সম্পাদিত হচ্ছে, ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হচ্ছে, সমুদ্রের জল, অগ্নির শিখা, জীবন্ত সমাধি শেষ পর্য্যন্ত নিষ্ফল হ'য়ে গিয়েছে। কারণ, ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ, তিনি প্রমাণ-সিদ্ধ নন। স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর ধ্বংস নেই।

অতঃপর সাধন-ভজন সম্পর্কিত বহুবিধ আলোচনার পরে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী নৈশ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলে পর শ্রীশ্রীবাবা বিশ্রাম করিলেন।

রসুলপুর
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মিস্ত্রী এখানকার একজন খ্যাতিমান রামায়ণ-গায়ক। তিনি আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্মে তাঁহার কতকগুলি ব্যথার কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন।

গ্রাম্য গোস্বামীদের উৎপাত

শ্রীযুক্ত হৃদয় মিস্ত্রী বলিলেন,—গ্রাম্য গোস্বামীদের জ্বালায় ধর্ম্ম নিয়ে জীব বড় ভীষণ সমস্যায় পড়েছে। গ্রামের সব অশিক্ষিত মূর্খ লোক চিরাচরিত সংস্কারের বশে প্রথানুযায়ী শিবমন্ত্র গ্রহণ ক'রে বেশ তিনবেলা নামজপ কচ্ছিল। লরিদাস বৈরাগী এসে বল্‌তে লাগ্‌ল,—কৃষ্ণমন্ত্র না নিলে আর জীবের উদ্ধার নেই। ধারাবাহিক প্রচার চল্ল,—শিবমন্ত্রীরা যে পরম ধাম পায় না, শিব নিজেই যে কৃষ্ণের পায়ের ক্রীতদাস, শিবমন্ত্রীদের পুনর্জ্জন্ম হয়—কৃষ্ণমন্ত্রীর হয় না। এই সব কথা দিনের পর দিন পল্লীবালাদের কাণের কাছে ঘোষিত হ'তে লাগ্‌ল। দু-একটী পরলোক-চিন্তিতা বিধবার প্রাণে এ কথা লাগ্‌ল। তারা শিবমন্ত্র ফেলে ভবিষ্যতের বড় আশায় কৃষ্ণমন্ত্র নিতে লাগ্‌ল। ক্রমে ক্রমে তাদের আত্মীয় আত্মীয়ারাও তাদের পদাঙ্কানুসরণ কত্তে লাগ্‌ল। এদের ক্রমিক দলবৃদ্ধি দেখে এক শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যার ভিতরে কিছু মহিমা আছে জ্ঞান ক'রে তাদের দলপুষ্টি কত্তে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সমস্ত গ্রাম থেকে শিবমন্ত্রের উচ্ছেদ হ'য়ে গেল, মাত্র একটী লোক শিবমন্ত্র ছাড়্‌লে না। কিন্তু চতুর্দ্দিকে সবাই একরকম কচ্ছে দেখে, তার মনেও সংশয় এল।

সে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্ল্ল যে, কি করা কর্ত্তব্য। আমি হেসে বল্লাম,— "লরিদাস বৈরাগীকে গুরু বলে মানার চেয়ে, কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী শ্মশানবাসী প্রকৃত বিরাগী শিবঠাকুরকেই গুরু মানা ভাল। তুলনা কল্লে লরিদাস বৈরাগীর চেয়ে শিবঠাকুর একেবারে নিকৃষ্ট ব্যক্তিটী হবেন না। অবিরাম তাঁর নামই জপো। তিনি নিজে এসে যদি কোনোদিন শিবমন্ত্র ছেড়ে কৃষ্ণমন্ত্র জপ্‌তে বলেন, তখন শিবমন্ত্র ছেড়ো। এখন তুমি লরিদাস বৈরাগীর তালে প'ড়ে আসল মাল ছেড়ে দিয়ো না।"

নিষ্ঠার শক্তি

সকলেই বিশেষ কৌতূহলের সহিত এই কাহিনী শুনিতে লাগিলেন। একজন প্রশ্ন করিলেন,—তারপর ?

শ্রীযুক্ত হৃদয় মিস্ত্রী বলিলেন,—তারপরে সেই ব্যক্তি গভীর নিষ্ঠার সাথে তার গুরুদত্ত শিবমন্ত্রই জপে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই ব্যক্তি যদি চতুর্দ্দিকের কারো পানে না তাকিয়ে নিবিড় নিষ্ঠায় শিবমন্ত্রই জ'পে যান এবং একনিষ্ঠ সাধনের যা ফল, সেই প্রেম ও আনন্দ লাভ করেন, তাহ'লে দেখ্‌বে, আবার শত শত লোক কৃষ্ণমন্ত্র ত্যাগ ক'রে শিবমন্ত্রই গ্রহণ কচ্ছে। কারণ, মন্ত্রের ভিতরে মহত্ত্ব যত, তার নিরূপক হচ্ছে সাধকের সাধন-নিষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত হৃদয় মিস্ত্রী বলিলেন,—বাস্তবিকই তাই। এই লোকটীর শিবমন্ত্রে নিষ্ঠা দেখে এখন আবার কতকগুলি লোক বলাবলি সুরু করেছে যে, আগের পাওয়া শিবমন্ত্রই বোধ হয় ভাল ছিল।

কোন্ মন্ত্র শ্রেষ্ঠ ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতের মহাদুর্ভাগ্য, মন্ত্র নিয়ে ব্যবসায় চলেছে। মন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার কত্তে যাওয়ার মত আর ভুল কি কিছু আছে ? কোন্ মন্ত্র কোন্ মন্ত্রের চাইতে শ্রেষ্ঠ ? যে মন্ত্রে যে মন্ত্রের চাইতে গভীরতর নিষ্ঠা অর্পিত হয়েছে। নিষ্ঠা সাধনের প্রাণ, মন্ত্র অবলম্বন, আর সর্ব্ব মন্ত্রের প্রাণ-স্বরূপ অখণ্ডনাদকে মন্ত্রের ভিতরে উপলব্ধি করাই সাধনের প্রকৃত সূচনা।

আমার মন্ত্র ভাল, তোমার মন্ত্র মন্দ,—এ সব কথার কি কোনও মানে আছে? একদল মেছুনী নিজের মাছ খরিদ্দারকে গছিয়ে দেবার জন্যে যেমন বলে,— "ওর মাছ নেবেন না, ওটা পচা মাছ," "তার মাছ নেবেন না, সেটার পেটে ডিম হয়ে গেছে,"—ঠিক যেন তেমনি ব্যাপার হয়েছে। অথচ ভদ্রলোকেরা নিজের মন্ত্রটীও হয়ত দু-একবার চেখে দেখেন নি। বড় দুর্ভাগ্য! বড় দুর্ভাগ্য!

ভগবানের সব নাম সত্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য লোকের মন্ত্রভেদ-বুদ্ধি যারা জন্মায়, তাদের কি ব্যাধ বলব, না প্রবঞ্চক বলব, না মূর্খ বলব? আমি এদের যোগ্য উপাধি খুঁজে পাচ্ছি না। প্রকৃত প্রস্তাবে ওঙ্কার হ'চ্ছেন সকল মন্ত্রের রাজা। সর্ব্বমন্ত্র এইখানেতে নিয়েই সাধককে পৌঁছে দেন। সুতরাং কোনো মন্ত্রই ভ্রান্ত হ'তে পারে না। তারা ভাগ্যবান, যারা গোড়া থেকেই প্রণব দিয়ে সাধন সুরু করে, কিন্তু যারা গুরুর কাছে অন্য মন্ত্র পেয়েছে, নিজ মন্ত্র পরিত্যাগ ক'রে অন্য মন্ত্র গ্রহণ কত্তে তাদের প্ররোচিত করা অত্যন্ত অন্যায়। সাধন-জীবনে শিবির পরিবর্ত্তন বড়ই বিপজ্জনক ব্যাপার। অবশ্য ব্যতিক্রম-স্থলও আছে, কিন্তু জগতে ব্যতিক্রমের সংখ্যা অত্যল্প। ভগবানের সব নাম সত্য, ভগবানের কোনো নাম মিথ্যা নয়। নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হও, সাফল্য অবধারিত, লক্ষ্য লাভ সুনিশ্চিত।

শিক্ষাগুরু ও নিষ্ঠা

শ্রীযুক্ত হৃদয় মিস্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন,—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ব্যাপারটী কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরুবাদ বহুরূপী। কত দেশে কত সম্প্রদায়ে যে তার কত রকমের রূপ, তার ইয়ত্তা নেই। জগতের যত জন শিক্ষা প্রদান করেন, সকলেই শিক্ষাগুরু। কিন্তু শিক্ষাগুরু হ'তে হলেই কাণে আবার একটী মন্ত্র ঠুকে দিতে হবে, এমন শিক্ষাগুরু আমরা মানি না। নিষ্ঠাই হচ্ছে সাধনের প্রাণ। বহু মন্ত্রে নিষ্ঠাহানি হয়। অনেক গুরু বহু মন্ত্র দিয়ে শিষ্যের

জীবনকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-পীড়িত, সংশয়-সমাচ্ছন্ন ও বহু-ইষ্ট-নিরত করে তোলেন। যাতে নিষ্ঠার চ্যুতি ঘটে, তাই সাধকের বর্জ্জনীয়। একই গুরু যদি তিনটী মন্ত্র দেন, তবে তাতেও নিষ্ঠাহানি ঘটে। যাঁরা জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁরা নিষ্ঠার বিঘ্ন কমিয়ে দেবেন। একই রমণীর যদি তিনটী স্বামী থাকে, তবে তার প্রাণান্ত হবার কথা। একটী পুরুষ তিনটী বিবাহ ক'রে কখনো শান্তিতে ঘরকন্না কত্তে পারে না। সাংসারিক জীবনেই যখন নিষ্ঠার প্রয়োজন এত অধিক, তখন ভেবে দেখ দেখি, আধ্যাত্মিক জীবনে আরো কতগুণ অধিক প্রয়োজন ? স্ত্রীলোকের যেমন একটা সতীত্ব আছে, সাধকেরও তেমন একটা সতীত্ব আছে। হনুমান যেমন বলেছিলেন,—"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি, তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামো রাজীবলোচনঃ।"

বেলা দেড়টার সময়ে চান্দলার যুবকেরা শ্রীশ্রীবাবাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। কিন্তু বেলা বারোটার সময় হইতেই শ্রীশ্রীবাবার শরীরে প্রবল জ্বর-লক্ষণ দেখা দিল। গতকল্য রহিমপুরের কঠোর পরিশ্রমান্তে রসুল-পুর আসিবার পথেই শ্রীশ্রীবাবা শ্রীমান জীবনকে বলিতেছিলেন যে, শরীরটা যেন জ্বর-জ্বর বোধ হইতেছে। আজ অত্যন্ত প্রবল জ্বরাক্রমণ হেতু চান্দলার যুবকদিগকে শ্রীশ্রীবাবা ফিরাইয়া দিলেন।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৯

চান্দলার যুবকেরা অদ্য পুনরায় আসিয়াছেন। তাঁহাদের জিদ্ শ্রীশ্রীবাবা রুগ্ন হউন, সুস্থ হউন, তাঁহাকে নিয়া যাইতেই হইবে। গ্রামে পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রম আছে। যদিও চান্দলা গ্রাম অত্যন্ত বড়, তবুও উহার কর্ত্তারা নাকি একই গ্রামে দুইটী প্রতিষ্ঠান থাকিতে দিবেন না। এই জাতীয় আরও অনেক অপ্রীতিকর কথা শুনা গেল। থার্ম্মোমিটার দিয়া দেখা গেল, জ্বর ১০০° ডিগ্রীতে উঠিয়াছে। দ্বিপ্রহরে রওনা হইয়া কতক নৌকাপথে, কতক পাল্কীযোগে শ্রীশ্রীবাবা অপরাহ্নে সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময়ে চান্দলা আসিয়া পৌঁছিলেন।

চান্দলার সেবাপরায়ণতা

চান্দলা পৌঁছিয়াই শ্রীশ্রীবাবা সামান্য একটু বার্লি পান করিলেন। অপরাহ্নের দিকে জ্বরটা কমিয়া আসিয়াছিল। রাত্রে পুনরায় জ্বর বাড়িতে লাগিল। শ্রীযুক্ত মোহিনী-ত্রিবেণীর মাতা পূজনীয়া শ্রীযুক্তা ষোড়শী দেবী সাক্ষাৎ জগজ্জননীর ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন। পল্লীর যুবকেরা গ্রাম্য রাস্তার জটিলতা তুচ্ছ করিয়া সমগ্র রজনী ব্যাপিয়া দূরবর্ত্তী নলকূপ হইতে সুশীতল জল আনিয়া মাথায় ঢালিতে লাগিলেন।

চান্দলা

৫ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ

পাঁচই জ্যৈষ্ঠ চান্দলার "মাতৃমন্দির" সমিতির উৎসব। কিন্তু যাঁহার শ্রীচরণ-দর্শন-পিয়াসী হইয়া সহস্র সহস্র লোক চান্দলা গ্রামে ছুটিয়া আসিয়াছেন, জ্বরে তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহ সংজ্ঞাহীন। কিন্তু মঙ্গলময়ের কৃপায় শত বাধা, শত বিঘ্ন, শত বিরুদ্ধ প্রচার ও বিরুদ্ধ প্রয়াস তুচ্ছ করিয়া উৎসব সুসম্পাদিত হইল। সভা, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি প্রত্যেকটী কার্য্য নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হইল। অভিভাবকস্থানীয় যাঁহারা এই পুণ্য উৎসবের বিরোধিতা করিতেছিলেন, তাঁহাদের বাড়ীর ছেলেরাই আসিয়া উৎসবের প্রত্যেক কার্য্যে সহযোগিতা প্রদান করিয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা বিধান করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তাহার "স্বামীজীর পত্র" * নামক এক গ্রন্থে এক সময়ে লিখিয়াছিলেন,— "তোমার দেশপ্রেম যদি অকৃত্রিম হইয়া থাকে, * * * ভূতে আসিয়া তোমার কাজ করিয়া দিয়া যাইবে * * * অলসের পাল তোমার জন্য বেগার খাটিবে"। এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। দূরদূরান্তর হইতে পরিচিত অপরিচিত কত যুবক যে আসিয়া খাটিয়া গেলেন, তাহা দেখিয়া অবিশ্বাসীরাও অবাক্ হইলেন।

৬, ৭, ৮, ৯ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত অতি প্রবল জ্বর চলিতে লাগিল। এদিকে এবার চান্দলায় এক অতি ভয়ঙ্কর জ্বররোগ মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে,

* এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণ "কর্ম্মভেরী" নামে শীঘ্রই পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

পনের বিশ দিনের মধ্যে গ্রামের প্রায় দ্বিশতাধিক লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সুতরাং সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। রহিমপুর আশ্রমের ব্রহ্মচারীরা এবং রহিমপুর গ্রামের বহু যুবক উদ্বিগ্ন হইয়া চান্দলা চলিয়া আসিয়াছেন। আন্দিকূটের ভক্তিপ্রাণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সাহা পাঁচ ছয়টী জরুরী রোগী ফেলিয়া শ্রীশ্রীবাবার চিকিৎসার্থ ছুটিয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুক্তা ষোড়শী দেবী ও গ্রামের যুবকগণ অপূর্ব্ব শুশ্রূষা করিতেছেন।

চান্দলা গ্রামের "শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ" নামে একটী লোক-সেবা-প্রতিষ্ঠান আছে। তাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীবাবাকে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়া গিয়া একটী অভিনন্দন দিবেন। অভিনন্দন-পত্র তাঁহারা ইতোমধ্যে মুদ্রিতও করিয়া ফেলিয়াছিলেন। গ্রাম-জ্যেষ্ঠগণ ও সহরবাসী প্রবাসী উকিল মোক্তারগণ এই সঙ্ঘের সভ্য। তাঁহারাও এই উপলক্ষে বাড়ী আসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবার প্রচণ্ড জ্বরের দরুণ শেষে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শ্রীশ্রীবাবার নিকটে আসিয়াই রোগ-শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অভিনন্দন পাঠ করিবেন। কার্য্যতঃ হইলও তাহাই। অভিনন্দন পাঠের পরে, শ্রীশ্রীবাবা প্রবল জ্বরহেতু মুদ্রিতচক্ষু ও অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অভিনন্দনের উত্তর দিলেন। আমরা অবাক্ বিস্ময়ে অর্দ্ধসংজ্ঞ মহাপুরুষের কণ্ঠোচ্চারিত অপূর্ব্ব-ভাষা-লালিত্যপূর্ণ ভাবভূয়িষ্ঠ ভাষণ শ্রবণ করিলাম। দুঃখের বিষয় সে ভাষণটী কেহ লিখিয়া রাখে নাই। ক্ষীণকণ্ঠোচ্চারিত সেই অতুলনীয় উপদেশ স্মৃতি হইতে লিখিয়া দিবার শক্তি আমাদের নাই।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীবাবা অন্নপথ্য করিলেন। ১৫ই ও ১৬ই জ্যৈষ্ঠ গ্রামের বহু যুবক সাধন-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্নে ১১ ঘটিকায় নৌকাযোগে শ্রীশ্রীবাবা রহিমপুর রওনা হইলেন।

রহিমপুর

১৯শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

পথে নৌকা ঝড়ে পড়িয়াছিল। সুতরাং ডুবিতে ডুবিতে নৌকা কোনও

প্রকারে রক্ষা পাইয়া রাত্রি সাড়ে বারোটায় রহিমপুর আশ্রমে পৌছিল। শ্রীশ্রীবাবার ও তাঁহার সঙ্গীয় সেবকের সর্ব্বাঙ্গ এবং বিছানাপত্র জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। ফলে ঐ রাত্রিতেই জ্বর ফিরিয়া আসিল। মুরাদ-নগরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালীমোহন চক্রবর্ত্তী চিকিৎসা করিলেন। অগ্নিকূটের ডাক্তার ক্ষেত্রবাবুও দুইবার আসিয়া দেখিয়া গেলেন। এই দুইটী চিকিৎসকের মহানুভবতার তুলনা নাই। গ্রামের যুবকেরা দিবারাত্রি প্রাণান্ত যত্নে শুশ্রূষা করিলেন। গ্রামবাসীরা মুক্তহস্তে ডাব, আনারস, বেদানা প্রভৃতি দিতে লাগিলেন। গ্রামের একটীমাত্র সঙ্গতিসম্পন্ন অপুত্রক ব্যক্তি এই উপলক্ষে আশ্রমকে সাত পয়সার কাগজী বিক্রয় করিয়া কীর্ত্তি রাখিলেন। প্রণামের বাহারে এই ব্যক্তি অদ্বিতীয়। শ্রীশ্রীবাবার ঘরে বসিয়া যখন কয়েকজনে এই বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন, তখন শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিষয়াসক্তির এইরূপই পরিণাম,—কিন্তু তোমরা তার সমালোচনা থেকে বিরত হও এবং প্রাণপণে চেষ্টা কর, যাতে তোমাদের ভিতরে বিষয়াসক্তি না আস্‌তে পারে।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীবাবা অন্নপথ্য করিলেন।

রহিমপুর
৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

যে পবিত্র, সেই মধুর

রোগের শুশ্রূষার সময়ে একটা জিনিষ স্থানীয় যুবকদের লাভ হইয়াছে। তাহা হইতেছে, শ্রীশ্রীবাবার প্রতি একটা বাৎসল্যযুক্ত স্নেহভাব। উমাকান্ত, ব্রজেন্দ্র, যোগেন্দ্র, সত্যভূষণ প্রভৃতি সম্পর্কে একথা সম্ভবতঃ খাটে। উমাকান্ত ইহাদের শীর্ষস্থানীয়।

স্নেহপূর্ণকণ্ঠে উমাকান্ত ডাকিলেন,—বাবা।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ডাক্‌টা শুন্‌তে বড় মিষ্টি লাগে রে! কিন্তু জগতের কোনো পিতা অপবিত্র-চেতা সন্তানের জন্য গৌরববোধ করে না। তোরা সবাই পবিত্র হ। যে পবিত্র, সেই মধুর।

সন্তানকে ভালবাসার কারণ

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—পিতা যে সন্তানকে ভালবাসে, তার কারণ জানিস্? সন্তানের গুণ দেখে নয়, সন্তানের ভিতরে কি কি গুণের উন্মেষ হবে ব'লে তার আশা, কি কি গুণের উন্মেষ হবে ব'লে তার দাবী, তাই থেকেই ভালবাসে, তাই থেকেই আদর করে। তোদের স্নেহ করি, মানে, তোদের কাছে আশা করি, পরার্থে আর পরমার্থে।

রহিমপুর
৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা একখানা ইজি চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়াছেন। উমাকান্ত, ব্রজেন্দ্র ও নবীপুরের যোগেশ সাহা বসিয়া শ্রীশ্রীবাবার কথা শুনিতেছেন।

ভাল ছেলে

ভাল ছেলেদের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভাল ছেলের অনেক লক্ষণ। এক লক্ষণ আত্মসংযম আর এক লক্ষণ সৎসাহস। ঢাকার একটী ছেলে, ধর তার নাম সন্তোষ, হাইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। সাহিত্যিক রুচি, তাই আর একটী সাহিত্যিক ছাত্রের সঙ্গে বেশ ভাব জ'মে গেল, কিছুদিন যেতেই সাহিত্যিক বন্ধুটীর ভিতরে পাপ ঢুক্‌ল। সে সন্তোষের কাছে প্রণয় নিবেদন করে এক পত্র লিখ্‌ল! অন্য ছেলে এস্থলে কি কর্ত্ত? হয়ত চুপ্‌ মেরেই যেত। সন্তোষ পত্রখানাকে টুক্‌রো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিল। কয়েকদিন সে এই চিঠি সম্পর্কে একটী কথাও বল্‌লে না। শনিবার দিন স্কুল ছুটি হ'লে সাহিত্যিক বন্ধুর সাথে পথ চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লে,—"তুমি আমাকে এমন চিঠি লিখ্‌লে কেন?" সাহিত্যিক থতমত খেয়ে গেল। সন্তোষ বল্‌তে লাগ্‌ল,—"জানো আমি কেমন বংশে জন্মেছি? যে বংশে পুরুষ মাত্রেই নারী-জাতিকে শ্রদ্ধা করে, নারী মাত্রেই সতীত্বকে মর্য্যাদা দেয়, যে বংশে সাত-পুরুষে কেউ মদ্যপান করে নি, পরস্বাপহরণ করে নি। তেমন বংশের ছেলেকে তুমি বিপথে নিতে চাও?" সাহিত্যিক বন্ধু এতগুলি অন্যায় কথা সইবে কেন?

সে ছোরা বের কর্‌ল, সন্তোষকে মার্‌বার জন্য। সন্তোষ তার জামা খুলে বক্ষ স্ফীত ক'রে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বল্ল,—"মার্‌বে ত ? মারো, আমার বুকের রক্তে তোমার চিত্তের পাপ যদি একটুও কমে, তবে তোমার চাইতে আমি খুসী হব বেশী।" বলা বাহুল্য, সাহিত্যিক বন্ধু এই চোট্‌টা আর সামলাতে পার্‌ল না। সে অনুতপ্ত হ'ল, ক্ষমা চাইল, তার হৃদয় পবিত্র হ'ল।

শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই কাহিনীটী যদি সত্য ঘটনা হয়, তা হ'লে এই সন্তোষকে কি তোমরা ভাল ছেলে বল্‌বে ?

সকলে সমস্বরে উত্তর করিলেন,—নিশ্চয়।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হিতলাল রিপন কলেজে পড়ে। কলেজের পাশেই ভদ্রপল্লী। কলেজের ত্রিতলে ব'সে ছাত্রেরা পড়্‌ছে, পল্লীর একটী কুলবধূ নিজ-গৃহ-ছাদের উপরে এসে কাপড় রৌদ্রে দিতে গেল। কলেজের কয়েকটী অভদ্র ছেলে সিঁটি দিতে লাগ্‌ল। হিতলাল এই অভদ্র আচরণের প্রতিবাদ কত্তে লাগ্‌ল। ফলে অভদ্র ছেলেরা হিতলালের পিছনে গুণ্ডা লাগিয়ে দিল। কিন্তু দূর থেকে হিতলালকে চিনিয়ে দেবার সময়ে গুণ্ডারা হুগলী জেলার একটী গো-বেচারী ছেলেকে হিতলাল ব'লে ভুল কর্‌ল। সেই হুগলীর ছেলেটীকে গুণ্ডারা রাস্তায় ধ'রে বেদম প্রহার কর্ল্ল। পরদিন হিতলাল সব জান্‌তে পেরে কলেজ ছুটীর পরে তার অভদ্র সমপাঠীদের নেতাকে ডেকে নিয়ে গেল ছাদের উপর। তারপর তাকে বল্‌ল,—"দোষ কিছু ক'রে থাকি ত' আমিই করেছি, কারণ, ভদ্রকন্যার অসম্মানে প্রতিবাদ করেছি। শুধু করেছি বল্‌ব কেন, এখনো কচ্ছি। আমি ভদ্রকন্যার গর্ভে জন্মেছি, ভদ্রকন্যা মাত্রেরই মর্য্যাদা রক্ষা আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু তোমার যদি অতই ক্রোধ হয়েছিল, তুমি নিরপরাধ হুগলীর বেচারীকে মার্ খাওয়ালে কেন ? আমাকে বল, তোমার এ অন্যায়ের কৈফিয়ৎ কি ?" কাজটা একরকম কত্তে গিয়ে আর একরকম হয়ে যাওয়ায় অভদ্র ছেলেদের সর্দ্দার একটু থতমত খে'য়ে গিয়েছিল। হিতলাল দৃপ্তকণ্ঠে বল্‌তে লাগ্‌ল,—"তোমাদের মার দেবার ইচ্ছা ছিল, সাম্‌না সাম্‌নি এসে আমাকে মেরে যেতে পাত্তে, গুণ্ডা লাগাবার

কি প্রয়োজন ছিল ? তোমার ইচ্ছা হয়, আমাকে এখনো মার্ত্তে পার। আমি প্রতিবাদও কর্ব্ব না, টুঁ শব্দটীও কর্ব্ব না।" অভদ্র যুবক নিজের ভ্রম বুঝ্‌তে পার্‌ল এবং মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌ল। হিতলাল বল্‌ল,—"মার্জ্জনা আমার কাছে নয়, যাকে মার খাইয়েছ, তার কাছে।" অভদ্র যুবক তার কাছেও ক্ষমা চাইতে স্বীকৃত হ'ল।

শ্রীশ্রীবাবা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই কাহিনীটী যদি সত্য ঘটনা হয়, তা হ'লে হিতলালকে কি তোমরা ভাল ছেলে বল্‌বে ?

সকলে সমস্বরে উত্তর করিলেন,—নিশ্চয় !

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভাল ছেলের সংজ্ঞা আরও বহুব্যাপক। দুটী একটী সদ্‌গুণ দেখ্‌লেই তাকে ভাল ছেলে ব'লে মনে কর্ব্ব না। তবে তার কাছে আরও বহু বহু সদ্‌গুণের উন্মেষ আশা করি ব'লেই তাকে ভালো ছেলে বল্‌ব। তোমরা সবাই ভালো ছেলে হও। প্রাণপণে ভিতরের সুপ্ত সহস্র সহস্র সদ্‌-গুণকে সর্ব্বতোমুখ বিকাশ দাও। ভিতরের মহিমাকে বাইরে এনে প্রকাশ কর।

রহিমপুর

১লা আষাঢ়, ১৩৩

রহিমপুরের কর্ম্মজীবন বড় কষ্টের জীবন। কর্ম্মিষ্ঠতার আদর্শ প্রদর্শনের জন্য শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমের ব্রহ্মচারীদের লইয়া শ্রম করিয়াছেন অভাবনীয়। এদিকে অযাচকত্বের আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য উপবাসকে করিয়াছেন সযত্নে গোপন। ইহাতে শরীর যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষয়িত হইয়াছে। ফলে এবারকার অসুখে শরীর তাঁহার খুবই দুর্ব্বল। অদ্য তিনি সোজা হইয়া বসিতে পারিতেছেন।

ত্যাগ বড় না সেবা বড় ?

প্রাতে আটটায় দেবীদ্বার হইতে একটী যুবক আসিয়াছে। যুবকটী প্রশ্ন করিল,—ত্যাগ বড়, না, সেবা বড় ? এই দুটোর ভিতরে কোন্‌টা আমাদের অবলম্বন করা উচিত ?

শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ত্যাগ বল্‌তে কি বুঝায় ?

যুবক,—নিজেকে বলি দিয়ে দেওয়া।

শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—নিজের মাথাটা কেটে ফেলা এবং ম'রে যাওয়া ?

যুবক,—না, নিজের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ ক'রে দেওয়া।

শ্রীশ্রীবাবা,—উৎসর্গ ত' কর্লে। তারপরে শক্তি-সামর্থ্যগুলি কি থাকে, না, কর্পূরের মত উবে যায় ?

যুবক,—উবে যায় না, তবে আদর্শের অধীন হ'য়ে থাকে।

শ্রীশ্রীবাবা,—আচ্ছা, অধীন হ'য়ে থাকে কি ব'সে থাকবার জন্য, না, সব শক্তি-সামর্থ্য যাঁর অধীন ক'রে দিয়েছ, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বা প্রয়োজনানুযায়ী কাজ কর্ব্বার জন্য ?

যুবক,—তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ কর্ব্বারই জন্য।

শ্রীশ্রীবাবা,—এই কাজ করাটার নামই সেবা। ত্যাগ মানে সব শক্তি সমর্পণ করা, আর, সেবা মানে সেই সমর্পিত শক্তিকে আদর্শের প্রয়োজনে কাজে লাগান। অতএব, ত্যাগ ছাড়া সেবা হয় না।

মোহমুদ্গরের প্রথম শ্লোকের আধুনিক ব্যাখ্যা

অপরাহ্নে রমেশ, রমণী, উমাকান্ত ও নবীপুরের যোগেশ সাহা শ্রীশ্রীবাবার পাদমূলে আসিয়া বসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আচার্য্য শঙ্কর বড় সুন্দর বলেছেন,—

"মূঢ় জহীহি ধনাগম-তৃষ্ণাং,
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং
যল্লভসে নিজ কর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্।"

কথাগুলিকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা ক'রে নিও। হে মূঢ়, ধনার্জ্জনে দোষ নেই, ধনাগমের তৃষ্ণাতেই দোষ, কারণ তৃষ্ণাই মানুষকে অন্ধ করে, দর্পিত করে, বিচারবিহীন করে। সুতরাং তৃষ্ণাবিহীন হও এবং নিষ্কাম হ'য়ে আবশ্যকীয়

ধনার্জ্জন কর। স্থূলবুদ্ধি থেকো না, সূক্ষ্মবুদ্ধি হও, বাইরের বিতৃষ্ণা বিতৃষ্ণা নয়, মনের বিতৃষ্ণাই প্রকৃত বিতৃষ্ণা, মনে বিবেক-বৈরাগ্য-সম্পন্ন হও, মনে নির্লোভ হও, নিঃস্পৃহ হও, কিন্তু বাইরে দেহযাত্রা ও লোককল্যাণ নির্ব্বাহের জন্য, লাভলোভে নয়, যা অর্থ আবশ্যক নিরুদ্বেগে অর্জ্জন কর। কঠোর শ্রম কর যেন কর্ম্মপদবাচ্য হয়, অপকর্ম্ম যেন না হয়,— সেই কঠোর কর্ম্মের ফলস্বরূপ যা সৎভাবে পাবে, তাতেই চিত্তকে সন্তুষ্ট রাখ! যার জন্য তুমি বিধিপূর্ব্বক শ্রম করনি, তেমন অর্থ লাভের আশা রেখো না বা তার কল্পনাও করো না। ধনার্জ্জনে দোষ নেই, তৃষ্ণাতেই দোষ, অর্থ-লাভে দোষ নেই, কর্ম্মের পারিশ্রমিকই নিতে পার, অপকর্ম্মের নয়। মোহমুদ্গরের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা যদি এভাবে কর, তাহ'লে বর্ত্তমান যুগের লোকের উন্নতির সহায়তা করা হবে।

ইহার পরে শ্রীশ্রীবাবা বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

"নলিনীদলগত জলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবন-মতিশয় চপলং
ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।"

রহিমপুর

২রা আষাঢ়, ১৩৩৯

শ্রীশ্রীবাবা একখানা ইজি চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়াছেন, কয়েকটী একান্ত গুরুগতপ্রাণ যুবক শ্রীশ্রীবাবার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিয়াছেন। এখনও শ্রীশ্রীবাবা গৃহের বাহির হন না।

নামজপ ও জীবসেবা

জীবসেবা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিতে দিতে কহিলেন,—শরীরের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদনের জন্য যেমন ক্ষার বা সাবান ব্যবহার আবশ্যক, চিত্তবৃত্তির শুদ্ধি-সম্পাদনের জন্য তেমন পরোপকার-কার্য্য আবশ্যক। পরোপকারে আত্মনিয়োগের চেষ্টার মধ্য দিয়ে স্বার্থপরতা হ্রাস পায়, আসক্তির বস্তুতে আসক্তি কমে, দায়িত্ব-জ্ঞান বাড়ে এবং নিজের দুঃখ-দৈন্য নিয়ে সর্ব্বদা বিব্রত থাকতে ঘৃণাও বোধ হয়।

লজ্জাও বোধ হয়। কিন্তু ক্ষারের মধ্যেও যেমন অনেক সময় ময়লা মিশ্রিত থাকে তেমনি পরোপকার-চেষ্টার মধ্যেও নিজের অজ্ঞাতসারে অনেক দোষ-ত্রুটী লুকিয়ে থাক্‌তে পারে। শরীরের ময়লা যেমন সাবানে দূর হয়, সাবানের ময়লা আবার তেমনি জল-ধারায় দূর হয়। তদ্রূপ, চিত্তের ময়লা দূর হয় পরোপকারে, আবার পরোপকারমূলক কার্য্যের ভিতরের প্রচ্ছন্ন ময়লা দূর হয়ে যায় অবিশ্রাম ভগবানের নাম জপের দ্বারা।

জীবসেবা ও আত্মপরীক্ষা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জীবসেবা কত্তে গিয়েও অনুক্ষণ আত্মপরীক্ষা করা দরকার যে, মনের ভিতরে প্রচ্ছন্ন কোনও স্বার্থ, সুপ্ত কোনও যশোমান-লোভ আছে কি না। কিন্তু এমন সূক্ষ্ম সংস্কারও আছে, যা শুধু আত্মপরীক্ষায় ধরা পড়ে না। তাকে ধ্বংস করার জন্য অবিরাম ভগবানের নামই জপ্‌তে হয়। ভগবানের নামের গুণে আমাদের অজ্ঞাতসারে যে কত বিশাল বিশাল শত্রু, কত পরাক্রান্ত রিপু ধরাশায়ী হচ্ছে, তা যদি আমরা জান্‌তাম,তবে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতাম। তোমরা প্রত্যেকে নামে বিশ্বাস কর, নামে নির্ভর কর, নামে নিষ্ঠাশীল হও, নামকে প্রাণের প্রাণ ব'লে আলিঙ্গন কর, সকল পুরুষকারের আগে পাছে মধ্যে নামকে ওতঃপ্রোতভাবে সংস্থাপিত কর।

গোপন জীবসেবা

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা একটী কলেজের ছাত্রের গল্প করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হিতলাল একটী ছাত্র কল্‌কাতা সিটি কলেজে পড়ে। বর্ষাকালে খুব বেশী বৃষ্টি হ'লে তিন চার ঘণ্টার মধ্যে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বেচু চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, বলাই সিঙ্গী লেন, কালীতলা, সুকিয়া ষ্ট্রীট, এসবে প্রচুর জল জমে গেছে। শুধু জমে গেছে বল্‌লে ভুল বলা হয়, রাজধানীর রাস্তার উপর দিয়ে নৌকা বেয়ে লোক যাচ্ছে। শত শত লোক গলাজলে ভিজে ছাতা মাথায় যার যার গৃহে বা নিরাপদ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন কচ্ছে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে একটী বালক-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা স্কুলে আটক প'ড়ে গেছে। স্কুলে আসার পরে বৃষ্টি নেমেছে, স্কুল ছুটী হবার কাছাকাছি সময়ে বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু রাস্তায় অথৈ জল। ধনীর ছেলেদের জন্য বাড়ীর

চাকরেরা এসেছে, গরীবের ছেলেদের জন্য কেউ আসে নি। বিষণ্ণ মুখে ছেলেরা যার যার ক্লাসে ব'সে আছে। হিতলাল ভাব্‌ল, এই তার জীব-সেবার অবসর। একটী ক'রে ছেলে সে ঘাড়ে তুলতে লাগ্‌ল, আর, কোথাও আধ মাইল, কোথাও এক মাইল বুকজল ভেঙ্গে সে ছাত্রদের নিজ নিজ বাড়ীতে পৌঁছে দিতে লাগ্‌ল। ছেলের বাপ এখনো অফিসে আটক প'ড়ে আছেন, জলের জন্য বাড়ী আস্‌তে পারেন নি, মা ছেলের জন্য ভেবে আকুল, এমন সময় এক এক গৃহে এক একটী ক'রে ছেলে হিতলালের কাঁধে চ'ড়ে এসে নিরাপদে পৌঁছুল। পনের বিশটী ছেলেকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে হিতলাল ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌ল, শীতে তার দাঁত ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। নিকটবর্ত্তী এক কবিরাজের দোকান থেকে গোটা তিনেক লক্ষ্মীবিলাস বড়ী খেয়ে শরীর গরম ক'রে নিয়ে সে পুনরায় তার কাজে লাগ্‌ল। পরিশেষে অতি মাত্রায় শ্রান্ত হ'য়ে সে এসে যখন নিজ গৃহে শয্যাশ্রয় কর্ল্ল, তখন একমাত্র তার কনিষ্ঠ সহোদর ছাড়া জগতের আর কেউ এই নীরব সেবার কথা জান্‌ল না। এরূপ গোপনে যদি জীবসেবা কর, তবে তাতে পঙ্কিলতা কম আস্‌বে।

শ্রীশ্রীবাবা আরও একটী গল্প করিলেন। তিনি বলিলেন,—প্রাতে উঠে হিতলাল কোনো কোনো দিন দুই চারি মাইল ভ্রমণ করে। রাত্রে খুব বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, ভোরে উঠে রাস্তা জলময় দেখে বড়বাজার অঞ্চলের দৃশ্য এখন কেমন, এই কৌতূহলের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে চল্ল হাওড়া-পোলের দিকে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কাছাকাছি গিয়ে সে দেখ্‌তে পেল, এক রিক্সাওয়ালা জলের দরুণ রিক্সা আর টান্‌তে পাচ্ছে না ব'লে আরোহীদের নেমে যাবার জন্য খুব রাগারাগি সুরু করেছে। হিতলাল কাছে গিয়ে দেখে, আরোহীরা দুইজনেই স্ত্রীলোক, একজনের বয়স ষাট, একজনের বয়স সাত। তারা বোধ হয় ঠাকুরমা আর নাত্‌নী হবে। ছেলের অসুখের সংবাদ শুনে বৃদ্ধাটী পুরুষ চলনদার না পেয়ে নাত্‌নীটীকেই নিয়ে এসেছে,—যাবে মাণিকতলা, অর্থাৎ প্রায় চার মাইল পথ। হিতলাল রিক্‌সা-বাহককে বল্‌লে,—"তুমি যখন যাত্রী নিয়েছ, তখন তাকে জায়গায় পৌঁছে না দিয়ে নেমে যেতে বল্‌তে পার না।" রিক্‌সা-

ওয়ালা বল্লে,—'জলের প্রচণ্ড স্রোত চলেছে, এর মধ্যে আমি কি নিজের জান্ দিয়ে দিব ?" হিতলাল বল্লে,—"ভয় কি ? তুমি ঠেল পিছন থেকে, আমি টানি সাম্‌নে থেকে, অনায়াসে রিক্‌সা তার জায়গায় এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে।" রিক্‌সা টানা সুরু হ'ল, মাণিকতলা পৌঁছুতে প্রায় ঘণ্টা তিনেক লাগ্‌ল। সিক্ত বস্ত্রে ক্লান্ত দেহে হিতলাল যখন ঘরে ফিরে এল, তখন তার প্রাণসম কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া দুনিয়ার আর দ্বিতীয় প্রাণীটীও এই বিবরণ জান্‌ল না। এই ভাবে যদি পরোপকার কর্ত্তে পার, তবে তাতে চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা বাড়্‌বে।

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—কতকদিন ধরে আমি একটী খবরের কাগজের অভাব অনুভব কচ্ছিলাম। কাউকে তা ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে দিই নাই। কিন্তু হঠাৎ কে এক জন আমার অজ্ঞাতসারে "লিবার্টি" পত্রিকা-আফিসে টাকা জমা দিয়ে দিয়েছেন। এখন রোজ পত্রিকা আস্‌ছে। নিজেকে চোরের মত প্রচ্ছন্ন রেখে এই যে সেবা, এর মর্য্যাদা অনেক।

অ-সেবা ও যশোলোভে সেবা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একদম জীবের সেবা না করার চাইতে যশোলোভেও কিছু সেবা করা উৎকৃষ্টতর। একদম পরোপকার না করার চাইতে অল্প স্বার্থ রেখেও পরার্থ-সেবা ভাল। কিন্তু এই ব্যবস্থা তামসিক ব্যক্তির জন্য, তারই এতে মঙ্গল। সাত্ত্বিক ব্যক্তির এতে অমঙ্গল মানে পতনই হবে। সাত্ত্বিক ব্যক্তির আদর্শ হবে নিষ্কাম সেবা, নির্লোভ সেবা,—তার সেবা কোনও বিনিময়ের ধার ধারে না, কোনও প্রাপ্যের লোভ রাখে না। কিন্তু যেখানে নিঃস্বার্থ হ'য়ে কেউ রোগীর শুশ্রূষা কর্ব্বে না, সেখানে বৃত্তিভোগিনী শুশ্রূষা-কারিণীও অনাদরের বা অবজ্ঞার বস্তু নয়। যেখানে প্রাণের টানে কেউ দেশরক্ষী সৈন্য হবে না, সেখানে বেতনভুক্ সৈন্যদলও তুচ্ছ নয়। যখন তোমরা অপরের সেবাকার্য্যকে আলোচনা কর্ব্বে, তখন তার বেতনগ্রাহিতাকে তুচ্ছ ক'রে তার মৃত্যুনির্ভীকতাকে বড় ক'রে দেখো। কিন্তু যখন তোমার নিজের সেবাকার্য্যকে তুমি বিচার কর্ব্বে, তখন তোমার ক্ষুদ্রতম দোষ, ত্রুটী বা অসম্পূর্ণতাকেও ক্ষমার চক্ষে দেখ্‌তে বিরত হয়ো।

নিজের দোষ-ত্রুটী, অপরের দোষ-গুণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখার গুণেই লোকে জগতের অধিকাংশ কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। নিজের দেখ্‌তে হয় ত্রুটিটুকু, যেন সংশোধন করা যায়; অপরের দেখ্‌তে হয় গুণটুকু, যেন অনুকরণ করা চলে। জগতের প্রশস্ত রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছ, চখ খোলা রে'খে ঘোর। অপরের যা দেখ সুন্দর, অবিলম্বে তাকে নিজস্ব কত্তে প্রয়াসী হও। নিজের যা কিছু দেখ অসুন্দর, কুযুক্তি দিয়ে তাকে সমর্থন কত্তে চেষ্টা না ক'রে যত দ্রুত পার তাকে পরিহার কর। অপরের ভিতরে এমন অনেক গুণ আছে, যা তোমার পক্ষে অনুকরণ হয়ত সাজে না, সেস্থলে প্রশংসার বস্তুকে প্রশংসাটুকু দিতে কৃপণ হ'য়ো না। এইভাবে যদি চল, দেখবে কত অল্প সময়ে তোমাদের রুচি প্রকৃতি কত দ্রুত সত্য, সুন্দর, মহৎ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রহিমপুর

৩রা আষাঢ়, ১৩৩৯

"প্রভাত-ভবনের" বাহিরে উঠানে একখানা ইজি চেয়ারে শ্রীশ্রীবাবা শুইয়া শুইয়া কথা কহিতেছেন। আজি তিনি প্রথম ঘরের বাহিরে আসিলেন। "প্রভাত-ভবন" ঘর খানা মাটির তৈরী। জানালা কম। আলো কম যায়। অপরাহ্নের আকাশ দেখিবার জন্য শ্রীশ্রীবাবা বাহিরে আসিয়াছেন।

উমাকান্ত, রমেশ প্রভৃতি কয়েকটী যুবক শ্রীশ্রীবাবাকে ঘিরিয়া বসিলেন।

দৃষ্টান্তের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোরা বোধ হয় শুন্‌তে চাইবি, কিভাবে ভগবানের নামে আমার রুচি এল। পিতামহ ছিলেন অসাধারণ জাপক পুরুষ। যখনি কোনো জাপক পুরুষ বাড়ীতে আস্‌তেন, তখনি দেখ্‌তাম শত কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও পিতামহ ফাঁক ক'রে নিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে ব'সে ঠাকুরঘরে দু-চার ঘণ্টা জপ করার জন্য। সৎলোক এলেই পিতামহের আলাপের বিষয় ছিল জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি। আবাল্য এসব কাণে শুন্‌তাম, ফলে মন আপনা আপনিই কতকটা অনুকূল হ'য়ে গেল। পিতা চালাতেন লোহার কারখানা,

মজুর মিস্ত্রী নিয়ে তাঁর কাজ, কিন্তু সর্ব্বদা দেখ্‌তাম তাঁর শিয়রের নীচে একটী ছোট রুদ্রাক্ষের মালা। অধিকাংশ সময় তিনি শয্যায় ব'সেই নাম জপ কত্তেন। জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন পিতার নিত্যসঙ্গী ও সমকর্ম্মী, তাঁকেও দেখ্‌তাম প্রত্যহ প্রচুর সময় জপ কচ্ছেন। পিসিমা প্রায় সারা বছরই পিত্রালয়েই থাক্‌তেন, প্রত্যহ তাঁকে দেখ্‌তাম পিতামহেরই মত দৃঢ়া নিষ্ঠা নিয়ে দীর্ঘকাল ধ'রে জপ কচ্ছেন। পিসেমশায় ছিলেন পিতামহেরই মুহুরী, তাঁকে দেখ্‌তাম ঘুমের ঘোরেও কর জ'পে যাচ্ছেন। কুলগুরু অন্নদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য, যিনি আমাকে পরে সাবিত্রী দীক্ষা দেন, তাঁকে দেখ্‌তাম, যখনি আসতেন, প্রায় সারাদিনই অবিরাম মালা জপ্‌ছেন। এত দৃষ্টান্তের সাম্‌নে নামে রুচি না আসাই অস্বাভাবিক।

প্রলোভনে পড়িয়া নামজপারম্ভ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু নামজপ কার্য্যটী সুরু অত সহজে হয় নি। বিদ্যালয়ে নীচের শ্রেণীতে পড়্‌তুম। একজন শিক্ষক এলেন বিদেশ থেকে বড়ই ধার্ম্মিক। তাঁর প্রতি সব ছাত্রেরা আমরা আকৃষ্ট হ'লাম। ক্লাসে ব'সে পড়াতে পড়াতে তিনি একদিন বল্লেন,—গুলঞ্চের রস যদি কেউ খায় আর একলক্ষবার নাম জপ করে, তা হ'লে সে সিদ্ধিলাভ করে। কথাটী প্রাণের ভিতরে গিয়ে লাগ্‌ল। নামজপ সুরু করে দিলাম। দুজন বন্ধু জুটে গেল, তারা পরস্পর সহোদর ভাই, আমার প্রায় সমবয়সী, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে নাম জপ বেশ চল্‌তে লাগল। একটী ক'রে নাম ধরি আর লক্ষ জপ শেষ করি,—অবশ্য একদিনে নয়, কয়েক সপ্তাহে। একটীর পর একটী ক'রে সরস্বতী নাম থেকে সুরু করে বহু বহু নামের পরে লক্ষ জপ একেবারে কালী-নামে গিয়ে ঠেক্‌ল। উল্লেখযোগ্য আর কোনও দেবতার নাম যখন বাকী রইল না, তখন জগদীশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম প্রভৃতি নাম এক লক্ষ ক'রে জপ কত্তে লাগ্‌লাম।

সর্ব্বজপের প্রণবে পর্য্যবসান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই সময়ে এক মহাপুরুষের দর্শন হ'ল। তাঁর নাম আমি জানি না। আমি নিজে তঁকে বাবা শঙ্করনাথ নাম দিয়েছি। একটী নাম

না থাক্‌লে যেন মনটা মানে না। তাঁকে আমি নিজেই কল্পনা ক'রে উত্তরাখণ্ডের প্রসিদ্ধ নাথপন্থী যোগী সুন্দরনাথজীর পরমাত্মীয় ব'লে মনে ক'রে নিয়েছি। তাঁকে দেখে আমার দানেচ্ছা জাগ্রত হ'ল। সাড়ে আট আনা পয়সা নিয়ে গেলাম একমাইল রৌদ্রের মধ্যে হেঁটে তাঁকে তা দান কত্তে। তিনি নিতে চাইলেন না, জোর ক'রে গছিয়ে দিলাম। তিনি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকালেন,—সেই দৃষ্টি যেন আমাকে রূপান্তরিত ক'রে দিল, আমি যেন জীবনটার একটী নূতন আর্ট অনুভব কল্লাম। অথচ আমি নিতান্ত বালক, নিজের অনুভূতিকেও ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারি না। এই সময়ে কাশীধাম থেকে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত সাধু ধর্ম্মপ্রচারে এসে পিতামহের অতিথি হলেন। তিনি আমাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যেতে চাইলেন, আমি রাজি হলাম কিন্তু পিতামহ সম্মত হলেন না। তাঁর সঙ্গে পিতামহের আলোচনা হ'ল যে উপনয়ন হবার আগে গায়ত্রী ও প্রণব জপ করা যায় কিনা। তিনি সনাতনী সাধু। তিনি বিরুদ্ধে মত প্রকাশ কল্লেন। মনে হ'ল পিতামহ যেন তাঁর কথাটী পূরোপূরী মান্‌তে চান্ না, মাত্র অভ্যাগত ও সন্ন্যাসী ব'লেই তাঁর কথাতে সায় দিয়ে যাচ্ছেন। এই ঘটনার পর থেকে আমার মন প্রণব আর গায়ত্রীর দিকে ধাবিত হ'ল। পিতামহের হাতে লেখা পুঁথি থেকে গায়ত্রী বে'র ক'রে মুখস্থ ক'রে ফেল্‌লাম কিন্তু জপের তেমন রুচি তখনো এলনা। ফরিদপুর থেকে একটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এলেন, তিনি গেরুয়া পরেন। দুই তিন দিন তিনি বাড়ীতে রইলেন, পিতামহ প্রতিদিনই দীর্ঘকাল তাঁর সাথে ধর্ম্মালোচনা কর্ল্লেন। যেদিন তিনি চ'লে যাচ্ছেন , সেদিন তাঁর চ'লে যাবার কালে পিতামহ নিজ পূজায় ব্যস্ত, কিন্তু তিনি চ'লে যাবার পরে পিতামহের মনে হ'ল যে অনুপনীত অবস্থায় প্রণব ও গায়ত্রী জপ করা যায় কিনা জিজ্ঞাসা করা যাক্। পূজার মাঝখানেই পিতামহ আমাকে এই বিষয়টী জেনে নেবার জন্য ছুটে রাস্তায় বেরুতে বল্‌লেন। আমি খানিকটা পথ গিয়ে পণ্ডিতজীকে ধল্লাম এবং প্রশ্নটী উপস্থিত কল্লাম। তিনি বল্লেন,—"না, পারা যায় না।" আমার মনে হতে লাগ্‌ল, পারা যায় কি না যায়, একথা বল্‌বার ইনি যেন অধিকারী নন। ফিরে এলাম। পূজান্তে

পিতামহ উঠে এলে তাঁকে সব কথা বল্লাম। তিনি হেসে বল্লেন,—"পণ্ডিত আর সাধক দুটা আলাদা বস্তু।" পিতামহের কথার মানে আমি সম্পূর্ণ বুঝ্লাম না কিন্তু গায়ত্রী জপে লেগে গেলাম। এর কিছুদিন পরেই পৈতা হ'ল, কুলগুরু অন্নদা ভট্টাচার্য্য মহাশয় এসে পৈতা দিলেন, গায়ত্রী জপ স্থরু হ'ল। কিছুদিন পরে গায়ত্রী নিজে নিজেই প্রণবে পরিণত হ'য়ে গেলেন। বাস্তবিক জেনো, সর্ব্বজপের সেইখানেই পরিপূর্ণতা, যখন তা এসে প্রণবে পর্য্যবসিত হয়।

বিশ্বাসের সূচনা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু নাম জপ করা এক কথা, আর নামে বিশ্বাস আসা আর এক কথা। নাম কত্তে কত্তে বিশ্বাস আসে সত্য কিন্তু বিশ্বাস না আসা পর্য্যন্ত নাম মিঠা লাগে না, মিঠা না লাগ্লে দীর্ঘকাল তা জপাও যায় না। ভগবানের নামে যার বিশ্বাস এসেছে, আমি তাঁর দাসের দাস হ'য়ে থাক্তে চাই। নামে বিশ্বাস আসা সহজ কথা নয়, বিশ্বাস এলে জীবনের উদ্দেশ্য বারো আনা সফল হ'য়ে গেল। বিশ্বাস আসা বড় কঠিন, তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না, তবে তার জন্য নিজেও খাটতে হয়, তাহ'লেই তাঁর কৃপা আস্তে আস্তে অনুভব করা যায়। নাম জপ্তে জপ্তে ভগবানের দয়ায় বিশ্বাসের ভূমি যেন তৈরী হ'তে স্থরু হ'ল। একদিন পায়ের তলায় প'ড়ে একটা আরসোলা গেল মারা। মনে কত্তে পারি না যে এটা আবার বাঁচতে পারে। তবু তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে অবিরাম নাম জপ্তে লাগ্লাম। কতক্ষণ পরে দেখা গেল, এটা জীবিত। নামের মহিমাতে বিশ্বাসের স্থচনা হ'ল। কয়েকজন দুষ্টপ্রকৃতির বাল্যবন্ধু একটী ইঁদুরকে ধ'রে পুকুরের মাঝখানে ফেলে দিল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সাঁতার কেটে শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে বেচারী ঢোকে ঢোকে জল খেতে স্থরু করল। আমার প্রাণে বড়ই লাগ্ল। আমি এই ইঁদুরটীর দিকে একলক্ষ্যে তাকিয়ে অবিরাম নামজপ কত্তে লাগ্লাম। কতক্ষণ পরেই দেখি, ইঁদুরটী ঢোকে ঢোকে জল গেলা বন্ধ ক'রে পূর্ব্বের চেয়ে অধিক বিক্রমে সাঁতার কেটে পুকুরের অপর পারে গিয়ে অনায়াসে তীরে উঠ্ল। প্রাণটাতে বিশ্বাসের জোর বাঁধ্ল। ফুটবল খেলা হচ্ছে, একদল তিনটী গোল খেয়েছে, তাদের মনের নিরানন্দ ভাব দেখে ব্যথা

অনুভব কল্লাম। প্রাণপণে নামজপ সুরু কল্লাম। পনের বিশ মিনিটের মধ্যে দুর্ব্বলপক্ষ তিন তিনটা গোল শোধ ক'রে ফেল্ল, খেলা ড্র হ'ল। কবে কোথায় কি কি হ'ল, সেই সব কাহিনী তোমাদের শুনান ভাল নয়। তাই সে সব আর বলব না। কিন্তু এই রকম শত শত ঘটনায় যখন দেখা গেল, নাম-সেবকের পরাজয় নেই, তখনই প্রাণ ব্যাকুল হ'ল বিশ্বজগৎকে নামের মাহাত্ম্যে কি ক'রে বিশ্বাসী করি।

নামের সেবাই শ্রেষ্ঠ সেবা

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা একটু বিচলিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, বাবা আমার, সোণা আমার, কত সেবা করেছ তোমরা আমাকে আমার এই দেহের পীড়ার সময়ে। কত রাত জেগেছ, কত জল ঢেলেছ, কত বাতাস দিয়েছ। সে ঋণ আমি কখনো শোধ কত্তে পারব না,—কি তোমাদের, কি চান্দলা গ্রামের লোকদের। কিন্তু বাবা, এ সেবা যে কিছুই নয়, তার তুলনায়, যদি তোমরা প্রাণটী মজিয়ে ভগবানের নামের সেবা কর। একটীবার যে ভগবানের নাম প্রাণ ভ'রে প্রেমভরে করে, আমি তার শত জন্মের দাস, তাঁর লক্ষ জন্মের দাস, তার কোটি জন্মের দাস।

নামের সেবাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আজ জগতের কেউ আমাকে জানে না, কেউ আমাকে চেনে না, দুটী পল্লীবাসী বালক ছাড়া কেউ আমার কথা শুনতে আসে না কিন্তু একদিন সহস্র লোক ডালি সাজিয়ে দানের অর্ঘ্য নিয়ে আস্‌বে। কিন্তু তাতে কি আমি তৃপ্ত হব, তাদের কি প্রিয় মনে কর্ব্ব? নামের সেবা যে করে, সেই ত আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়!

রহিমপুর

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৩৯

মধুমাখা নাম জপ অবিরাম

প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীবাবা কয়েকখানা ছোট ছোট পত্র লিখিলেন। মেদিনীপুর জেলা-নিবাসী জনৈক ভক্তকে লিখিলেন,—

"মধুমাখা নাম জপ অবিরাম
নিশ্চয় পূরিবে যত মনঃকাম।
নামের সেবায় রহিলে নিষ্কাম
মর্ত্ত্যলোকে মিলে নিত্যানন্দ ধাম।"

মনঃসংযোগ সাধনের উপায়

অপরাহ্নে শ্যামগ্রাম-নিবাসী একটী যুবক আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার নিকট প্রশ্ন করিল যে পড়াশুনায় মন বসাইবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনেক সময় দীর্ঘকাল-ব্যাপী অসুখে মনঃসংযমের ক্ষমতা ক'মে যায়। সে সব স্থলে স্থূল উপায়রূপে আগে পথ্য, ঔষধ, বিশ্রাম প্রভৃতির দ্বারা শারীর স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধান প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন, নিয়মিত ভগবানের নামের সেবা দ্বারা মনঃসংযমের বিরোধী সূক্ষ্ম চিত্ত-সংস্কার-গুলিকে নাশ করা। পড়্‌তে বসার আগে খুব খানিকক্ষণ বেশ একটু নাম জ'পে নেবে। পড়া শেষ ক'রে আবার কতক্ষণ নাম জ'পে নেবে। পড়্‌তে পড়্‌তে মাঝখানে মনকে খুব চঞ্চল ব'লে বোধ কর্‌লে তখনও কিছুক্ষণ নাম জ'পে নেবে। এভাবে কিছুকাল অভ্যাস চালালে দেখ্‌বে যে পাঠে মনঃসংযোগ অতি সহজ ব্যাপার, এর জন্য কোনও প্রকার উদ্বেগ বা চেষ্টারই আর পৃথক্ প্রয়োজন হচ্ছে না।

জিজ্ঞাসু বলিলেন,—ঈশ্বর-ফীশ্বর আমি মানিও না, তাঁর নাম জপে আমার রুচিও নেই, ইচ্ছাও নেই।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাহ'লেও তুমি নিরুপায় নও। অবিরাম সঙ্কল্প কর্ত্তে থাক যে, প্রতিনিয়তই তোমার মনঃসংযমের ক্ষমতা বাড়্‌ছে। ভাব্‌তে থাক, ইচ্ছাশক্তিরই বলে প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তে তোমার মনোযোগের সামর্থ্য উপস্থিত হচ্ছে। হা-হুতাশের ভাব না রেখে আশার ভাব অন্তরে পোষণ ক'রে এই ভাবনা অনুক্ষণ কর্ত্তে থাক।

ঈশ্বরে বিশ্বাস

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—তোমরা ত' বাবা ঈশ্বর-ফীশ্বর মান না। ফীশ্বর

জিনিষটা আমিও মানি না। কিন্তু ঈশ্বর মানি। একটা কল্পিত বস্তু ব'লে নয়, একটা প্রত্যক্ষ বস্তু ব'লে মানি। যাঁর প্রীতির স্পর্শ টের পাওয়া যায়, যাঁর স্নেহের ডাক কানে শুনা যায়, যাঁর মধুর প্রেম আবেশ আনে, এমন ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ ব'লে মানি। আমরা যখন পড়্‌তে বস্‌তাম, তখন পড়ার আগেও নাম জপ্‌তাম, পড়ার মাঝেও নাম জপ্‌তাম, পড়ার শেষেও নাম জপ্‌তাম। ফলে, মনঃসংযোগ সাধনের জন্য পৃথক্ একটা চেষ্টা আর কত্তে হ'ত না। পরীক্ষার 'হলে' গিয়ে প্রশ্ন-পত্র পড়ার পরেই নাম জ'পে নিতাম। জপার গুণে ভগবান্ আমাকে বেশী নম্বর দিন, এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নয়। নামজপের ফলে মনটা শান্ত ও স্থির হ'য়ে যেত ; কঠিন জিনিষ দেখেও ধৈর্য্যের সঙ্গে তাকে গ্রহণ করার সাহস, রুচি, সামর্থ্য এসে যেত। জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রেই ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা বাড়াবার জন্য নামজপের এই এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা। তোমাদের যখন ঈশ্বরে বিশ্বাস আস্‌বে, তখন তোমরা এই পন্থা অবলম্বন ক'রো। চিরকালই কি ঈশ্বরকে অবিশ্বাস ক'রে থাক্‌তে পার্‌বে, তা অবশ্যই পার্‌বে না। যখন দেখ্‌বে, ঈশ্বরে বিশ্বাস আস্‌ছে, তখন প্রতিকর্ম্মের ব্যস্ততার ভিতরেও তাঁকেই আদিতে, মধ্যে ও অন্তে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রো। দেখ্‌বে, উদ্বেগের কারণের মাঝেও কিরূপ নিরুদ্বেগ থাক্‌তে পার !

নাস্তিক হইবার কারণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেউ কেউ নাস্তিক হন, ঈশ্বর যে আছেন, তার কোনও বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ না পে'য়ে। কেউ কেউ নাস্তিক হন, ঈশ্বর যে আছেন, তার কোনও তর্ক-সঙ্গত যুক্তি না পে'য়ে। কেউ কেউ নাস্তিক হন, ঈশ্বর-বিশ্বাসের অনুকূল মনোভঙ্গীর অভাবে। কেউ কেউ তর্কস্থলে ঈশ্বরকে মেনে নিয়ে অনেক সাধন-ভজন ক'রেও তাঁকে প্রত্যক্ষ কত্তে না পেরে নাস্তিক হন। কেউ কেউ লক্ষ্য করেন যে, ঈশ্বরের নামের দোহাই দিয়ে একদল লোক সমাজের মধ্যে পরগাছার মত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং এতে সমাজে দারুণ অর্থ-নৈতিক ক্ষতি ও অব্যবস্থা হ'চ্ছে, সুতরাং ঈশ্বর থাকুন আর না থাকুন, তাকে অস্বীকার করায় সমাজের মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেউ কেউ লক্ষ্য করেন যে, ঈশ্বরের

নামের দোহাই দিয়ে একদল লোক জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অপর দল লোকের উপরে নিজ প্রভুত্ব বিস্তারিত ক'রে তাদিগকে ক্রীতদাস-বিশেষে পরিণত ক'রে রেখেছে, অতএব, ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, তাকে অস্বীকার করাই বহুজনহিতের ও বহুজনসুখের কারণ স্বরূপ হবে। কেউ দেখ্‌ছেন, ঈশ্বর মান্‌তে গেলেই তাঁর ন্যায় বিচারকেও মান্‌তে হয়, আর ন্যায় বিচারকে মান্‌তে গেলে যথেচ্ছ অন্যায়, অধর্ম্ম, অনাচার, কদাচার প্রভৃতি নিভয়ে নিঃসঙ্কোচে নিষ্কুণ্ঠায় করা যায় না, মনে বাঁধে, তাই তাঁরা ঋণ ক'রে ঘৃত পানের সুবিধার জন্য ঈশ্বরকে না মানাটা সুবিধা-জনক মনে ক'রে থাকেন। এইভাবে নানা জন নানা কারণে নাস্তিক হ'য়ে থাকেন।

আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েই আদরণীয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু বহুলোক নাস্তিক ব'লেই আস্তিকদের উদ্বিগ্ন বা ভীত হবার কোনও কারণ নেই। নাস্তিকেরা না থাক্‌লে আস্তিকত্বের মহিমাই প্রকাশ পেত না। বৈচিত্র্যময়ের সৃজন-কুশলতায় আস্তিক আর নাস্তিক দুইজনেই তাঁর সৃষ্টির সুষমা বর্দ্ধন কচ্ছেন। এর মধ্যে একজনও অনাদর করার বস্তু নন।

আস্তিক হইবার কারণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু মজা হচ্ছে এই, যে সব কারণ গুলিকে আশ্রয় ক'রে এক একটী নাস্তিক-সঙ্ঘ সৃষ্টি হচ্ছে, প্রায় সেই সব কারণকে আশ্রয় ক'রেই এক একটী আস্তিক-সঙ্ঘেরও সৃষ্টি হচ্ছে। বিজ্ঞান যে প্রাণপণ খুঁজেও তাকে পেল না, বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির যুগেও যে সে তাঁকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ উভয় কার্য্য কত্তেই সমভাবে অসমর্থ হয়েছে, এতেই বুঝা যাচ্ছে তিনি কত অদ্ভুত, কত রহস্যময়। এর জন্যই অনেকে তাঁকে বিশ্বাস করেন। মানবের ক্ষুরধার যুক্তি আর কুশাগ্র বুদ্ধি আজ পর্য্যন্ত তাঁকে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত কত্তে অক্ষমই রয়ে গেল, এই খানেই বুঝা যাচ্ছে, মানববুদ্ধি আর মানবযুক্তি কত তুচ্ছ, কত নগণ্য এবং এই কারণেই অনেকে তাঁকে বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রতিকূল মনোভঙ্গী জগতে যতটা, অনুকূল মনোভঙ্গী তার চেয়ে বহুগুণে অধিক। ঠিক্ এই কারণেই অনেকে আস্তিক। নিষ্ঠা, ভক্তি ও একাগ্রতা সহকারে দৃঢ়

বিক্রমে ভগবৎ-সাধন ক'রে কেউ কেউ তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন ব'লে উপলব্ধি কচ্ছেন এবং এই জন্যই তাঁরা আস্তিক। কেউ কেউ দেখ্‌ছেন, তাঁর উপরে ভারার্পণ কর্ল্লে আপনা থেকে লোকে এসে যোগক্ষেম বহন ক'রে থাকে, এবং এতে উৎসাহিত হ'য়ে তাঁরা হন আস্তিক। কেউ কেউ দেখ্‌ছেন যে, নিজেকে তাঁর দাস ক'রে দিলে জগৎ এসে স্বেচ্ছায় ভক্তের দাসত্ব মহাসমাদরে বরণ ক'রে নেয়, জেদ্ জবরদস্তি কৌশল বা ফন্দীবাজীর প্রয়োজন হয় না, এতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তিনিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, এবং জীব আপন স্বভাবেই তাঁর নিত্য দাস। এই ভাবেও অনেকে আস্তিক হন। আবার অনেকে দেখ্‌ছেন, তাঁকে করুণাময় ব'লে মান্‌লে অনায়াসে অনাচার কদাচার সব ক'রেও, ঋণ ক'রে ঘী খেয়েও, পরিত্রাণের আশা মনের ভিতরে পোষণ ক'রে কতকটা নিরুদ্বেগ হওয়া সম্ভব হয়। এই কারণেও অনেকে ভগবানকে মানেন। অর্থাৎ, ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, যে-কারণে একজন তাঁকে মান্‌বেন না, ঠিক্ সেই কারণেই আর একজন তাঁকে মান্‌তে বাধ্য হচ্ছেন।

করুণাময় না ন্যায়-বিচারক ?

শ্যামগ্রামের যুবকটী প্রস্থান করিলে পরে রহিমপুর গ্রামের একটী যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি যদি মনে করি যে, ঈশ্বর করুণাময়, সুতরাং আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক যত পাপানুষ্ঠান কচ্ছি, সবই তিনি ক্ষমা কর্ব্বেন, তবে কি আমার সেই ধারণা ঠিক্ হবে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সবই কত্তে পারেন। তিনি ক্ষমা কর্‌বেনই, তুমি যদি কষ্ট ক'রে এমন একটী শক্ত ধারণা কত্তেই পার, তাঁর পক্ষে ক্ষমা করা ত' কটাক্ষের ব্যাপার। সর্ব্বশক্তিমান ব'লেই তিনি একাধারে ন্যায়বিচারক ও করুণাময়। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে, বারংবার পাপানুষ্ঠান ক'রে ক'রেও ক্ষমা পাব ব'লে দৃঢ় বিশ্বাস করা অতি কঠিন ব্যাপার। তবু, এরূপ বিশ্বাসের চেষ্টাটা লাভজনক। কারণ, এরূপ বিশ্বাসকে অন্তরে দৃঢ় কর্ব্বার চেষ্টা কত্তে কত্তে পাপে অনুরক্তি আস্তে আস্তে আপনি কমে যেতে থাকে। তিনি ন্যায়-বিচারক, এই বিশ্বাসের ফলে পাপানুরক্তি জ্ঞাতসারে ও

চেষ্টাসহকৃত ভাবে কম্‌তে থাকে। তিনি করুণাময়, এই বিশ্বাসের ফলে পাপানুরক্তি অজ্ঞাতসারে ও বিনা চেষ্টায় হ্রাস পেতে থাকে। উভয়বিধ বিশ্বাসেরই চরমফল এক—শুদ্ধতা লাভ করা, নিষ্কলুষ নিষ্পাপ হওয়া।

রহিমপুর

৫ই আষাঢ়, ১৩৩৯

"ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ"

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা কাছাড় জেলান্তর্গত মুক্তাছড়া নিবাসী জনৈক প্রিয় সন্তানকে পত্র লিখিলেন,—

"বাবা, তুমি সম্বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনে সঙ্কল্পবান্ হইয়াছ শুনিয়া অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলাম। বর্ত্তমান যুগে বিবাহিত যুবক-যুবতীর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন পূর্ব্বক ভ্রাতা-ভগ্নীর ন্যায় পবিত্রভাবে অবস্থান করিয়া সযত্নে সমভাবে আধ্যাত্মিক অনুশীলন করা একান্তই প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ ভারতের মহাজাতি সৃষ্টির গূঢ় মর্ম্মরহস্য ইহারই ভিতরে অতি নিভৃতে সম্পুটিত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার মায়ামরীচিকামুগ্ধ অর্দ্ধজাগ্রত মানবসমাজ মানসিক সহস্র বিক্ষিপ্ততার মধ্যে এই মহাসত্যের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইতেছেন না সত্য, কিন্তু সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও আত্মসংশোধনের মধ্য দিয়াই যে ভবিষ্যৎ ভারত তাহার যোগ্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা ঋষিদৃষ্টিপূত অভ্রান্ত সত্য।

"তুমি এই সত্যকে ধরিয়াছ। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার এই সত্যাশ্রয় পূর্ণ সফলতাকে লাভ করুক।

"—'ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ'—'ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাস করিবে,' এই শাস্ত্র-বাক্যের অর্থ এমন নহে, যে, স্ত্রী যতবার ঋতুমতী হইবে, ততবারই তাহার সহিত সহবাস করিবে। পরন্তু এই শাস্ত্রবাক্যের অর্থ এই যে, যখন স্ত্রী-সহবাসের প্রকৃত প্রয়োজন পড়িবে, তখন দেখিতে হইবে, স্ত্রী ঋতুমতী কিনা। সুসন্তান জননার্থে সহবাসের যখন প্রয়োজন হইবে, তখন যদি স্ত্রী ঋতুমতী থাকেন, একমাত্র তাহা হইলেই (ঋতুর প্রথম তিন দিন বাদ দিয়া) স্ত্রী-সহবাস করিবে, নতুবা নহে, ইহাই শাস্ত্রবাক্যের অর্থ। অর্থাৎ হিতাহিত বুদ্ধি-বর্জ্জিত হইয়া কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া

ভালমন্দের বিচার বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া যখন তখন স্ত্রী-সহবাস করিবে না, ইহাই এই শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম। যতবার স্ত্রী ঋতুমতী হইবে, ততবারই তাহার সহবাস করিতে হইবে, যাহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তোমার মস্তিষ্ককে ঘোলাইয়া দিয়া তোমাকে সংযমের পবিত্র ব্রত হইতে বিচ্যুত করিতে চাহিবে, জানিও-বাবা, হয় তাহারা শাস্ত্রের মর্ম্ম সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, নতুবা তাহারা ইন্দ্রিয়-সুখ-কাতর মোহাবিষ্ট লম্পট। ইহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিয়া ইহাদের যুক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া তুমি তোমার চির-মঙ্গলময় সঙ্কল্প হইতে এক চুলও টলিওনা বাবা।

"মহাভারতাদি গ্রন্থে কোথাও কোথাও দেখা যায় যে, ঋতুস্নানান্তে কোনও কোনও নারী ঋতুরক্ষার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়া পুরুষ-সংসর্গ কামনা করিতেছেন। ঐ সকল কাহিনী পাঠ করিয়া তোমাদের ন্যায় সরলচিত্ত অনেক পুরুষের এবং তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর সরলচিত্ত প্রায় অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই মনে এইরূপ এক ধারণা অতি অগোচরে জন্মিয়া থাকে যে, মাসিক রজোদর্শনের পরে নারীপুরুষের সম্ভোগ-মিলন প্রকৃতই শাস্ত্রের এক বাধ্যকর আদেশ এবং এই আদেশ পালনে অবহেলা করিলে বা অসমর্থ হইলে পারলৌকিক জগতে নরকাদি ভোগ প্রমুখ নিদারুণ শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বাবা, যদি গুরুবাক্য শিষ্যের পক্ষে অবশ্য প্রতিপাল্য এবং অপ্রতিবাদে গ্রহণীয় হয়, তবে আমি তোমাকে বজ্রকণ্ঠে বলিতেছি যে পৌরাণিক যুগের ধারণাদ্বারা তোমাদের পরিচালিত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। মহাভারতাদির যুগে নরনারীর যৌনমিলন, সংযম, সতীত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল ধারণা লোকের জীবন-যাপন-প্রণালীকে পরিচালিত করিত, আজিকার যুগে সেই সকল ধারণা বহুপ্রকারে সংশোধিত, পরিশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং অচিরকাল মধ্যে এই সকল বিষয়ের ধারণা ও মতামত আরও স্পষ্টতর, সুষ্ঠুতর এবং শুদ্ধতর হইবে। তোমরা অধঃপতিত ভারতে এক অভ্যুদয়-মুখরিত উন্নয়নোজ্জ্বল মহাযুগের আবির্ভাবের জন্য দাম্পত্য-জীবনের মধ্য দিয়াই এক মহাতপস্যায় ব্রতী হইয়াছ, অতীতের মহিমার নকল করিবার জন্যই তোমাদের আবির্ভাব নহে।

"আর—'ঋতু হইলেই স্ত্রী-সহবাস করিতে হইবে'—এমন আদেশ যদি কোনও শাস্ত্রে সত্যই থাকিয়া থাকে, তবে সেই শাস্ত্র তোমার মানিবার প্রয়োজন নাই। এই অধিকার আমি তোমাকে দিতেছি। সত্য আর ব্রহ্মচর্য্য এই দুইটী মহামঙ্গলের বিরোধী উপদেশ যে শাস্ত্র প্রদান করিবে, সেই শাস্ত্র অপর যাহার জন্যই হউক, তোমার জন্য নহে। তুমি সেই শাস্ত্র অবাধে, নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে সুর্ম্মানদীর জলে নিক্ষেপ করিও,—তাহাতে তোমার, তোমার সহধর্ম্মিণীর, তোমার ভবিষ্যৎ সন্তানসন্ততির কল্যাণ ব্যতীত অপর কিছুই হইবে না। * * * ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ"

ব্রহ্মই তোমার গুরু

ময়মনসিংহ-ঈশ্বরগঞ্জ নিবাসী জনৈক প্রিয় সন্তানকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তোমার অবস্থাটা আমি ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে পারিয়াছি। সদ্গুরু-সঙ্গে চিত্তে যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আবেগের সঞ্চার হয়, তাহা তোমাকে কিছুদিন সাধনের দিকে প্রবলভাবে নিষ্ঠাপরায়ণ রাখে। কিন্তু বাবা সদ্গুরুও একটা মানব-শরীরই মাত্র নহেন যে, এই শরীরটা হইতে দূরে গেলেই তুমি সকল উৎসাহ, উদ্দীপনার আকর শ্রীশ্রীসদ্গুরু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে। তিনি অসীম কৃপাপরবশ হইয়া যে নাম দিয়াছেন, সেই নামের মধ্যেই তাঁর অনন্ত অক্ষয় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহাবপু লইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে তিনি তোমাকে পরমাত্মার পরমানন্দঘন মহানাম স্মরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, সেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত তিনি নিরন্তর তোমাকে তাঁহার সেই দেবজন-বাঞ্ছিত সুখময় সৎসঙ্গ প্রদান করিতেছেন। নিরন্তর ভাবিতে থাক, সদ্গুরু নিয়ত তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, তোমার দেহে, মনে, প্রাণে সর্ব্বত্র অতি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তায় বিরাজিত রহিয়াছেন। নিরন্তর ধ্যান করিতে থাক, তাঁকে ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া যায় না, তিনি কখনও আশ্রিত সেবককে নিমিষের তরে পরিহার করেন না, নিদ্রায়, জাগরণে, দিবসে রাত্রিতে, দুঃখে এবং সুখে, লোকালয়ে বা নির্জ্জনে তিনি তাঁর অপরিমেয় কৃপা লইয়া, ছায়ার ন্যায়

জীবের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান রহেন। অপরের পক্ষে যাহাই হউক, তোমার পক্ষে সাধনের উদ্দীপনা চিরস্থায়ী করিবার জন্য একমনে একপ্রাণে এইরূপ ধ্যান ও অনুচিন্তন আবশ্যকীয় জানিবে।

"একটা মানবদেহকে গুরু বলিয়া মনে করা ভ্রম। দেহধারণ করিয়া বা না করিয়া যে অবিনশ্বর আত্মা তোমাকে মৃত্যুভয়ের অতীত করেন, অভয় প্রদান করেন, পাপপঙ্কে নিমজ্জিত চিত্তকে শুভেচ্ছার বলে পুণ্যতীর্থে অবগাহন করিবার সামর্থ্য প্রদান করেন, সেই অদ্বয়, অব্যয়, চিন্ময় পরমাত্মাই তোমার গুরু। সর্ব্বতোভাবে ইঁহার চিরসুখদ সান্নিধ্যকে ধ্যানের ও কল্পনার বলে অনুভব করিবার চেষ্টা পাইতে থাক। প্রয়াস পাও, সফলতা অর্জ্জিত হইবেই ;— আজ যাহা কল্পনা, কাল তাহা প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইবে। চাই অবিশ্রান্ত ধ্যান।"

রিপুজয়ের কৌশল

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবা আরও লিখিলেন,—

"সাধনের তেজ কমিয়া গেলে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা তোমাকে পাগল করিতে চাহিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে বাপ ? জগদ্ব্যাপী আজ যে এত ইন্দ্রিয়গত অনাচার চলিয়াছে, অসংযম ও ব্যভিচারের স্রোত অতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে. তাহার মূলগত কারণ ত' সাধনের অভাব। যদি কেহ আজ সমগ্র জগৎকে সাধনমুখী করিতে পারে, আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর সবগুলি মদের দোকান, সবগুলি বেশ্যালয়, সবগুলি বিলাস-গৃহ একদিনে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। যদি কেহ আজ সমগ্র জগতে সর্ব্বজনীনভাবে সাধন-পরায়ণতার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, আমি বিশ্বাস করি, জগতের সকল ভ্রূণহত্যা, সকল নারীহরণ, ললনা-ধর্ষণ, আত্মহত্যা ও ব্যর্থ প্রণয় একদিনে বিলয় পাইবে। কিন্তু কথাটা এখন সমগ্র জগৎ লইয়া নহে, কথাটা এক্ষণে তোমাকে লইয়া। তোমাকে এখন তোমার উত্থান-পতনকেই একটা সমগ্র জগতের উত্থান-পতন বলিয়া ভাবিতে হইবে এবং নিজের ভিতরের সহস্র গলদ সংশোধনের জন্য দৃঢ় প্রয়াসী হইতে হইবে।"

"যতক্ষণ দেহ আছে, রিপু ত' এই দেহটাকে তার দাস করিতে চাহিবেই। কিন্তু তুমি টলিও না। যদি দেখ, রিপু প্রবল হইতেছে, জিদ করিয়া সাধনে বসিবে। মন নামে বসিতে না চাহে, জোর করিয়া বসাইতে চেষ্টা করিবে। চঞ্চল মনের এক ঔষধ মিষ্টভাষণ, অপর ঔষধ বেত্রাঘাত। হে পুত্র, দৃঢ় হও, তেজীয়ান্ হও, প্রবল সঙ্কল্পসম্পন্ন হও এবং এই দৃঢ়তাকে, এই তেজকে এবং সঙ্কল্পের এই প্রবলতাকে মহানামের মণিকোঠা হইতে আহরণ কর। নিরন্তর প্রার্থনা কর,—

"ছুটে যাক্ সুখের নেশা
টুটে যাক্ মোহের ঘোর।
ও প্রভো, নাও ক'রে নাও,
অধিকার জীবন মোর॥
বাহিরে তোমার পরশ
ভিতরে তোমার দরশ।
কেটে দিক সকল বাঁধন
হৃদয়ে বাড়াক জোর॥
কর দূর নিশার তিমির
ভেঙ্গে দাও কারার প্রাচীর।
টেনে নাও তোমার বুকে
পেতে দাও স্নেহের ক্রোড়॥

"হতাশ হইও না বাবা আমার, হতাশ হইও না। জীবনের শ্রেষ্ঠ মহিমার মহাগৌরব তারই জন্য, দীর্ঘকাল যে অক্লান্তভাবে বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রাম দেয়। শুভাশীষ জানিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক—
স্বরূপানন্দ"

রিপু-দমন ও আত্মসমর্পণ

ময়মনসিংহ-বরহিত নিবাসী জনৈক সন্তানকে শ্রীশ্রীবাবা আর এক পত্রে লিখিলেন,—

"নিজের ভাল-মন্দ, শুভাশুভ, শক্তি-অশক্তি সব পরমাত্মার পায়ে ঢালিয়া দিয়া তাঁর প্রীতি-সাধনের জন্য নিজেকে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রস্তুত করিতে থাক। কামদমনের, রিপুমর্দ্দনের শ্রেষ্ঠ উপায় সম্যক্ আত্মসমর্পণ। প্রাণ দেবতার পাদপদ্মে নিজেকে যে সম্যক্ বলি দিয়া ফেলিয়াছে, নির্ভয়ে সে গাহিতে পারে,—

"ফুলধনু হাতে কাম
ঘুরিয়া বেড়ায়
তাহাতে আমার চিত
ভীতি নাহি পায়।
দয়ালের পাদমূলে
নিজেরে দিয়াছি ঢেলে,
যা হবার হোক্
তাতে কিবা আসে যায় ?
যাঁহার চরণ নখে
চেয়ে আছি অপলকে,
কামানল নিভাইতে
তাঁহারি ত' দায় !

"নিজেকে যে সেই পরম দয়ালের পায়ে সঁপিয়া দেয়, সত্য সত্যই তার রিপু-নির্জ্জয়ের ভার ভগবান্ স্বয়ং নেন।"

জাতীয় স্বাধীনতা ও পরাধীনতা

অপরাহ্নে মুরাদনগর হইতে মৌলবী আবুলেস রহমান আসিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন,—

তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—"জগতের কোনও জাতিকে পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়, যদি সে নিজে না এই বন্ধনে স্বীকৃত থাকে। সমগ্র জগতের ইতিহাস এই শিক্ষা দিচ্ছে। কোনও স্বাধীন জাতিকে পরাধীন থাক্‌তে বাধ্য করা যায় না, যদি সেই জাতির অন্তরে পরাধীন হ'য়ে থাকবার একটা tacit willingness (প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা) না থাকে।

মন্ত্র লওয়া ও ভবিষ্যৎ জানা

কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সাহা এবং বিপিনচন্দ্র সাহা আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার পদপ্রান্তে বসিলেন।

শ্রীযুক্ত বিপিনের কতকগুলি কথার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ বিপিন, যখনি কোনও সাধু দেখবে, ভালর দিকে দুইটি বিষয়ে, আর মন্দের দিকেও দুইটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। একদিকে দৃষ্টি রাখবে, যেন তাঁদের কোনও অসম্মান করা না হয় এবং তাঁদের নিন্দা করা না হয়। অপর দিকে দৃষ্টি রাখবে, যেন কাণটি তাঁদের ঠোঁটের খুব কাছে না চ'লে যায়, আর তাঁদের কাছে নিজ ভবিষ্যৎ জান্‌বার জন্য যেন আকাঙ্ক্ষা না হয়। ভগবদ্‌ভক্ত ব্যক্তিদের অসম্মান কর্লে নিজেরই অমঙ্গল হয়। তুমি হয় ত' কাউকে ভগবদ্‌ভক্ত ব'লে জ্ঞান না কত্তে পার, কিন্তু দশজনে যখন ঐরূপ জ্ঞান করে, তখন তিনি হ'লেও ত' ভক্ত হ'তে পারেন! সুতরাং তাঁর মর্য্যাদাহানি কখনই করবে না। পরনিন্দা মাত্রেই দোষের, সাধু পুরুষের নিন্দা আরো দোষের। এই গেল এক দিকের কথা। অপর দিকের কথা হ'ল এই যে, সাধুপুরুষদের মধ্যেও অনেকের মানসিক রোগ থাকে। একটী হচ্ছে, সুযোগ পেলেই লোককে মন্ত্র দিয়ে শিষ্য করা, অপরটী হচ্ছে লোকের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী ক'রে তাকে উদ্বিগ্ন ক'রে তোলা।

মন্ত্র লইলেই কি শিষ্য হয়?

শ্রীযুক্ত সূর্য্যমোহন রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—মন্ত্র একটা দিলেই কি শিষ্য হ'য়ে গেল?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তা হ'ল না বটে, কিন্তু এতে দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তির উপর বিশেষ অত্যাচার করা হয়। এখান থেকে কয় মাইল দূরে দুই ভাই আছেন জমিদার, তাঁদের বাড়ীতে কোনো উপলক্ষ ক'রে একজন সাধু এলেন। বলা নেই, কহা নেই, তিনি সুকৌশলে মন্ত্রগ্রহণে অনিচ্ছুক দুই ভ্রাতাকে দুইটী পৃথক ওজুহাত ক'রে মন্ত্র দিয়ে তারপরে বল্‌লেন যে তাঁদের দীক্ষা হ'ল। ছোট ভাইএর একটু তেজালো মন, তিনি ব'লে বস্‌লেন,—"আপনি মন্ত্র দিলেন বটে,

কিন্তু আমি গ্রহণ কল্লাম না।" বড় ভাইএর মন একটু দুর্ব্বল, গুরু ব'লে না মান্‌লে যদি আবার শেষে বহুমূত্র রোগ বেড়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাঁর প্রতি প্রাণের গভীর বিতৃষ্ণা, তাঁকেই গুরু ব'লে মেনে নিয়ে হৃদয়ের উপরে উৎপীড়ন সহ্য করলেন। অনেক মন্ত্রদাতাদের ধারণা আছে যে, যেন-তেন-প্রকারেণ একটা মন্ত্র কাণে ঢুকিয়ে দিতে পার্লেই শিষ্যের কল্যাণ হ'য়ে যাবে। হয় ত' তাঁরা সরল বিশ্বাসেই মন্ত্রটীকে কাণে ঢুকিয়ে দেন, কিন্তু দীক্ষার্থী যতক্ষণ সরল বিশ্বাসে মন্ত্র না নিচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এসব দিয়ে তাকে বিষম অসুবিধায় ফেলা হয়।

দীক্ষাদাতার কর্ত্তব্য কাল-প্রতীক্ষা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষাদাতার কর্ত্তব্য,যাঁর তিনি উপকার কত্তে চান, সর্ব্বাগ্রে তাঁর মনের ভিতরে ঈশ্বরানুরাগ, বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা সৃষ্টি করা। কৃষকের যেমন কর্ত্তব্য বীজ-বপনের পূর্ব্বে জমিতে বহুবার হলচালন ক'রে তার সবটুকু মৃত্তিকাকে একেবারে চূর্ণীকৃত করা। কথায় বলে, "শতেক চাষে মূলা।" দীর্ঘকাল যিনি প্রতীক্ষা কত্তে পার্‌বেন, তিনিই দীক্ষাদাতা হবার উপযুক্ত ব্যক্তি। নতুবা বীজ বপনের আগেই জমি ঘাস-জঙ্গলে পূর্ণ হ'য়ে যাবে যে! দীক্ষাদাতার পবিত্র ব্রত যাঁরা জীবনে গ্রহণ কত্তে চান, তাঁদের উচিত পার্থিবভাবে ছোট্ট একটি বাগান ক'রে কিছুকাল তাতে ফুলফলের বীজ বপন ক'রে তা থেকে ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করা। এতে এমন অনেক শিক্ষা লাভ হবে, যা লোক-ব্যবহারে কাজে আসবে।

দীক্ষাগ্রাহীর কর্ত্তব্য আত্মপরীক্ষা

বিপিন বলিলেন,—কথাটা ঠিকই। যে গ্রামে যাই সেই গ্রামেই শুনি, একজন নূতন গুরুদেব এসেছেন, তিনি দলে দলে শিষ্য সংগ্রহের চেষ্টা কচ্ছেন, কতজনকে যে কত রকম যুক্তি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র নেবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাচ্ছেন, তার স্থিরতা নেই। শাস্ত্রজ্ঞ আর শাস্ত্রজ্ঞানহীন, কার্য্যকারণজ্ঞ আর কাণ্ডজ্ঞানহীন সকল শ্রেণীর লোকেরাই দলে দলে গুরুতা-ব্যবসায় কচ্ছেন এবং অপরের শিষ্যকে মাথা মুড়িয়ে নিজের শিষ্য কর্‌বার জন্য আদা-জল খেয়ে লেগেছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এমন হওয়া কিছু বিচিত্র নয় যে, তাঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য মহৎ, সকলেই চান জীবকে ঈশ্বরাভিমুখী কত্তে। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্যের মহিমা অভ্রচুম্বী হ'লেও যদি চেষ্টার ফলে দীক্ষাপ্রাপ্তেরা যথার্থ উপকার কিছু না পায়, তা হ'লে সেটা বড়ই পরিতাপের কথা। এই জন্য মন্ত্রগ্রাহী ব্যক্তিদেরও প্রয়োজন আত্মপরীক্ষার। সত্যই কি মন্ত্র নেবার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা এসেছে? মন্ত্র নিয়ে এই মন্ত্রের কি সাধন কর্ব্ব, না, লোক-দেখান ফোঁটা-তিলক কেটেই কর্ত্তব্য শেষ কর্ব্ব? অহোরাত্র নাম-কীর্ত্তন হচ্ছে,—স্বরভঙ্গ অথবা খিঁচুরী এ দুটার একটাও এর সারও নয় বা লাভও নয়, এর সার হচ্ছে প্রেম, এর লাভ হচ্ছে অভয়। মন্ত্র যিনি নেবেন, তাঁর কর্ত্তব্য হচ্ছে হুজুগ বর্জ্জন ক'রে, লোক-দেখাদেখি হুড়াহুড়ি ত্যাগ ক'রে, চক্ষুলজ্জার দায় এড়িয়ে নির্ভীক্ চিত্তে আত্ম-পরীক্ষা করা এবং তার ফল যদি হয় মন্ত্রগ্রহণের অনুকূল, তবেই মন্ত্র গ্রহণ করা। যে ব্যাপারের সঙ্গে জীবন-মরণের সম্পর্ক, তাতে চক্ষুলজ্জাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মতন পাপ আর কি আছে?

সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত

অখণ্ড সঙ্গীত

—ঃ০ঃ—

খণ্ড আজিকে হোক অখণ্ড,
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্,
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক

ছোট-বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক।

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা ;
জনমে জনমে প্রাণ বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক।

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ ;
শরেণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক। ভোগ।

—স্বরূপানন্দ।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক